التعزير في الشريعة الإسلامية
د. عبد العزيز عامر

ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আবদুল আযীয আমের

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ড. আবদুল আযীয আমের

ইসলামী দণ্ডবিধি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ড. আবদুল আযীয আমের

ইসলামী দণ্ডবিধি

প্রথম খণ্ড

অনুবাদ
শহীদুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

ইসলামী দণ্ডবিধি
বি আই এল আর এল এ সি-৯
ISBN : 978-984-90208-3-7
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর-২০১২

© : সংরক্ষিত

প্রকাশক
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

কম্পোজ
এম. হক কম্পিউটার্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
আল-ফয়সাল প্রিন্টার্স
৩৪ শ্রীশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ৩০০ টাকা US $ 15

Islami Dandabidhi, Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Faysal Printers, 34 Shrishdas Lane, Banglabazar Dhaka-1100, Price Tk. 300 US $ 15

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ইসলামী আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণার যে ঘাটতি রয়েছে তা দূর করার লক্ষ্যে শুরু থেকেই এ প্রতিষ্ঠান অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামী শরীয়া সম্পর্কে যতটুকু পাঠদান করা হয় তাতে আধুনিক জীবন ও সমাজের সামগ্রিক আইনি সমাধান পাওয়া যায় না। বিশেষ করে সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত আইন শরীয়া আইনের পাঠ্যতালিকায় একেবারেই অনুপস্থিত। এই শূন্যতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা থেকেই এই গ্রন্থের প্রকাশনা। এই গ্রন্থের উর্দু ভার্সন আমার নজরে আসার পর এটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। নানা কারণে বইটি যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিলম্বে হলেও ইসলামী দণ্ডবিধি-এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর অশেষ শোকর আদায় করছি।

লিবিয়ার বেনগাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইনের অধ্যাপক ড. আবদুল আযীয আমের-এর আরবী ভাষায় রচিত 'আত-তাযির ফিশ-শারীআতিল ইসলামিয়্যা' (ইসলামী দণ্ডবিধি) গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রামাণ্যগ্রন্থ। এ পর্যন্ত মূল গ্রন্থটির দ্বাদশতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। উর্দু, ফারসী, তুর্কিসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থটি বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়-এর শরীয়া অনুষদের অধীন একটি গবেষণাপত্র। গ্রন্থটি সম্পর্কে শরীয়া ও আইনের প্রখ্যাত অধ্যাপক শায়খ আবু জাহরা র. মন্তব্য করেছেন, 'ইসলামী দণ্ডবিধির তাৎপর্য বিশ্লেষণ এবং প্রচলিত বিচারব্যবস্থা ও দণ্ডবিধির অসারতা এ গ্রন্থে চমৎকারভাবে ফুটে ওঠেছে।' গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের আইনের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য একটি আবশ্যিক পাঠ্যগ্রন্থ হওয়ার মতো উপাদান সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের আইন, ইসলামিক স্টাডিজ ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ গবেষক, আইনজীবি, সচেতন মহল ও চিন্তাশীলদেরকে এ গ্রন্থ ইসলামী আইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আইনের ব্যাপ্তি ও পরিধি সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা দেবে। বস্তুত ইসলাম যে কেবল কতিপয় আনুষ্ঠানিকতা নির্ভর ধর্ম নয়-এ গ্রন্থ পাঠে পাঠক তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। আশা করি, সম্মানিত পাঠকবর্গ আমাদের এই অনুভূতির সাথে একমত পোষণ করবেন। ইসলামী আইন অন্বেষী মহলের যৎকিঞ্চিৎ উপকার হলেও আমাদের এ আয়োজন সার্থক হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন কবুল করুন।

এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

অনুবাদকের নিবেদন

আলহামদুলিল্লাহ! আত-তাযির ফিশ-শারীয়াতিল ইসলামিয়্যা (ইসলামী দণ্ডবিধি) এর প্রথম খণ্ড সব পর্যায় অতিক্রম করে সম্মানিত পাঠকগণের হাতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম-এর নির্দেশে সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান মরহুম মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব-এর তত্ত্বাবধানে তিন বছর আগে উর্দু ভার্সন থেকে এই পুস্তকের অনুবাদ শুরু করেছিলাম। শুরুতে মূল আরবী গ্রন্থটি আমাদের হাতে ছিল না। উর্দু অনুবাদে বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষিত না হওয়ায় প্রায়ই সংশয়ে পড়তে হতো। ফলে অনুবাদ কাজ আর অগ্রসর হয়নি। বহু চেষ্টা করে মাত্র কিছু দিন পূর্বে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মূল আরবী গ্রন্থের একটি কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এরপর থেকে অনুবাদের কাজ চলতে থাকে। ইতোমধ্যে বহু গুণীজনের পক্ষ থেকে গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশের জন্য তাকিদ আসতে থাকে। সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি প্রায়ই কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তাড়া দিচ্ছিলেন। বস্তুত গুণীজনদের আগ্রহ এবং সেক্রেটারি সাহেব-এর অব্যাহত তাকিদ ব্যস্ততার মধ্যেও প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

এ গ্রন্থটি বিশ্বখ্যাত বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদের অধীন একটি গবেষণাকর্ম। গবেষণা কর্মটির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করেছেন বিশ্ববিখ্যাত শরীয়া বিশেষজ্ঞদের একটি দল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ আবু যাহরা, শায়খ আলী আল-খাফীফ এবং ড. মাহমুদ মাহমুদ মোস্তফা।

বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত কোন গ্রন্থ আছে বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের বিশ্বাস, তাযির বা ইসলামী দণ্ডবিধি সম্পর্কে এটিই হবে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। বিষয় হিসেবে এটি যথেষ্ট জটিল। ফলে কোন কোন জায়গায় হয়তো অস্পষ্টতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতে পারে। সুহৃদ পাঠকগণ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি একান্তই আমার দীনতা ও অজ্ঞতা। আর সুন্দর ও ভালোটুকু মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ। এ গ্রন্থ পাঠে সম্মানিত পাঠকগণ উপকৃত হলে আমাদের এই উদ্যোগ সার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর বিধান জানা এবং জীবনের সর্বস্তরে মানার তাওফীক দিন।

শহীদুল ইসলাম
পুরানা পল্টন, ঢাকা।

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি ইনসাফ ও কল্যাণের নির্দেশ দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম নবী করীম স.-এর প্রতি যিনি সত্য সুন্দর ও সঠিক পথের দিশারী। এই গ্রন্থের নাম التعزير في الشريعة الاسلامية "ইসলামী দণ্ডবিধি"। ইসলামী শরীয়াহ আইন সম্পর্কে এ গ্রন্থটি প্রণিত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইসলামী শরীয়ত শাশ্বত ও চিরন্তন, মহান আল্লাহ্ মানবজাতির জন্য আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ রহমত ও কল্যাণ। মহান আল্লাহ্ মানবজাতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়েও সম্যক অবগত এবং তিনি জানেন কিসে মানবজাতির কল্যাণ আর কিসে মানবকুল হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর পনেরো শতাব্দি অতিক্রান্ত হয়েছে। ইসলাম মুসলমানদের জীবনকে আলোকিত করে এবং মুসলমানদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। প্রথম দিকের মুসলমানগণ ইসলামের বিধান সর্বতোভাবে পরিপালনে কোনরূপ ত্রুটি করেননি বরং প্রাত্যহিক চর্চা, অধ্যয়ন, গবেষণা ও অনুসরণের মাধ্যমে তাঁরা ইসলামকে একটি জীবন্ত জীবনবিধানের বিমূর্ত রূপে রূপায়িত করেছিলেন। এ কারণে ইসলামী শরীয়ত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, পৃথিবীর অন্য কোন বিধান তাকে স্পর্শ করবে তো দূরে থাক ইসলামী আইনের উচ্চমর্যাদার পাশও ঘেষতে পারেনি।

এরপর মুসলিম উম্মাহর দীর্ঘ সময় গভীর নিদ্রায় কেটেছে। দীর্ঘদিনের লালন ও পরিচর্যার পর কালপরিক্রমায় মুসলমানগণ বিভিন্ন কারণে ইসলামী আইন থেকে দূরে সরে গেছে। সেই সব কারণ আলোচনা ও অনুসন্ধানের অবকাশ এখানে নেই। এক পর্যায়ে মুসলমানরা ইসলামের আদর্শিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তারা অন্য শরীয়তের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। ইসলামী সমাজ ও পরিবেশে যেগুলোর কোনই স্থান নেই। যার ফলশ্রুতিতে অবস্থা এমন হয়েছে যে, প্রকৃত ইসলামের রূপরেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে সেখানে অনেক আবর্জনার স্তূপ জমা হয়েছে। মুসলমানদের কাছেও ইসলামের জ্যোতির্ময় আলোক নিষ্প্রভ হয়ে গেছে এবং গোটা বিশ্ববাসীর কাছে ইসলাম হারিয়ে ফেলেছে তার প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য।

আমার বিশ্বাস, ইসলামের স্বর্ণালী উত্তরাধিকারকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে, ইসলামের জ্যোতির্ময় সূর্যের নবোদয় ঘটাতে হলে, ইসলামী

www.pathagar.com

আইনকে প্রগতির মানদণ্ড নির্ধারণ, যুগোপযোগীকরণ ও সামগ্রিক আইনের উৎস হিসেবে উন্নীত করার স্বীকৃত পদ্ধতি হলো গভীর অধ্যয়ন, গবেষণা ও ব্যাপক অনুসন্ধান। এতে ইসলামী আইনের অন্ত র্নিহিত তাৎপর্য ও আকর্ষণীয় রূপ আধুনিক আঙ্গিকে প্রকাশ করা যাবে এবং ইসলামী শরীয়তের মূল ও শাখা প্রশাখা যৌক্তিকভাবে আধুনিক আইনের কাছাকাছি নিয়ে আসা যাবে। আমার প্রত্যাশা এ কাজের মাধ্যমে আমি সেইসব যোদ্ধাদের কাতারে শামিল হবো; যারা ইসলামী আইন পুনর্জাগরণের সংগ্রামে লিপ্ত। যদিও এপথ কন্টকাকীর্ণ এবং আমিও সামর্থহীন।

আমি ইসলামী আইনকে আমার এই গবেষণার বিষয়বস্তু এজন্য নির্ধারণ করেছি, যাতে এর মাধ্যমে ইসলামী আইন গবেষণার পথ উন্মোচিত হতে পারে। বস্তুত এই গ্রন্থটি 'ইসলামী দণ্ডবিধির' উপর রচনা করার বহুবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মুআমালাত তথা লেনদেন সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে ফলে এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত স্পষ্ট ধারণা জন্মানোর কারণে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। তাই আশা করা যায়, গবেষকগণ এক্ষেত্রে মানবতার কল্যাণ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সহজেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে পারবেন।

ইসলামী শরীয়তের অপরাধ নীতি সম্পর্কে বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষের ধারণা হলো, মানুষের জীবনে-এর বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের যুগ শেষ হয়ে গেছে। বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে ইসলামী আইন তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। এ বিষয়টিই আমাকে ইসলামী শরীয়তের অপরাধ সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী করে তোলে।

হুদুদ ও কিসাসের ব্যাপারে ইতোমধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, আরো কিছু প্রকাশের পথে রয়েছে। এ কারণে আমি 'তাযির'কেই বেছে নিয়েছি; কেননা আমার জানা মতে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

এছাড়া বিষয়টি যতটুকু গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল ইত:পূর্বে ততটুকু গুরুত্বের সাথে তা দেখা হয়নি। এমনকি মুতাকাদ্দিমীনের কিতাবসমূহে তাযির সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোচনা পাওয়া যায় না। যদিও ফকীহগণ এর মূলনীতি ও শাখা প্রশাখা সম্পর্কে অল্প বিস্তর আলোচনা করেছেন। তবে তারা ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ে তাযির বিষয়টি বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। অবশ্য 'আল-আশতার ওয়াশনী' এর ব্যতিক্রম। তিনি "আল-ফুসূলু খামসাতা আশারা ফিত-তাযির" 'তাযির সম্পর্কিত

www.pathagar.com

পনেরো অনুচ্ছেদ' নামে একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। কিন্তু তাতে তাযির-এর বিক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা একত্রিতকরণ ছাড়া তার মৌল নীতিমালা সম্পর্কে তেমন আলোকপাত করা হয়নি।

বিষয়বস্তুর বিবেচনায় তাযির খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইসলামী দণ্ডবিধির সিংহভাগই তাযিরের অন্তর্ভুক্ত। যেসব বিষয়ে ইসলামী শরীয়তে পূর্ব থেকে শাস্তি নির্দিষ্ট নেই এর সবকিছুই তাযিরের পর্যায়ভুক্ত। তাযিরের পরিধি এমনিতেই বিস্তৃত। আধুনিক যুগের অপরাধের নিত্য-নৈমিত্তিক রূপ ও ধরন তাযিরের পরিধিকে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করেছে।

এ গ্রন্থে আমি একটি ভূমিকা, দু'টি বৃহৎ অধ্যায় এবং একটি উপসংহার উপস্থাপন করেছি। ভূমিকায় ইসলামী শরীয়তে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত তথা হুদুদ ও কিসাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি; যাতে আমি যেসব অপরাধে শাস্তি নির্ধারিত নেই সে সম্পর্কে আলোচনায় মনোনিবেশ করতে পারি। অতঃপর আমি তাযিরের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেই সাথে বিভিন্ন তাযিরী অপরাধ ও তাযিরীদণ্ডের তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছি। এর পাশাপাশি ইসলামী শরীয়ত অপরাধ ও দণ্ডবিধানে যে তারতম্য করেছে তার গুরুত্ব ও কারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। অতঃপর তাযিরের শ্রেণিবিভাগ ও নামকরণ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে আমি সেইসব অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করেছি যেখানে তাযিরীদণ্ড সাব্যস্ত হয়। যার মধ্যে রয়েছে মানব জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ, ইজ্জত ও সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে অপরাধ, অর্থ-সম্পদ সম্পৃক্ত অপরাধ এবং রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধসহ ইত্যাকার অপরাধের বর্ণনা।

আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি শুধুমাত্র তাযিরের বর্ণনাই প্রদান করেছি। আর তাযির হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূল স.-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয় এমন শাস্তি। তাতে আমি কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছি, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তাযিরের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ধরনের তাযিরী শাস্তি যেমন– দৈহিক শাস্তি, কারান্তরীণ করার শাস্তি এবং জরিমানা, অর্থদণ্ড এবং অন্যান্য শাস্তি যা যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর এ গ্রন্থে বিশেষ একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছি; যাতে আমি তাযিরের শাস্তি বা দণ্ড বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং আর একটি অনুচ্ছেদে আমি তাযিরের দণ্ড মওকুফ হয়ে যাওয়া এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

www.pathagar.com

সবশেষে আমি একটি উপসংহার রচনা করেছি। তাতে ইসলামী দণ্ডবিধির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছি। তাতে আমি বলতে চেষ্টা করেছি, ইসলামী দণ্ডবিধি কীভাবে সব যুগের জন্য এবং সবস্থানের জন্য কল্যাণকর, বাস্তবভিত্তিক ও বিবর্তনকে ধারণ করে। সময়ের বিবর্তনেও ইসলামী আইন কীভাবে কার্যকর ও স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই; ভবিষ্যতে যাঁরা এ বিষয়ে গবেষণা করবেন, আমার এই রচনা তাঁদের জন্য একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। আমি এর একেবারেই প্রাথমিক সূচনাকারী মাত্র। আশা করি, ভবিষ্যতের গবেষকগণ এ বিষয়টিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সক্ষম হবেন। আমি মহান আল্লাহর কাছে সেই সব অনাগত গবেষকগণের মধ্যে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করার দুআ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার শরীয়ত অনুধাবন ও অনুসরণের তৌফিক দিন।

- ড. আবদুল আযীয আমের
কায়রো, মিসর।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১৭
হদ্দ এর আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ	১৭
হদ্দ ও হদ্দযোগ্য অপরাধ	১৮
চুরি	১৯
ডাকাতি	২০
ব্যভিচার	২৫
অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি	২৫
বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি	২৮
কযফ তথা অপবাদ	
মদপান	৩৩
ইরতিদাদ বা ধর্মদ্রোহিতা	৩৭
বিদ্রোহ	৪০
বিদ্রোহীদের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ	৪৩
কিসাসযোগ্য অপরাধ	৫১
স্বেচ্ছায় নরহত্যা	৫২
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিসাস	৫৫
ইসলামী শরীয়তে সুনির্দিষ্ট আইনের কিছু দায় ও বৈশিষ্ট্য	৫৭
দায়	৫৮
শর্তের মধ্যে সামঞ্জস্য	৫৮
অপরাধের প্রমাণ	৫৯
সংশয় সন্দেহ	৫৯
সন্দেহের সংগা ও প্রকার	৬০
সংশয়যুক্ত কর্ম	৬০
ক্ষেত্রের সংশয়	৬১
সন্দেহযুক্ত বিবাহ	৬২
সংশয়ের আইনগত পরিণতি	৬৩
তাযির বা শাস্তি	
তাযির এর সংগা	৬৯
ফকীহদের দৃষ্টিতে তাযিরের সংগা	৬৯

www.pathagar.com

বিষয় পৃষ্ঠা

হদ্দ ও কিসাসের সাথে তাযির ৭০
শাস্তি ও কাফফারা ৭২
তাযির : আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের হক ৭৪
হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ এর মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব ৭৭
হদ্দ কিসাস ও তাযিরের মধ্যে পার্থক্যের বিভিন্ন দিক ৮৯

শাস্তির ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানগর্ভ কর্মনীতি

সাধারণ অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট না করার কারণ ৯৬
কিসাসকে ব্যক্তি অধিকারভুক্ত করার কারণ ৯৬
হদ্দ ও কিসাসের অপরাধের মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য ৯৭
কিসাস ক্ষমা করার পরও কেন তাযিরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে? ৯৮
অপরাধ ও শাস্তি বিভাজনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত ৯৯
সারকথা ১০১

ইসলামী আইনে তাযিরী অপরাধ

অপরাধের সংগা ১০৩
গোনাহের সংগা ১০৩
মুসতাহাব ছেড়ে দেয়া এবং মাকরূহ কর্ম করার বিধান ১০৬
মাসিয়াত বা গোনাহ ছাড়াও তাযিরী শাস্তি ১০৮
মাসিয়াত (গোনাহ) সাব্যস্ত হওয়ার পরও শাস্তি রহিত হয়ে যাওয়া ১১০
অপরাধ গোনাহর সমার্থক নয় ১১১

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী আইনে মানুষের বিরুদ্ধে দৈহিক ও প্রাণঘাতি অপরাধের শাস্তি ... ১১৩
মানব সত্তার বিরুদ্ধে অপরাধ কয়েক প্রকার ১১৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

হত্যার প্রকারভেদ

প্রথম অনুচ্ছেদ

ইচ্ছাকৃত হত্যা ১১৬
কোন কারণে হত্যাকারী রূপে গণ্য হওয়া ১২০
নিহত ব্যক্তি যদি হত্যাকারীর অংশ হয় ১২২
যে নিহত ব্যক্তি পরিপূর্ণ নির্দোষ নয় তাকে হত্যাকারীর শাস্তি ১২৪

www.pathagar.com

বিষয় পৃষ্ঠা
রক্তমূল্যে অসমতা ১২৫
রক্তপণের ক্ষমা ১২৮

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যা ১৩০
ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যার উদাহরণ ১৩২
ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের পরিণতি ১৩৩
আধুনিক আইনের সাথে শরয়ী আইনের পার্থক্য ১৩৪

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ভুল হত্যাকাণ্ড ১৩৫
সংকল্পে ভুল ১৩৫
সংকল্প ও কর্মে ভুল ১৩৬
ভুল হত্যার বিধান ১৩৬

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত হত্যা ১৩৭

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

কারণগত হত্যাকাণ্ড ১৩৯
কারণগত হত্যাকাণ্ড ও ভুল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য ১৪২
তুলনামূলক পর্যালোচনা ১৪৩
কারণগত হত্যাকাণ্ডের বিধান ১৪৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের দৈহিক ক্ষতিসাধনের বিধান ১৪৬
হত্যাকাণ্ডের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে কিসাস কার্যকর হওয়ার শর্তাদি ... ১৪৬
একটি অঙ্গ কর্তনের অপরাধে কি একাধিক অপরাধীর অঙ্গ কর্তন করা যাবে? . ১৪৯

প্রথম অনুচ্ছেদ

কোন অঙ্গহানি ঘটানো কিংবা বিকলাঙ্গ করার শাস্তি ১৫৩
উল্লেখিত অপরাধে ইচ্ছাকৃত অপরাধের নামে
সাদৃশ্যপূর্ণ কোন পর্যায় আছে না নেই ১৫৩
যেসব ইচ্ছাকৃত অপরাধে কিসাস হয় না ১৫৫
সাদৃশ্য না থাকা ১৫৬

www.pathagar.com

বিষয় পৃষ্ঠা
যে ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দেয়া সম্ভব নয় ১৫৮
পূর্ণ দিয়াতের ক্ষেত্র ১৬৭
যে অবস্থায় দিয়াতের অংশ বিশেষ নির্ধারণ করা হয় ১৬৯
বর্ধিত দিয়াত ১৭১
অতিরিক্ত দিয়াত ১৭২

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমের প্রকারভেদ এবং এর বিধান ১৭৬
শাজাজ ১৭৬
মাথা ও মুখমণ্ডলের আঘাতের প্রকারভেদ ১৭৭
বিভিন্ন ধরনের শাজাজ অর্থে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ ১৭৭
মাথা ও চেহারার আঘাতে কিসাসের বিধান ১৭৯
মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমে জরিমানা ১৮২
মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমের ক্রমধারায় মুযিহার পরের
জখমগুলোর অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানা নির্দিষ্ট ১৮৩

তৃতীয় অনুচ্ছেদ
জখম (আল-জারাহ) ১৮৬
জখম দুই প্রকার ১৮৬
জখমের কিসাস (শাস্তি) ১৮৭
জখমের ক্ষেত্রে জরিমানা ১৯০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামী আইনে মানবজীবন ও দেহের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের শাস্তি ১৯৪
অপরাধকর্মের দু'টি পর্যায় ১৯৪
অপরাধ সংঘটনের পদক্ষেপ ১৯৫
ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো থেকে বিরত থাকা ১৯৬
হত্যাকাণ্ড ঘটাতে গিয়ে যদি অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত হয় ১৯৮
হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধ সংঘটনের পদক্ষেপ গ্রহণের শাস্তি ১৯৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
নরহত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধের শাস্তি ২০১
প্রথম অনুচ্ছেদ
ইচ্ছাকৃত যে নরহত্যার কিসাস কার্যকর হয় না ২০১

www.pathagar.com

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের অপরাধে তাযিরী শাস্তি ২০৬

ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের যদি পুনরাবৃত্তি না ঘটে ২০৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

হত্যার চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের অপরাধের তাযিরী শাস্তি ২০৯

ইমাম মালিক র.-এর অভিমত ২০৯

অন্যান্য ইমামগণের অভিমত ২১০

গ্রন্থকারের মতামত ২১০

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ভুলবশত হত্যা এবং এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধ ও তাযিরী শাস্তি ২১২

যেসব আঘাতে শরীরে কোন চিহ্ন থাকে না সেসব আঘাতের তাযিরী শাস্তি ২১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানহানি এবং অন্যান্য চারিত্রিক অপরাধ ২১৯

যেনা কযফ গালি-গালাজ ২১৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

১. যে যেনায় হদ্দ নেই ২২০

সংশয় সন্দেহ এবং এর প্রভাব ২২০

ক. কর্মের ক্ষেত্রে সংশয়ের উদাহরণ ২২১

খ. মালিকানার ক্ষেত্রে সংশয় সন্দেহের উদাহরণ ২২২

গ. আকদ বা বিবাহ চুক্তির ব্যাপারে সংশয় ২২২

ঘ. জীবিত নারী হওয়া ২২৬

ঙ. জীবজন্তু, নারীকর্তৃক কিংবা পায়ুপথে সঙ্গম ২২৭

যেনা যদি পুরুষের দ্বারা সংঘটিত না হয় ২২৭

যেনা যদি নারীর যোনী পথে না হয় ২২৮

নাবালেগ ও নাবালেগার বিধান ২৩২

২. অশ্লীলতা ও বেহায়াপনামূলক অপরাধ ২৩৩

অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা ২৩৫

চরিত্রহননমূলক কর্মকাণ্ড ২৩৬

হস্তমৈথুন ২৩৭

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
যে কযফ ও গালিগালাজে হদ্দ নেই

প্রথম অনুচ্ছেদ

যে কযফে (মিথ্যা অপবাদ) হদ্দ নেই..... ২৩৯
অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি যদি মুহসিন (সচ্চরিত্র) না হয়..... ২৩৯
অজ্ঞাতের প্রতি অভিযোগ..... ২৪৪
যেসব শর্ত কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট..... ২৪৫
অপরাধ কর্ম সম্পাদনে যদি অভিযুক্ত অক্ষম হয়..... ২৫৩
শর্তযুক্ত ও বিলম্বিত কযফ..... ২৫৬
গালমন্দ তিরস্কার ভর্ৎসনা..... ২৫৭
কটূকাটব্য..... ২৫৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসলামী শরীয়ত আইন অপরাধ ও শাস্তির শ্রেণী বিন্যাসে একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ইসলামী শরীয়ত কয়েকটি অপরাধ কর্মকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছে এবং এসব অপরাধের শাস্তিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। উল্লেখিত অপরাধ ও শাস্তিসমূহের কোনটাকে ইসলামী আইনে বলা হয় 'হদ্দ' আবার কোনটাকে বলা হয় 'কিসাস'।

হদ্দ ও কিসাস ছাড়া অপরাপর সব অপরাধে ইসলামী শরীয়ত সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তি নির্ধারণ করেনি। এসব ক্ষেত্রে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা শাসক ও বিচারকদের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিয়েছে, যাতে বিচারক কিংবা শাসক অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করে উপযুক্ত তাযিরী শাস্তি প্রয়োগ করতে পারেন। এই শ্রেণীভুক্ত সকল অপরাধকে তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলা হয়। তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা সেইসব অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইসলামী আইনে যেসব অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ইসলামী আইনে অপরাধ ও শাস্তির মূল দর্শন বোঝা সহজ হবে এবং বলা সম্ভব হবে ইসলামী আইন বিভিন্ন অপরাধে শাস্তির মাত্রা বিভিন্ন রকম করেছে কেন?

হদ্দ এর আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ

হদ্দ ও তাযির এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অপরাধ ও শাস্তির শ্রেণী বিন্যাসে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। অপরাধের মধ্যে কিছু অপরাধ এমন রয়েছে যেগুলোর দণ্ডবিধি সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক দণ্ডবিধিকে 'হদ্দ' আবার কিছু সংখ্যককে কিসাস বলে অভিহিত করেছে। এ ছাড়া অপরাপর যেসব অপরাধ রয়েছে সেগুলোর জন্যে ইসলামী শরীয়তে নির্দিষ্ট কোন দণ্ডবিধি উল্লেখ করেনি। এ ক্ষেত্রে শাসক কিংবা বিচারক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে; তারা অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের মাত্রা অনুধাবন করে উপযুক্ত দণ্ড বিধান করবেন। এসব দণ্ড বিধানকেই ইসলামী আইনে 'তাযিরাত' বলা হয়। এ পুস্তকে এগুলোই আমাদের আলোচনার বিষয়।

তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে সুনির্দিষ্ট অপরাধ ও সুনির্দিষ্ট দণ্ডবিধি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা জরুরী মনে করছি, যাতে করে

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়তে বিভিন্ন অপরাধের বিভিন্ন দণ্ড প্রয়োগের যৌক্তিকতা বুঝা সহজ হয় এবং অনুধাবন করা সম্ভব হয় বিভিন্ন অপরাধের মাত্রা ও দণ্ডের তারতম্যের কারণ। এরপর ইসলামী শরীয়তে বিচারের এই পদ্ধতি প্রয়োগের কারণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

হদ্দ ও হদ্দযোগ্য অপরাধ

(حد) হদ্দ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ রোধ করা। কোন কোন শাস্তিকে হদ্দ বলা হয়েছে এজন্য যে, শরীয়তের দণ্ড হদ্দ এসব অপরাধকে রোধ করে। ফকীহগণ হদ্দ এর সংগায় বলেছেন, হদ্দ একটি নির্দিষ্ট দণ্ড যা আল্লাহর হক হিসেবে পালন করা ওয়াজিব। এ সংগা থেকে বুঝা যায়, হদ্দযোগ্য অপরাধগুলোর দণ্ড আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত এবং আল্লাহর হক হিসেবে তা বাস্তবায়ন ও পালন করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ'র (শরীয়ত প্রবর্তক) পক্ষ থেকে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সেসব অপরাধ ও দণ্ডবিধি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।[১]

---

১ তাবঈনুল হাকায়েক : শারহে কানযুদ দাকায়েক, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৩, প্রথম প্রকাশ : মাতবায়ে আমিরিয়্যাহ, বুলাক, মিসর-১৩১৩ হিঃ। তাতে বলা হয়েছে– হদ্দ আল্লাহর হক বা অধিকার হওয়ার ভিত্তি কী? এ বিষয়টি বুঝার জন্য, আগে বুঝতে হবে, অপরাধের দ্বারা যে অধিকার লংঘিত হয় তা দু'ধরনের। (১) 'আল্লাহর অধিকার' বা হক পাশ্চাত্য আইনের দৃষ্টিতে যাকে Public Right বলা হয় এবং (২) 'বান্দার হক বা নাগরিক অধিকার' যাকে পশ্চিমা জগত Private Right বলে অভিহিত করে।

কোন অধিকার বা হককে আল্লাহর হক তখনই বলা যাবে যখন এটি একান্তই আল্লাহর অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা তাতে আল্লাহর অধিকারের মাত্রা বেশি হবে। এর বিপরীতে নাগরিক বা ব্যক্তি অধিকার কোন জিনিসকে তখনই বলা যাবে যখন তাতে কোন ব্যক্তি বা মানুষের একচ্ছত্র অধিকার থাকবে অথবা ব্যক্তি অধিকারের প্রাধান্য থাকবে।

ইসলামী শরীয়তে সাধারণ মানুষের সামষ্টিক কল্যাণে যে অপরাধে শাস্তি দেয়া হয় সেটিকে হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা। দাঙ্গা হাঙ্গামা রোধ কল্পে যে শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে তাকেও হক্কুল্লাহ বলা হয়। যে সব অপরাধের শাস্তি কুরআনুল কারীমে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে সেগুলোকে আল্লাহর হক বলা হয়। কারণ এসব অপরাধ সংঘটিত হলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় পক্ষান্তরে অপরাধীকে শাস্তি দিলে এর দ্বারাও সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। এজন্য দেখুন আত-তাশরিউল জিনায়ীল ইসলামী: আবদুল কাদের আউদাহ, ১ম খণ্ড, প্রকাশ : ১৩৬৮ হিজরী, অধ্যায় : কিসমে আম, পৃষ্ঠা-১৭৮।

www.pathagar.com

যে সব অপরাধে হদ্দ ওয়াজিব সেগুলো হলো চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, মদ্যপান, ধর্মদ্রোহিতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা। অবশ্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে। আমরা এখন এসব অপরাধের দণ্ডবিধি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

চুরি

যখন কোন বুদ্ধিমান, বালেগ, সুস্থ ব্যক্তি কোন ধরনের সংশয় সন্দেহ[১] ছাড়া সজ্ঞানে, স্বপ্রণোদিত হয়ে অপর কোন ব্যক্তির এমন সম্পদ তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে হাতিয়ে নেয় যা অস্থাবর মূল্যবান এবং সুরক্ষিত স্থানে রক্ষিত। উপরন্তু সম্পদটি মূল্যমানের দিক থেকে হাত কর্তনযোগ্য নেসাবের সমপরিমাণ হয়। এ ধরনের পরধন হাতিয়ে নেয়াকে ইসলামী আইনে চুরি বলে অভিহিত করা হয়।

এ সংগা থেকে বুঝা যায়, চুরির অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে অন্যতম শর্ত হলো– চোরের জ্ঞান থাকতে হবে, তাকে হতে হবে প্রাপ্তবয়স্ক এবং চুরিকৃত সম্পদের ন্যূনতম নেসাব পরিমাণ মূল্যমান থাকতে হবে এবং সম্পদটি অবশ্যই সুরক্ষিত জায়গায় থাকতে হবে আর সেই সাথে তা হাত কর্তনযোগ্য নেসাবের সমপরিমাণ হতে হবে।[২]

চুরির দণ্ড পবিত্র কুরআনের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

---

১ ফাতহুল কাদির, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২০।

২ এটি জমহুরে ফুকাহার অভিমত। অনেকেই এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। দাউদ জাহিরী ও হাসান বসরী র. কম বেশি সব ক্ষেত্রেই হাত কাটার কথা বলেছেন। খারিজীদের মতও তাই। মুতাকাল্লিমীনের একটি দল এ অভিমতের পক্ষে। যাহেরিয়া ও আহলে হাদীসের একটি অংশের মত হলো, নিসাব পরিমাণ হলে হাত কাটা যাবে যদিও সম্পদটি সুরক্ষিত জায়গাতে রাখা না থাকে। এ জন্য দেখুন– বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭৩-৩৭৭, প্রথম প্রকাশ : ১৩২৯ খ্রিস্টাব্দ, মাতবায়ে জামালিয়া এবং আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১৪-২১৫, মাতবায়াতুল ওয়াতান, মিসর, ১২৯৮ হিজরী।

www.pathagar.com

"চোর নারী পুরুষ যেই হোক তার হাত কেটে দাও; এটাই তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি; আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়। (সূরা : আল-মায়িদা : ৩৮)

অধিকাংশ ফকীহ এ ব্যাপারে একমত যে, এ আয়াতে চুরির শাস্তি হিসেবে যে হাত কর্তনের কথা বলা হয়েছে, এর মর্মার্থ হলো– ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলা। খারেজীরা বলেন, হাত কর্তনের দ্বারা কাঁধ পর্যন্ত কর্তনের কথা বলা হয়েছে। কারণ হাতের আঙ্গুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত সবটাকেই হাত বলা হয়। এর বিপরীতে অন্যেরা এও বলেছেন, এক্ষেত্রে হাত কর্তনের বেলায় শুধু আঙ্গুল কর্তন করাই হবে সমীচীন। কেননা আঙ্গুল দিয়ে ধরার কাজ করা হয়। অবশ্য এই ব্যাখ্যা প্রকাশ্য নসের (প্রামাণ্য দলীলের) পরিপন্থী। কারণ কুরআনুল কারীমের আয়াতে পরিষ্কার হাত কর্তনের কথা উল্লেখ আছে আঙ্গুল কর্তনের কথা নেই। হাত শব্দের ব্যাপ্তি ও ব্যবহার কোন কোন সময় কব্জি পর্যন্ত হয় কখনো কনুই পর্যন্ত হয় আবার কোন সময় কাধ পর্যন্ত হয়। এসব সংশয় হাদীসের সাহায্যে দূর হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, 'চোরের হাত কব্জি পর্যন্ত কাটা উচিত।' কুরআনুল কারীমের নস দ্বারাও এ কথাই সুস্পষ্ট হয়। অতএব এ হাদীসকেই প্রমাণ হিসেবে ধরে নিতে হবে। কারণ শাস্তির বেলায় যা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় তাকে প্রামাণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়।[১]

ডাকাতি

ডাকাতির দণ্ডাদেশের ব্যাপারে মূল বিধান এই আয়াত–

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُّقَتَّلُوْٓا أَوْ يُصَلَّبُوْٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

"যারা আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো তাদেরকে হত্যা অথবা শূলিবিদ্ধ করা অথবা বিপরীত দিকের হাত পা কেটে দেয়া অথবা তাদেরকে দেশান্তর করা। এটাই দুনিয়ায় তাদের জন্যে লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্যে পরকালে তো বড় শাস্তি রয়েই গেছে।" (সূরা আল মায়িদা : ৩৩)

---

১ আল-মাবসূত, সারাখসী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৩৩-১৩৪, প্রকাশ : ১৩৩৪ হিজরী।

www.pathagar.com

অবশ্য কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, এ আয়াত নবী স. এর যুগে যারা মুরতাদ হয়েছিল তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এরা মুরতাদ হয়ে রসূলুল্লাহ স. এর উটসহ অন্যদের উটও নিয়ে গিয়েছিল। এই অপকর্মের জন্য তাদেরকে ধরে এনে বিপরীত দিকের হাত-পা কেটে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদের চোখ গরম শলাকা দিয়ে ফুটো করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহর মত হলো, এই আয়াতে ডাকাত ও পথদস্যুদের শাস্তির বিধানাবলি নাযিল করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ ফকীহের কথাই ঠিক। কেননা এ আয়াতের পর আরো ইরশাদ হয়েছে–

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ○

"কিন্তু যারা তাদের ওপর তোমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগেই তওবা করেছে তাদের হাত পা তোমরা কাটবে না।" (সূরা আল মায়িদা : ৩৪)

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পথদস্যু ও ডাকাতদের তওবা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন গ্রেফতার হওয়ার আগেই তারা তওবা করে সৎপথে ফিরে আসার অঙ্গীকার করবে। এ শর্ত কাফেরদের তওবা কবুল করার ব্যাপারে নয়; যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে তাদের ব্যাপারে।[১]

বস্তুত মুহারাবা বা যুদ্ধ করার বিষয়টি নিয়েই মতভিন্নতা রয়েছে। ফকীহদের দৃষ্টিতে মুহারাবা বলতে বোঝানো হয়েছে শহরের আবাসিক এলাকার বাইরে রাজপথে সশস্ত্র ডাকাতি করা (অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তথা সরকারের নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করা)। এই ধরনের অপরাধীর উপর হদ্দ ওয়াজিব।

সশস্ত্র অবস্থা ছাড়া সাধারণ নাগরিক ও অধিবাসীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা মুহারাবা কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, ধারালো ও ক্ষতিকর অস্ত্র ছাড়া গোলযোগ সৃষ্টিকারীকেই মুহারিব বলা হবে। কোন কোন ফকীহ বলেন, ধারালো ও ক্ষতিকর অস্ত্রধারণ করাটাই হবে মুহারিবের পর্যায়ভুক্ত। অন্যরা বলেন, মুহারাবা আসলে ধারালো অস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং ক্ষতিকর যে কোন জিনিস (যেমন লাঠি, হকিস্টিক, রড, রামদা, কিরিজ, বন্দুক ইত্যাদি) দিয়ে গোলযোগ বাধানোই মুহারাবা। অবশ্য অধিকাংশ ফকীহ যা গ্রহণ করেছেন তাই সঠিক মত। তা হলো, কেউ যদি

---

১ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭৯-৩৮০; মুঈনুল হুক্কাম ফি মা তারাদ্দাদু বাইনাল খাসামাইনে ফিল আহকাম, পৃষ্ঠা-১৮৫, প্রথম প্রকাশ : ১৩০০ হিজরী, আমিরিয়া, বুলাক, মিসর ।

www.pathagar.com

অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্যে হামলা করে, হামলাকারী অস্ত্র হিসেবে যাই ব্যবহার করুক, তার হাতে লাঠি, বন্দুক, দা, কিরিচ যাই থাকুক না কেন, যা দিয়ে অন্যকে ঘায়েল করা যায়, তাতেই সে মুহারিব বলে বিবেচিত হবে এবং তার বিরুদ্ধে অত্যাচারী আঘাতকারীর সব দণ্ড প্রযুক্ত হবে।[১]

এখন রইল আবাসিক এলাকায় ত্রাস সৃষ্টির বিষয়টি। ইমাম আবু হানিফা র.-এর দৃষ্টিতে আবাসিক এলাকায় ত্রাস সৃষ্টির কারণে সংশ্লিষ্ট অপরাধী ত্রাস সৃষ্টিকারীর দণ্ডে দণ্ডিত হবে। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও কোন কোন হানাফী ফকীহ'র মতও তাই। তাঁরা মনে করেন, আবাসিক এলাকায় ত্রাস সৃষ্টির অপরাধকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ মনে করাই উত্তম। কেননা, আবাসিক এলাকা হবে শান্তি নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য সহমর্মিতা ও সহযোগিতার কেন্দ্র। এমন জায়গায় শক্তি প্রয়োগ করে লুটতরাজ করা অপরাধ প্রবণতা ও হিংস্রতার আলামত। এসব কর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দানের দাবী করে।

এ প্রেক্ষিতে এ কথাও বিবেচ্য যে, আবাসিক বাড়িঘরে ডাকাতিকালে অনেক ডাকাত ঘরের দামী দামী জিনিস নিয়ে যায়। পথদস্যূদের তুলনায় এরা বেশি ক্ষতিকর। কারণ রাস্তাঘাটে মানুষ খুব বেশি সম্পদ বহন করে না। এ কথাও স্পষ্ট যে শহরের ভিতরে আবাসিক এলাকায় ডাকাতিকারী পথের কাফেলা লুণ্ঠনকারীদের অপেক্ষায় বেশি দুঃসাহসী।[২]

ডাকাতি সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, ডাকাতির বিষয়টি ব্যাপক। এ ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিতের রকম ভেদে

---

১ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮০।

২ আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-৩৯; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৩৮০। ইবনে রুশদ লিখেন, ইমাম শাফেয়ী 'শাওকাত' কে সন্ত্রাসী হিসেবে গণ্য করার জন্য শর্তারোপ করেছেন। অপরাধীদের সংখ্যা তার কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।
শাওকাত অর্থ হলো, আক্রমণকারীর আঘাত করার মতো শক্তি সামর্থ থাকতে হবে, যে শক্তির সাহায্যে সে অন্যদের কাবু করতে পারে। ইমাম শাফেয়ী এ কথাও বলেছেন, শাসক যখন দুর্বল হয়ে যায় ডাকাত ও সন্ত্রাসীরা শহরের ভিতরে এসে ডাকাতি ও ভীতি ছড়ানোর মতো কারণেও তাদেরকে মুহারিব বলা হবে। অন্যসব ব্যাপারে যেমন কেউ কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়াকে লুট আখ্যা দেয়া হবে। মুহারাবা ডাকাতি নয়। ভারত উপমহাদেশে যে বিষয়টিকে waging war against the king বলে অভিহিত করা হয়।

www.pathagar.com

বিধানও বিভিন্ন ধরনের হবে। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কোন মহাসড়ককে ঝুকিপূর্ণ করে তোলে কিন্তু সে কাউকে হত্যা করেনি এবং কারো ধন-সম্পদ লুটও করেনি শুধু এক ধরনের ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে, তা হলে তাকে মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্যে দেশান্তর করা হবে। এ ক্ষেত্রে যদি ত্রাস সৃষ্টিকারী কারো ধন-সম্পদ লুট করে থাকে তবে তার ডান হাত ও বাম পা কেটে দেয়া হবে। আর যদি কেউ মহাসড়কে কাউকে হত্যা করে কিন্তু সম্পদ লুট করেনি তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।[১]

আর কেউ যদি মাল লুট করে ও পথিককে হত্যা করে তাহলে এর শাস্তির ব্যাপারে বিচারকের অধিকার রয়েছে, ইচ্ছা করলে তিনি অপরাধীকে হাত পা কেটে শূলিতে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে হাত পা না কেটে শুধু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারেন।[২]

ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, এমন অপরাধীকে হত্যা করা হবে কিন্তু শূলে চড়ানো হবে না। কেননা, হাত পা কেটে আবার শূলে চড়ালে এক অপরাধে দু'বার শাস্তি দানের ব্যাপার ঘটে। দু'টি স্বতন্ত্র শাস্তি দু'টি ভিন্ন প্রেক্ষিতে হতে পারে। এখানে ভিন্ন দু'টি দণ্ডকে একই সাথে মেশানো হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, ডাকাতরা যদি মহাসড়কে ডাকাতিকালে হত্যা করে এবং সম্পদ লুট করে তাহলে শূলিতে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, আর যদি কারো ধন-সম্পদ না নিয়ে থাকে তাহলে শুধু মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করতে হবে। আর যদি শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করে থাকে, হত্যা না করে থাকে তাহলে ডান হাত আর বাম পা কেটে দেয়া হবে। আর যদি শুধু মহাসড়কে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে থাকে তাহলে শুধু দেশান্তর করার শাস্তিযোগ্য হবে। এ মতামত ইমাম আবু হানিফার মতামতের খুবই কাছাকাছি।[৩]

ইমাম মালিক র. বলেন, ডাকাত যদি হত্যা করে তাহলে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিচারকের হাত পা কেটে শাস্তি দেয়া কিংবা দেশান্তর করার অধিকার নেই। বিচারক এ ক্ষেত্রে শুধু শূলে চড়িয়ে অথবা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারেন।

---

১ মুঈনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা-১৮৫।

২ আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-৩৬।

৩ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১-২৮১; আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়াহ, পৃষ্ঠা-৩৬।

www.pathagar.com

ইমাম মালিক র.-এর মতে, ডাকাত যদি মহাসড়কে শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করে থাকে, কাউকে হত্যা করেনি তাহলে বিচারক ইচ্ছা করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড, হাত-পা কর্তন কিংবা শূলিতে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করতে পারেন কিন্তু দেশান্তর করতে পারবেন না।

আর যদি তাদের দ্বারা শুধু মহাসড়কের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হয়ে থাকে কোন লুণ্ঠন, হত্যা সংঘটিত না হয় তাহলে বিচারক ডাকাতদেরকে মৃত্যুদণ্ড, শূলিতে চড়িয়ে ফাঁসি অথবা হাত পা কর্তনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

ইমাম মালিক র.-এর মতে, দণ্ডাদেশগুলোতে বিচারককে যে কোন একটি বা একাধিক দণ্ড প্রয়োগের অধিকার দেয়ার অর্থ হলো, বিচারককে অনুধাবন ও চিন্তা শক্তি প্রয়োগের অধিকার দেয়া। কারণ ডাকাত যদি এমন পর্যায়ের ব্যক্তি হয়ে থাকে যে, সে একজন নেতা, বহু লোকের উপর তার কর্তৃত্ব চলে, সে অপরাধ কর্মের একজন পরিকল্পনাকারী, তাহলে ইজতিহাদের দাবী এই যে, তাকে হত্যা কিংবা শূলে চড়িয়ে ফাঁসি দেয়া হবে। কারণ শুধু হাত পা কেটে দিলেই তার দ্বারা আর অপরাধ সংঘটিত হবে না এমনটি মনে করা যাবে না। কারণ হতে পারে যে, সে ঠায় বসে নির্দেশ দিয়ে অন্যদের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত করবে। এমতাবস্থায় তার হাত পা কেটে দেয়ার দ্বারাই তার ক্ষতিসাধন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না, তাকে হত্যা করাই হবে নিরাপদ। আর সে যদি শুধু দুঃসাহসী, শক্তিশালী ও আগ্রাসী হয়ে থাকে তাহলে হাত পা কেটে দিলেই তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদি ডাকাত উল্লেখিত দুই পর্যায়ের কোনটিতেই না পড়ে তা হলে তাকে শক্ত পিটুনি দিয়ে দেশান্তর করাটাই হবে যথেষ্ট।

কেউ কেউ বলেন, ডাকাতের দণ্ডাদেশের ব্যাপারে বিচারকের এখতিয়ার রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে উল্লেখিত চার শাস্তির যে কোন একটি প্রয়োগ করতে পারেন।[১]

ডাকাতি ও মহাসড়কে দস্যিপনার অপরাধে উল্লেখিত দণ্ডাদেশ সম্পর্কে যে কোন ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা করবে, সে অনুধাবন করতে পারবে ডাকাতির ক্ষতিকর প্রভাব কতো ব্যাপক। ডাকাতি ও লুণ্ঠনের কারণে জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, পর্যটকদের মধ্যে আতংক বিরাজ করে। তাদের ছড়ানো আতংক সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। দেশের মধ্যে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে ইত্যাকার

---

১ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১।

www.pathagar.com

ক্ষতি ও ব্যাপকতার বিষয়টি চিন্তা করলে কেউ এমনটি বলবে না যে, ইসলামী শরীয়া ডাকাতি ও দস্যুতা দূরীকরণের ডাকাত ও দস্যুদের যে শাস্তি বিধান করেছে তা খুব কঠিন ও অমানবিক।

অবশ্য কোন কোন ফকীহ কুরআন মজিদে বর্ণিত শাস্তিসমূহ প্রয়োগের ব্যাপারে বিবেচনা অবলম্বনের পক্ষে। তাদের কথা মেনে নিলে শাস্তি নির্ধারণের ক্ষমতা আরো ব্যাপকতর হয়। যেমন কোন কোন অপরাধী এমন রয়েছে মৃত্যুর হুমকি তাকে ভীত করে না, কিন্তু হাত পা কেটে দেয়ার হুমকি তার মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে। এমন অপরাধীরা যদি হাত পা কাটা অপরাধীদেরকে চোখের সামনে দেখতে পায় তাহলে তারা অপরাধ থেকে ফিরে আসার প্রতি আগ্রহী হবে। পক্ষান্তরে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্তের মৃত্যু অধিকাংশ মানুষই ভুলে যায়। অনেক আত্মাভিমানী লোক রয়েছে যারা মৃত্যুর চেয়ে হাত পা কর্তনকে ভয় পায়। বস্তুত সেই দণ্ডই তো কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় যা মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখে। তাতেই শাস্তির সার্থকতা।

ব্যভিচার

ইমাম আবু হানিফা র. শাস্তিযোগ্য ব্যভিচারীর সংগা এভাবে করেছেন– এমন কোন জীবিত নারীর সাথে যৌনিদ্বারে সঙ্গম করা যে নারী তার বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা মালিকানাধীন দাসী নয় এবং মালিকানাধীন দাসী হওয়া কিংবা বিবাহিত স্ত্রী হওয়ার মতো কোন সন্দেহের অবকাশও এ ক্ষেত্রে নেই।

নারীকে তখনই ব্যভিচারিণী বলা যাবে যখন সে স্বেচ্ছায় এমন পুরুষকে সঙ্গমে সম্মতি দেবে।[১]

অন্যান্য ফকীহগণের সংগাও এর কাছাকাছি তবে একটু পার্থক্যও আছে। হাম্বলী ও শাফেয়ীগণ পায়ুদ্বারে সঙ্গমকেও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।[২]

বিবাহিত ও অবিবাহিত যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি

অবিবাহিত পুরুষের যিনার ব্যাপারে সর্বসমর্থিত মত হলো, তাকে বেত (দোররা) মারা হবে। এ ব্যাপারে সরাসরি কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে–

---

১ বাদায়ে আস-সানায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩-৩৪; ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩০-৩১; ফতোয়া আলমগীরী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪৩।

২ আল-আহকামুস সুলতানিয়াঃ আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৪৭, প্রকাশ : ১৩৫০ হিঃ তাসহীহ ও হাওয়াশী, শাইখ হামেদ আল মাক্কী; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-২১২; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬২।

www.pathagar.com

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ○

ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়কেই একশ বেত্রাঘাত (দোররা) করো।' (সূরা আল-নূর : ২)

অবিবাহিতকে একশ' দোররা মারার পাশাপাশি দেশান্তরও করা হবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ আছে।

ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে, অবিবাহিত নারী পুরুষকে শুধু একশ দোররা মারা হবে আর কিছু নয়। হ্যা, বিচারক যদি মনে করেন যে, তাকে সংশোধনের স্বার্থে দেশান্তর করা দরকার তাহলে বিচারক তা করতে পারেন।[১]

ইমাম শাফেয়ী র.-এর দৃষ্টিতে, ব্যভিচারীকে একশ দোররা মারার সাথে সাথে দেশান্তর করাও ওয়াজিব। তিনি আরো বলেন, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়কে কোন ভেদাভেদ না করে একবছরের জন্যে দেশান্তর করতে হবে। এই দেশান্তরের অর্থ হলো, তাদেরকে এতটুকু দূরত্বে পাঠাতে হবে যেখানে যেতে অন্তত একদিন এক রাতের সময় লাগে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.ও এ মত ব্যক্ত করেন। ইমাম মালিক র. বলেন, শুধু পুরুষকে দেশান্তর করা হবে, মহিলাকে নয়। ইমাম আওযাঈ র. ও এর মত ব্যক্ত করেন।

যারা শুধু দেশান্তরের কথা বলেন, তারা উবাদা উবনুস সাবিত রা. এর বর্ণিত হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। উবাদা রা. বলেন, নবী কারীম স. ইরশাদ করেন, তোমরা আমার কাছে এর বিধান শোন। অবিবাহিত পুরুষ যদি অবিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচার করে তাহলে তাদের শাস্তি একশ' দোররা এবং এক বছরের দেশান্তর। আর যদি বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচার করে তাহলে একশ দোররা মারার পর পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। তাঁরা আবু হুরাইরা ও খালিদ ইবনে জুহানী রা.-এর বর্ণনাও দলীল হিসেবে পেশ করেন। সেই বর্ণনাটি হলো– একদিন এক গ্রাম্য ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স. এর কাছে এসে বলল, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমাদের জন্যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করুন। সে সময় সেই ব্যক্তির প্রতিপক্ষও উপস্থিত ছিল। প্রতিপক্ষ ছিল প্রথমোক্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। সে বলল, জী হ্যাঁ, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমাদের

---

১ দেশান্তর বা বাড়ি ছাড়া করার হুকুমটি সেই যুগে করা হয়েছিল যখন মানুষের যাতায়াতের মাধ্যম ছিল-উট কিংবা পায়ে হাটা অথবা ধীরগতির কোন যানবাহন। বস্তুত জালাওয়াতান বা দেশান্তরের শাস্তি বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে দেশের অভ্যন্তরের দূরবর্তী কোন বন্দিশালাও হতে পারে। (অনুবাদক)

www.pathagar.com

ফয়সালা করুন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। নবী কারীম স. ইরশাদ করেন, বলো। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, আমার ছেলে তার ওখানে মজদুরী করে। এমতাবস্থায় সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আমাকে কোন একজন বলল, তোমার ছেলের শাস্তি হলো 'প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড'। একথা শুনে নালিশ না করার জন্যে আমি তাকে একশ বকরী ও একটি দাসী দান করেছি। অতঃপর জ্ঞানী লোকজনকে আমি জিজ্ঞেস করলে তারা জানায়; আমার ছেলের শাস্তি হলো, একশ দোররা ও এক বছরের দেশান্তর। এ ক্ষেত্রে প্রস্তরঘাতের শাস্তি সেই মহিলার।

দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ্ স. ইরশাদ করেন, যে প্রভুর হাতে আমার জীবন, আমি তার কসম করে বলছি! আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মতো ফয়সালা দেবো। বকরী ও দাসী তোমাদের ফেরত দেয়া হবে এবং তোমার ছেলেকে অবশ্যই একশ' দোররা মারা হবে এবং এক বছর দেশান্তর করা হবে।

ইমাম মালিক র. দেশান্তরকে এই অপরাধের শাস্তি দোররার সাথে যুক্ত মনে করেন না। কারণ নারীকে দেশান্তর করলে তার চারিত্রিক স্খলনের আশংকা আরো বেড়ে যাবে। তাতে শুধু ব্যভিচারই নয় আরো মন্দকাজের সূত্রপাতও ঘটতে পারে। ইমাম মালিক র. এর এ অভিমত অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে ইমাম মালিকের এই দলীল গ্রহণের নীতি খুবই প্রশংসনীয় হয়েছে।

হানাফীরা এ ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশের বাহ্যিক অর্থ প্রয়োগ করেন। হানাফীরা বলেন, আয়াতে দোররা মারা ছাড়া আর কোন শাস্তির উল্লেখ নেই। কাজেই দেশান্তরের ফয়সালা দানকারীরা কুরআনের দলীলের উপর আরো অতিরিক্ত যোগ করেছেন, যা প্রকৃত প্রস্তাবে বিকৃতির পর্যায়ভুক্ত।

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কুরআনের কোন দলীলকে কোন এক ব্যক্তির খবরে ওয়াহিদ সূত্রে বর্ণিত হাদিস দ্বারা বাতিল করা যায় না। শাফেয়ীগণ যে দলীল পেশ করেন, তা একজন মাত্র সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে হানাফীগণ হযরত উমর রা. সহ আরো অনেক সাহাবায়ে কিরামের কর্মকাণ্ডকে এর পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেন। সেসব ক্ষেত্রে এসব সাহাবী একশ' দোররা মারা ছাড়া দেশান্তরের শাস্তি প্রয়োগ করেন নি।[১]

---

১ মুঈনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা-১৮২; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, পৃষ্ঠা-৩৬৪-৩৬৫, ২য় খণ্ড; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-২১৬; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৪৭।

www.pathagar.com

বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি

'মুহসিন' ঐ ব্যক্তি যে বিবাহিত অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। এখানে মুহসিন এর শর্তাবলী বর্ণনা করা হবে অতঃপর বর্ণিত হবে মুহসিন তথা বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক র. এর মতে প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, সচেতন, স্বাধীন এবং শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা এবং মুসলমান হওয়া মুহসিনের জন্যে শর্ত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী র. মুহসিন হওয়ার জন্যে মুসলমান হওয়া শর্ত মনে করেন না। যারা মুহসিন হওয়ার জন্যে ইসলামকে শর্ত মনে করেন, তাদের প্রমাণ হলো, ইহসান একটা সম্মান আর ইসলাম ছাড়া সম্মানের প্রশ্নই আসে না। পক্ষান্তরে বিপরীত মতের লোকেরা ইবনে উমর রা. এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেন। হাদীসটি ইমাম মালিক র. নাফে' সূত্রে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ স. এক ইহুদী পুরুষ ও এক ইহুদী মহিলাকে ব্যভিচার করার কারণে প্রস্তর আঘাতে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিয়েছিলেন। এ হাদীসটির ব্যাপারে সবাই একমত।

যারা ব্যভিচারে মুহসিন হওয়ার জন্যে ইসলামকে শর্ত হিসাবে আরোপ করেননি আমি তাদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেই। প্রথমত উল্লেখিত হাদীসের আলোকে দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের দণ্ডে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিষয়টি এক ধরনের শাস্তি ও আযাবও বটে। এটাতো হতে পারে না যে, একজন মুসলমান ইসলাম গ্রহণের কারণে আযাব ও শাস্তি উভয়টা ভোগ করবে আর অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে কোন শাস্তিই পাবে না।[১]

জমহুর ফকীহদের কাছেও বিবাহিত ব্যভিচারির শাস্তি প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা অথবা সমপর্যায়ের বিকল্প কোন শাস্তি প্রয়োগ করা।[২] এই শাস্তি (বা হদ্দ) সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। জমহুর এ ক্ষেত্রে দোররা মারার আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে কর্মচারী তার মনীবের স্ত্রীর সাথে যিনা করে, তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় রসূলুল্লাহ স. বলেন, "উনাইস সেই লোকের

---

১ মুঈনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা-১৮২; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৮; আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৪৭।

২ আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১২০-১২১, প্রকাশ : ১৩৪৮ হিজরী, মুদ্রণ-আল মানার।

www.pathagar.com

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো, সে যদি যিনার কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দাও।"

উনাইস পরদিনই সেই মহিলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে মহিলা ব্যভিচারের কথা স্বীকার করেন, তাই রসূলের নির্দেশে তাকে প্রস্তরঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। অনুরূপভাবে মুঈয এর ঘটনায় বলা হয়েছে– তিনি যিনা করার পর রসূলুল্লাহ স. এর কাছে গিয়ে স্বীকার করলে তিনি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। গামেদিয়ার ঘটনাও অনুরূপই ঘটে। তিনি রসূলুল্লাহ স. এর কাছে যিনার স্বীকারোক্তি করলে তিনি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা দেন। সর্বশেষ ঘটনা দুটি বহু মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো কুরআনুল কারীমের নির্দেশকেই শক্তিশালী করে।[১]

এ ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে যে, বিবাহিত ব্যভিচারীকে কি শুধু প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে, না একশত দোররাও মারা হবে? হাসান বসরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এবং দাউদ জাহেরীর মতে আগে শত দোররা মারা হবে অতপর রজম করা হবে।

এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ র. এর একাধিক মত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, বিবাহিত/বিবাহিতা যিনাকারীকে শুধু রজম করা হবে দোররা মারা হবে না। জমহুর ফুকাহাও এ মত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, রজম করার সাথে দোররা মারা যাবে না।

যারা রজমের সাথে দোররা প্রয়োগের কথা বলেন, তারা যিনা সংক্রান্ত আয়াতের অনির্দিষ্টতাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। এ ক্ষেত্রে তারা হযরত আলী র. এর একটি সিদ্ধান্ত প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। ঘটনা মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি হলো, হযরত আলী রা. শোরাহা হামদানিয়াকে বৃহস্পতিবারে একশ দোররা মারেন এবং জুমআর দিন রজম বাস্তবায়ন করে বলেন, অতঃপর আমি কুরআনের নির্দেশে দোররা কার্যকর করেছি এবং রসূলের সুন্নাহর নির্দেশে রজম বাস্তবায়ন করেছি। তিনি উবাদা বিন সাবিতের হাদীস দিয়েও দলীল দেন, যে হাদীসের উল্লেখ ইতঃপূর্বে করা হয়েছে।

---

১ আল-মাবসূত, আস-সারাখসি, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৩৬; মুঈনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা-১৮২; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৩, আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-২১২; আল-আহকামুস সুলতানিয়া আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৪; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২০; আহকামুল কুরআন, জাসসাস, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫৬ ও ২৫৭; নাইলুল আওতার: শাওকানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০, ২৫।

www.pathagar.com

এর বিপরীতে জমহুরের দলীল হলো, রসূলুল্লাহ স. গামেদিয়া, মুঈয ও জুহাইনিয়া গোত্রের এক মহিলাকে রজমের শাস্তি প্রদান করেন, কিন্তু এদের কাউকেই রজমের আগে দোররা প্রয়োগ করেননি। এ প্রেক্ষিতে বলা হয়, বিবাহিতের যিনার অপরাধে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে রজমের আগে দোররা প্রয়োগের শাস্তির বিধান রহিত হয়ে গেছে।

এ বিষয়টিও এক্ষেত্রে বিবেচ্য, হদ্দ প্রয়োগের আসল উদ্দেশ্য ভীতি সৃষ্টি করা, যাতে শাস্তির ভয়ে মানুষ এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকে। বস্তুত রজমের সাথে এ ক্ষেত্রে দোররা প্রয়োগের দ্বারা ভীতির মধ্যে কোন হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। আমার মতে, রজমের সাথে দোররা প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। কেননা, বিবাহিতের যিনার শাস্তির ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমের যে আয়াতের আলোকে দোররা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার মূলে রয়েছে বহু হাদীস, কোন একটি মাত্র হাদীসের দ্বারা পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। বস্তুত রজম প্রয়োগের দ্বারা কোন ব্যভিচারীর শাস্তি প্রয়োগের পর সে ক্ষেত্রে আবার দোররা প্রয়োগ করা একটি বাড়তি সংযোজন বটে যা নিষ্প্রয়োজনীয়।[১]

---

১ বিদায়াতুল মুজতাহিদঃ ইবনে রুশদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৩-৩৬৪; আল-মুগনীঃ ইবনে কুদামা, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১২৮; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃ-২৪৭-২৪৮।

www.pathagar.com

কযফ তথা অপবাদ

অপবাদ বা কারো প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপজনিত অপরাধের শাস্তি বিধানের ভিত্তি সূরা আল-নূর এর ৪ নম্বর আয়াত। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

"যারা সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে কিন্তু চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত লাগাবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরাইতো সত্যত্যাগী।" (সূরা আল-নূর : ৪)

ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী এবং ভিত্তিহীনভাবে পৈত্রিক সম্পর্ক অস্বীকারকারীর শাস্তি সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। এ দুটি ছাড়া আর যতো অপবাদ আছে এগুলো কযফ দণ্ডারোপের পর্যায়ভুক্ত নয়। অন্যান্য অপবাদে বিচারের আওতায় শাস্তি দেয়া যেতে পারে কিন্তু হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

কযফ এর দণ্ড প্রয়োগ করার শর্ত হলো, কাযিফ (মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী) প্রাপ্তবয়স্ক সজ্ঞান এবং যার উপরে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার বিবাহিত বা মুহসিন হওয়া। অপবাদের ক্ষেত্রে মুহসিন এবং ব্যভিচারের ক্ষেত্রে মুহসিন হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ব্যভিচারী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিকেই মুহসিন বলা হবে– প্রাপ্ত বয়স্ক সজ্ঞান স্বাধীন মুসলমান অবস্থায় যার কোন নারীর সাথে বৈধ পন্থায় বিবাহ হয়েছে এবং সেই বৈধ স্ত্রীর সাথে তার মিলন ঘটেছে। পক্ষান্তরে মিথ্যা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার বিবাহিত অবস্থায় স্ত্রীগমণ আবশ্যিক নয় শুধু মুসলমান, বালেগ, আকেল, স্বাধীন এবং অন্যদের দৃষ্টিতে সৎচরিত্রের অধিকারী হওয়াই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি ৮০ টি কষাঘাত। কুরআনুল কারীম পরিষ্কার ভাষায় (ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً) ৮০ কষাঘাত শব্দ উল্লেখ করেছে। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। সকল ফকীহ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীকে ৮০ কষাঘাত ছাড়াও তার আরো

www.pathagar.com

শাস্তি হলো, এ দণ্ডে দণ্ডিত হলে তার কোনো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا "কখনো তাদের কোনো সাক্ষ্য গ্রহণ করো না" বলে কুরআনুল কারীম দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা দিয়েছে। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, "এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে খুবই ন্যায়নিষ্ঠ কিন্তু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় যারা মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে দণ্ডিত হয়েছে।"

যদি মাকযুফ (যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে) কাযিফকে (অপবাদ আরোপকারী) ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না এ ব্যাপারে ফকীহের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। ইমাম আবু হানিফা র. এবং অন্যান্য ফকীহের মতে, মিথ্যা অপবাদকারীকে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, এই অপবাদের সংবাদ প্রশাসকের কাছে পৌঁছুক বা না পৌঁছুক। অনেকেই বলেন, মিথ্যা অপবাদ দেয়ার সংবাদ যদি সংশ্লিষ্ট বিচারক বা প্রশাসক জেনে যায় তাহলে আর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে ক্ষমা করে দিলেও অপরাধীর শাস্তি রহিত হবে না। যদি বিচারক বা প্রশাসক না জানে তাহলে ক্ষমা প্রযোজ্য হতে পারে।

এ ব্যাপারে ইমাম মালিক র. একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর কোন অভিমত ইমাম শাফেয়ীর র. মতের অনুরূপ। এর বিপরীতে তিনি এটাও বলেছেন, যদি এ সংবাদ বিচারক জানতে পারেন তাহলেও ক্ষমা প্রযোজ্য হবে। তা ছাড়া এ কথাও তিনি বলেছেন যে, বিচারকের জানার পরও ক্ষমা প্রযোজ্য হতে পারে যদি অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি তার মান অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে ব্যাপারটি চাপা দেয়ার জন্যে অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে বিচারকের কাছে আবেদন করে। এটিই ইমাম মালিক র. এর সর্বশেষ ও বহুল আলোচিত মত।

মিথ্যা অপবাদকারীকে ক্ষমা করার বৈধতা নিয়ে সৃষ্ট মতপার্থক্যের মূল উৎস হলো, কযফ তথা অপবাদজনিত অপরাধের অবস্থানজনিত পর্যায়। এখানে মূল প্রশ্নটি হলো, অপবাদ আসলে কোন পর্যায়ভুক্ত অপরাধ?

যারা বলেন, কযফ (অপবাদ) হক্কুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার), তাদের দৃষ্টিতে যিনার মতো এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলেও অপরাধী ক্ষমা পাবে না। আর যারা কযফকে হক্কুল ইবাদ (মানুষের অধিকার) বলেছেন, তাদের দৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রযোজ্য। আর যাদের কাছে কযফ একই সাথে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদত বিনষ্টকারী তাদের মত হলো, যদি অপবাদ

www.pathagar.com

আরোপের সংবাদ বিচারকের জ্ঞাত হয়ে যায় তাহলে আর ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না। আর যাদের দৃষ্টিতে এখানে আল্লাহ ও বান্দার হক উভয়টি রয়েছে তবে হক্কুল্লাহর চেয়ে হক্কুল ইবাদ প্রবল তাদের দৃষ্টিতে বিচারকের কাছে অপবাদ আরোপের সংবাদ পৌঁছে গেলেও ক্ষমা প্রযোজ্য হবে।

বস্তুত এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, অপবাদকারীর অপবাদ যদি আরোপিত ব্যক্তি স্বীকার করে নেয় তাহলে অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।

আমি মনে করি, কযফ (মিথ্যা অপবাদ) এর ধরন ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটি একটি মানবাধিকার (public right)। সামাজিক ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের চিহ্নিত করে তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা। যাতে করে সামাজিক স্বস্তি ও শান্তি স্থিতিশীল থাকে।

সমাজের কারো চরিত্রে কলংক বা অপবাদ আরোপ করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের ইজ্জত ও সম্মানের উপর আঘাত করার নামান্তর। এটিকে সামাজিক অধিকার হরণের পর্যায়ভুক্ত মনে করতে হবে। এমনটি মনে করার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ ক্ষেত্রে ক্ষমা করে দিলেও অপরাধীর বেলায় ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না। অপরাধীর শাস্তি রহিত করা হবে না।

মদপান

কুরআনুল কারীম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় (শরাব) মদপানকে হারাম (নিষিদ্ব) ঘোষণা করেছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

"হে মুসলমানগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আল মায়িদা : ৯০)

বিদায় হজ্জের সময় নবী কারীম স. কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'মদ সর্বৈব হারাম। তা ছাড়া যেসব জিনিস নেশাগ্রস্ত করে সবই হারাম।'

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবীযে[১] আসল (মধুর সাথে পানির তৈরী সিরকা) ও তাবা (যব ও গমের দ্বারা তৈরী মদ) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. এর

---

[১] **নবীয :** বলা হয় সিরকা জাতীয় জিনিসকে। আরবদের মধ্যে সিরকা খাওয়ার প্রচলন বেশি ছিল। তারা খেজুর পানিতে ভিজিয়ে রেখে সিরকা তৈরি করতো।

www.pathagar.com

কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "যে সব জিনিস মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে সেসবই হারাম।" ইমাম মুসলিম র. ইবনে উমর রা. সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেন, "প্রত্যেক মাদকদ্রব্য খমর" তথা মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।[১]

মদ হারাম সম্পর্কে এ জাতীয় অসংখ্য নস রয়েছে। বস্তুত মদ হারাম হওয়াটা একই সাথে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণাদিতে সাব্যস্ত। মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কারো সংশয় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে, আঙ্গুর দিয়ে যে মদ তৈরি করা হয় তার প্রতিটি ফোঁটা হারাম। তবে নবীয (সিরকা) এর ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। এক্ষেত্রেও এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, যে পরিমাণ নবীয পানে নেশা সৃষ্টি করে সে পরিমাণ পান করা হারাম কিন্তু সামান্য যা নেশাগ্রস্ত করে না তার পরিমাণ সম্পর্কে মতভিন্নতা দেখা যায়। হিজায তথা আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে এ পরিমাণও হারাম। কিন্তু ইরাকের ইবরাহীম নখয়ী, সুফিয়ান ছাওরী, ইবনে আবি লায়লা, শুরাইক, ইবনে শুবরামা এবং আবু হানিফা র. বলেন, আঙ্গুর ছাড়া অন্যান্য পানীয় দ্রব্যের মধ্যে নেশা সৃষ্টিকারী পরিমাণ হারাম কিন্তু মূল পানীয় হারাম নয়।[২]

এতোক্ষণ মদ পানের অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এখন মদ পানের শাস্তির কথায় আসা যাক। আল কুরআনে মদ পান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তির কথা বলা হয়নি। তদ্রূপ রসূলুল্লাহ স. ও মদ পানের শাস্তির ব্যাপারে সুর্নিদিষ্ট কোন শাস্তির কথা বলেননি। শরাব পানের অপরাধে রসূলুল্লাহ স. নির্দিষ্ট শাস্তিবিধান না করে জুতা, খেজুরের শাখা বা কাপড় পাকিয়ে রশির মতো করে তা দিয়ে মদ্যপকে পিটিয়েছেন। আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. এর কাছে একদিন এক মদ্যপকে নিয়ে আসা হলো। তিনি বললেন, 'ওকে পেটাও'। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমাদের একজন তখন সেই অপরাধীকে জুতা দিয়ে পেটাচ্ছিল, কেউ হাত

---

১ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮২ এবং আহকামুল কুরআন, আল জাসসাস, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৩২৪।

২ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, মুঈনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা-১৭৯-১৮০, বিদায়াতুল মুজতাদি, ইবনে রুশদ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৩, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭০-৩৭১; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-২১৫; আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৫২; আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২৪; নাইলুল আওতার, আশ-শাওকানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫০।

www.pathagar.com

কেউবা কাপড় দিয়ে আঘাত হানছিল। আবু হুরায়রা রা. আরো বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'ওকে তিরস্কার করো'। এ কথা শোনার পর লোকেরা ওকে বলতে লাগলো, ওহে তোমার কি আল্লাহর ভয় নেই? তুমি কি আল্লাহকেও ভয় করো না? মাতাল হয়ে রসূলুল্লাহ'র সামনে আসতে তোমার লজ্জা করলো না? এই ঘটনা সম্পর্কে ইবনে ফারহুন বলেন, এটা হলো মৌখিক শাস্তি। এ কথা থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে, হদ্দ এর সাথে তাযিরী শাস্তি একত্র হতে পারে।

একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, সাহাবায়ে কিরামের ধারণা, রসূলুল্লাহ স. এর সময় মদ পানের অপরাধে ৪০ ঘা মারা হতো। 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. মদ পানের অপরাধে মদ্যপকে দুটি খেজুর শাখা একত্র করে ৪০ বার প্রহার করেছেন। হযরত উমর রা. জুতার বদলে চাবুক ব্যবহার করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. শরাব পানের অপরাধে ৪০ বার প্রহার করেছেন। ইমাম শাফেয়ী র. এই বর্ণনার ভিত্তিতে ফয়সালা দিতেন। সায়েব বর্ণনা করেন, মদ্যপায়ীকে রসূলুল্লাহ স. এর সময়ে হযরত আবু বকর ও উমর রা. এর প্রথম যুগে হাত, চাদর ও জুতার দ্বারা প্রহার করা হতো। অতঃপর উমর রা. এটিকে ৪০ চাবুকে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে ফিসক ও অপরাধ প্রবণতা যখন বেড়ে গেলো তখন তিনি মদপানের শাস্তি ৮০ চাবুক নির্দিষ্ট করে দেন।

উল্লেখিত বর্ণনার ভিত্তিতে মদ পানের শাস্তির ব্যাপারে ফকীহদের সর্বসম্মত অভিমত হলো ৮০ চাবুক। ইমাম শাফেয়ী, আবু ছাওর ও দাউদ জাহেরী বলেন, মদ পানের শাস্তি ৪০ বেত্রাঘাত। জমহুর ফুকাহার দলীল হলো, হযরত উমরের শাসনামলে মানুষের মধ্যে যখন অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গেলো, তখন তিনি মদ পানের শাস্তির ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন বিভিন্ন সাহাবী তাকে মদ পানের শাস্তি ৮০ চাবুক নির্ধারণ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, এটিকেও অপবাদ আরোপের শাস্তির অনুরূপ করে নিন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী রা. থেকে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে, যখন কোন মানুষ মদ পান করে তখন তার হুঁশ জ্ঞান থাকে না। আর যখন হুঁশ জ্ঞান ও বোধ ঠিক থাকে না তখন যাচ্ছে তাই বকাঝকা করে। আর যখন যাচ্ছে তাই বকে তখন অন্যের উপর অপবাদ আরোপ করে। ফলে এই পরামর্শের ভিত্তিতে হযরত উমর রা. মদ পানের শাস্তি ৮০ চাবুক নির্ধারণ করেন। যদিও তিনি এর আগে মদ পানের অপরাধে ৪০ বার চাবুক মারতেন।

www.pathagar.com

অন্যদের দলীল হলো, রসূলুল্লাহ স. মদ পানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো শাস্তি নির্ধারণ করেননি বরং অপরাধীকে অনির্দিষ্ট পরিমাণ মারপিট করা হতো। সাহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ স. এর এই ধরনের শাস্তি গুণে দেখেছেন, প্রহারের পরিমাণ ৪০ বার হয়েছে। একটি বর্ণনাতে উল্লেখ রয়েছে, রসূলুল্লাহ স. ৪০ বার মদ্যপকে প্রহার করেছেন।[১]

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা আমরা বলতে পারি যে, মদ পানের শাস্তি ৪০ চাবুক থেকে ৮০ চাবুকে উন্নীত করেন হযরত উমর রা.। রসূলুল্লাহ স. এর পর সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শে তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এ কারণেই হযরত আলী রা. যখন হযরত উমর রা. কে ৮০ চাবুক মারার পরামর্শ দিলেন তখন তিনি এ কথাও বললেন, 'এটিই মদ পানের হদ্দ, যা রসূলুল্লাহ স. এর পর সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে।[২]

যে সব বর্ণনায় রসূলুল্লাহ স. মদ পানের অপরাধে তার সময়ে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি দেননি বর্ণিত হয়েছে, সেইসব বর্ণনাকে যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, রসূলুল্লাহ স. এর যুগে শরাব পানের অপরাধে সুনির্দিষ্ট কোন হদ্দ ছিল না, ছিল কেবল মাত্র তাযির। কারণ শরীয়তের পরিভাষায় অনির্দিষ্ট সাজাকে তাযির (শাস্তি) বলা হয়।

যে সব বর্ণনায় বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. এর সময় শরাব পানের অপরাধের শাস্তি চল্লিশ চাবুক নির্ধারিত ছিল, যেমনটি ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, যদি সেইসব বর্ণনা গ্রহণ করা হয় তাহলে এ প্রশ্নটি সামনে চলে আসে যে, এমতাবস্থায় এ সাজাকে কি তাযির বলা হবে, না হদ্দ? যেহেতু সাহাবীদের সময়েই ৪০ চাবুকের চেয়ে বেশি শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাই অতিরিক্ত প্রহারগুলোকে 'হদ্দ' বলা যাবে না 'তাযির' বলতে হবে।

শরীয়ত শাসকদেরকে এ অধিকার দিয়েছে যে, তারা যদি হদ্দ প্রয়োগ করে লোকদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত না করতে পারে তাহলে হদ্দ এর সঙ্গে তাযিরও যোগ করতে পারে।[১]

---

১ মুঈনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা-১৭৯-১৮০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৭। তাবসিরাতুল হুক্কাম, ইবনে ফারহুন, ফুটনোট ফাতহুল আলী আল মালিক, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৬৬, প্রথম প্রকাশ : মাতবায়ে আমীরিয়া, বুলাক, মিসর, ১৩০০ হিজরী; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-২৫৩; নাইলুল আওতার, শাওকানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯।

২ বর্তমান আইনের দৃষ্টিতে সেটি ছিল Act of Parliament (অনুবাদক)

www.pathagar.com

ইরতিদাদ বা ধর্মদ্রোহিতা

ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় বেঈমান হয়ে যাওয়াকে বলা হয় 'ইরতিদাদ'। ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্মমত গ্রহণ করুক বা না করুক তাতে কোন ফারাক নেই। কুরআনুল কারীমে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ○

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের দীন ত্যাগ করে এবং কাফের হিসেবে মৃত্যুবরণ করে দুনিয়ায় ও আখেরাতে এই ধরনের লোকদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই জাহান্নামী, জাহান্নামে তারা অনন্তকাল থাকবে।"

–(সূরা আল-বাকারাহ : ২১৭)

রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'যে মুসলমান দীন পরিবর্তন করে (তথা ইসলাম ত্যাগ করে) তাকে হত্যা কর।'

নবী কারীম স. যখন হযরত মুআয ইবন জাবালকে ইয়ামেনের শাসক নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "মুরতাদ নারী পুরুষকে দীনের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেবে, ফিরে আসতে অস্বীকার করলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে।"

এ হাদীস ছাড়াও বহু সংখ্যক সাহাবী সূত্রে মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত মুআয ইবনে জাবাল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম রা. থেকে এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাদের বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে কোন সাহাবীই দ্বিমত পোষণ করেননি। বস্তুত মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে সকল সাহাবীর ঐকমত্য রয়েছে।[২]

উল্লেখিত প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় ইরতিদাদের অপরাধ কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ। এবং এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়াটা সুন্নাহ ও ইজমায়ে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত।

---

১ মুঈনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা-১৮৬; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-৫১-৫২; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৭৪।

২ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮৩; আল মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৪; আহকামুল কুরআন, আবু বকর আল-জাসসাস, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৬; নাইলুল আওতার, শাওকানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৮-১০০।

www.pathagar.com

মুরতাদ যদি বহু লোক এক সঙ্গে হয়ে থাকে এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনে সমকালীন শাসকের দ্বারা এরা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে এই ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাসকের যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। তখন শাসকের দায়িত্ব হলো তাদের মুরতাদ হওয়ার কারণ উদঘাটন করা। কারণ অনুসন্ধানে যদি অনুমিত হয় যে, এরা দীনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয়ের কারণে দীন ত্যাগ করেছে, তাহলে কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে তাদের সংশয় নিরসন করতে হবে এবং তাদেরকে পুনরায় দীন ইসলামে ফিরে আসার জন্য অবকাশ দিতে হবে। যদি তারা তাওবা করে তবে তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে এবং তারা পূর্বের মতোই মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

মুরতাদের তাওবা করানোর ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। অনেক ফকীহর মত হলো, মুরতাদদেরকে শাস্তি দেয়ার আগে তাওবা করার জন্যে প্রস্তাব করা ওয়াজিব। ইমাম মালিক, সুফিয়ান ছাউরী ও ইমাম আউযায়ী র. এ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ র. থেকেও এ মতের সমর্থনে একটি বক্তব্য আছে।

অবশ্য ইমাম মালিক র. বলেন, কেউ যদি গোপনে ধর্মদ্রোহিতায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে শাস্তি দেয়ার আগে তাওবা করানোর চেষ্টা করা জরুরী নয়। বস্তুত তাওবা করার আগ্রহ যদি মুরতাদের পক্ষ থেকে হয় তাহলে তাওবা করানোতে দোষ নেই। এ ছাড়া প্রকাশ্য ধর্মদ্রোহিদেরকে তাওবা করার সুযোগ দিতে হবে যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ র. থেকে এমন একটি বক্তব্যও রয়েছে যে, মুরতাদকে তাওবার প্রস্তাব করা ওয়াজিব নয় মুস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ী র. এরও অপর একটি বর্ণনা এমন রয়েছে– "যে দীন পরিবর্তন করেছে তাকে হত্যা করো" এ হাদীসটিকে তারা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করেছেন। এ হাদীসের মধ্যে তাওবা প্রস্তাব করার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু যারা তাওবার প্রস্তাব করাকে জরুরী বলেছেন, তারা একজন মুরতাদ মহিলার ঘটনা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। সেই মহিলাকে হত্যা করার আগে রসূলুল্লাহ স. তার কাছে তাওবা করার প্রস্তাব পেশ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, সে যদি তাওবা করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করবে। সেই মামলায় অভিযুক্ত

www.pathagar.com

মহিলাকে তাওবা করার সুযোগ দেয়ার পরই কেবল তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[১]

কোন মুরতাদ যদি তার ধর্মদ্রোহিতার উপর জোর দিতে থাকে তবে উপরে উল্লেখিত দলীলের ভিত্তিতে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।[২] অবশ্য এ ক্ষেত্রে মতভেদ আছে যে, তাকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করা হবে, না আরো অবকাশ দেয়া হবে? অনেকেই বলেন, মুরতাদ তাওবা করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে তখনি হত্যা করা উচিত। যাতে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে বিলম্ব না ঘটে। কেউ বলেন, এ ধরনের মুরতাদকে তিন দিনের অবকাশ দেয়া উচিত; এর মধ্যে যদি তার তাওবা করার সৌভাগ্য হয়। শেষোক্ত মতের পক্ষে একটি ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। যাতে বলা হয়, নবী কারীম স. মুসতাওরাদে আজালীকে তিন দিনের অবকাশ দিয়েছিলেন। এরপর তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।[৩]

আমার মনে হয়, মুরতাদদের তিন দিনের অবকাশ দেয়ার মধ্যে কল্যাণ আছে। এই তিন দিনের মধ্যে তারা চিন্তা-ভাবনা করে হয়তো দীনের পথে ফিরে আসতেও পারে। দীনের পথে ফিরে আসার সম্ভাবনার কারণে আমার কাছে তিন দিনের অবকাশ দেয়ার মতটি অধিক যৌক্তিক মনে হয়। কেননা অবকাশের সুযোগ দেয়ার পরও সে যদি তাওবা করে দীনের পথে ফিরে না আসে তাহলে শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোনো সুযোগই তার থাকে না। বস্তুত অবকাশ দেয়ার মধ্যে যেহেতু কল্যাণের সম্ভাবনা আছে ফলে ক্ষতির কোন আশংকা নেই।

কোন নারী যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা আছে। তাকেও কি পুরুষ মুরতাদের মতো মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে?

জমহুর (অধিকাংশ) ফকীহদের অভিমত হলো, ইরতিদাদের প্রশ্নে নারী পুরুষ সমান। হযরত আবু বকর রা. হযরত আলী, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, আবু লাইছ ও ইমাম আহমদ র. এ মত ব্যক্ত করেন। ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, নারী মুরতাদকে হত্যা করা যাবে না, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া

---

১ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৪; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-৫২; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-৫২।

২ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-৫২।

৩ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-৫২।

www.pathagar.com

যেতে পারে এবং শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে তাকে দীনের পথে ফিরে আসতে বাধ্য করতে হবে। শাস্তির প্রক্রিয়া হলো, প্রতিদিন জেলখানা থেকে বের করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে হবে। সে যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে পুনরায় বন্দি করতে হবে এভাবে তাকে দীনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ততোদিন চালাতে হবে যতোদিন এই নারী মুরতাদ দীনের পথে ফিরে না আসে।

ইমাম আবু হানিফা র. এ ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে একটি হাদীস পেশ করেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যুদ্ধাবস্থায় কোন নারীকে হত্যা করো না।" ইমাম আবু হানিফা র. মুসলিম মুরতাদ নারীকে এমন নারীর সাথে তুলনীয় বলেছেন যে শুরু থেকেই কাফের। পক্ষান্তরে জমহুরে ফুকাহার দলীল এমন একটি হাদীস যাতে বলা হয়েছে, "যে দীন ত্যাগ করলো তাকে হত্যা করো।" সেই সাথে তারা এ হাদীসকেও দলীল হিসেবে পেশ করেন, "তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়।" এক. বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারীনি, দুই. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারী, তিন. দীন ত্যাগকারী তথা ধর্মদ্রোহী। হাদীসে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলের যুগে এক মহিলা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ স. তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, "তার সামনে দীন পেশ করা হোক। সে যদি দীন গ্রহণ করে তাহলে তো খুব ভালো; নয়তো তাকে হত্যা করো।" বস্তুত নারীও পুরুষের মতোই শরীয়তের আওতাভুক্ত (Responsible person)। সে যদি সত্য ধর্মকে ত্যাগ করে বাতিলকে গ্রহণ করে তাহলে পুরুষকে হত্যা করার মতো তাকেও হত্যা করা ওয়াজিব।[১]

আমার দৃষ্টিতে ইরতিদাদের (ধর্মদ্রোহিতার) ব্যাপারে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে জমহুরের উপস্থাপিত দলীল প্রমাণ বেশি মজবুত। মুরতাদ নারীকে কাফের নারীর সাথে তুলনা করা সঠিক নয়।

বিদ্রোহ

ফকীহদের দৃষ্টিতে বিদ্রোহীদের সংগা হচ্ছে : এমনসব লোক যারা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, মুসলমানদের বিরোধিতা করে অথবা নিজেদের

---

১ মুঈনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা-১৮৬; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮৩, আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আলমাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-৫২, আল মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫।

www.pathagar.com

তৈরি কোন অনৈসলামিক মতাদর্শ গ্রহণ করে। তারা এসব করার পক্ষে দলীল প্রমাণও পেশ করে। সেই সাথে মুসলমান বা মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করার মতো শক্তি সামর্থও তারা অর্জন করে।[১] বিদ্রোহীদের সম্পর্কে যে সব প্রমাণ ও দলীল রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম এই আয়াত–

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

'দু'দল মুমিন ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন।[২] (সূরা আল-হুজরাত : ৯)

হযরত আনাস ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হবে, এমন কিছু লোক থাকবে

---

১ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-৩৮; আশ-শারহুল কবীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯; আত-তাশরীউল জিনাই আল ইসলামী মা কাদাত বিল কানুনিল ওয়াদঈ; আবদুল কাদের আওদা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০

২ সূরা হুজরাত আয়াত ৯। এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. এর সময় দু'দল মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাধে। বিবাদে পারস্পরিক সংঘর্ষ হলে একদল অপর দলের বিরুদ্ধে হাত পা ও জুতা পর্যন্ত ব্যবহার করে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, দুই সাহাবীর মধ্যে লেনদেনের বিষয় নিয়ে ঝগড়া হলে তাদের একজন বললো, আমি তোমাদের কাছ থেকে আমার পাওনা আদায় করবোই করবো, এই সাহাবীর খান্দান ছিল শক্তিশালী। অপরজন বললো, তোমার ও আমার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ আল্লাহর রসূল স. মীমাংসা করে দেবেন, চলো তাঁর কাছে যাই। কেউ কেউ বলেন, বিবদমান দু'দল আসলে ছিল আউস ও খাযরাজ। তাদের মধ্যে বিরোধে লাঠি পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল। আবুবকর আল-জাসসাস র. বলেন, এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থে বোঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে। ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক ঝগড়া বিবাদ ও লড়াইয়ের প্রশ্নেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য বলে মনে হতে পারে কিন্তু এ রকম মনে করা ভুল। আহকামুল কুরআন, জাসসাস, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩৭।

www.pathagar.com

যারা ভালো ভালো কথা বলবে কিন্তু তাদের কাজ কর্ম হবে মন্দ। তারা এভাবে দীন থেকে বেরিয়ে যাবে তীর যেমন শিকারের দেহভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করবে না; যতক্ষণ না তীর ধনুকে ফিরে আসে। এরা সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। সুসংবাদ তাদের জন্য যারা এদেরকে হত্যা করবে অথবা এদের হাতে নিহত হবে। এরা মানুষকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহবান করবে কিন্তু আল্লাহর কিতাবের সাথে এদের কোন সম্পর্কই থাকবে না। যে ব্যক্তি এদের হত্যা করবে সে এদের তুলনায় আল্লাহর বেশি নৈকট্য অর্জন করবে।

"হযরত আ'মাশ খাইছামা থেকে এবং খাইছামা সুয়াইদ ইবনে গাফালা থেকে হযরত আলী রা. সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন। সুয়াইদ বলেন, আমি হযরত আলী র. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "আমি যখন রসূলুল্লাহ স. সূত্রে কোন হাদীস লোকজনকে বলি সে ক্ষেত্রে তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আমি রসূলুল্লাহ স. এর নামে কোন গলদ কথার উদ্ধৃতি দেবো তার তুলনায় আমার পক্ষে এটা সহজ যে আমি আসমান থেকে পড়ে যাব। এবং পাখপাখালী আমার শরীরের গোশত টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে।

বস্তুত আমরা পরস্পর কথা বলেছিলাম যে, যুদ্ধ হলো এক ধরনের কূটকৌশল। আমি রসূলুল্লাহ স. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "শেষ যামানায় এমন এক জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হবে যারা স্বল্পায়ু ও স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন হবে। তারা এমন সব কথাবার্তা বলবে যা অন্যদের চেয়ে ভালো কিন্তু তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তোমরা যদি তাদের মুখোমুখি হও তাহলে তাদের হত্যা করে ফেলো। যে তাদের হত্যা করবে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবে।"

সাহাবায়ে কিরামের কেউ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেননি যখন যুদ্ধ ছাড়া তাদের সৎপথে ফিরিয়ে আনার কোন কার্যকর ব্যবস্থা না থাকে। যারা মুসলিম শাসক ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সকল সাহাবী একমত ছিলেন।[১]

---

[১] আহকামুল কুরআন, জাসসাস, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৪৯১।

www.pathagar.com

বিদ্রোহীদের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে

কোন বিদ্রোহী দল যদি ইসলামের মৌলিক আকীদা অক্ষুণ্ন রেখে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধাচরণ কল্পে সশস্ত্র যুদ্ধের সূচনা না করে অথবা বিদ্রোহীরা যদি নির্দিষ্ট কোন স্থানে জমায়েত না হয় বরং তারা এমন নাগরিকের মতোই বসবাস করে যেখানে শাসক ইচ্ছা করলেই তাদের কাছে পৌঁছুতে পারে, তাহলে তাদের সাথে সংঘর্ষ পরিহার করে তাদের অবস্থাতেই তাদেরকে থাকতে দিতে হবে এবং অধিকার ও শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারাও শিষ্ট নাগরিকদের মতোই সুবিধা ভোগ করবে।[১]

তারা যদি শিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে বসবাস করে মুসলিম সমাজে তাদের বিভ্রান্তিকর আকীদা বিশ্বাস প্রকাশ্যে প্রচার করতে থাকে তাহলে শাসকের কর্তব্য হলো সর্বাগ্রে তাদের আকীদাগত বিভ্রান্তি দূর করা; যাতে তারা সত্যকে মেনে নিতে এবং সর্বসম্মত পথে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু এরপরও যদি তারা বিভ্রান্তিকর আকীদা পরিহার না করে তবে শাসকের জন্য বৈধ হবে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের যে কোন দণ্ডে দণ্ডিত করা।[২]

কিন্তু বিদ্রোহী দল যদি শিষ্ট ও সুশীল সমাজ ছেড়ে স্বতন্ত্র কোন জায়গা বা এলাকাতে জমায়েত হয়, তবুও ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শাসকের অধিকার ও প্রাপ্য দিতে অস্বীকার না করবে এবং শাসকের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি না জানাবে।

---

১ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-৫৬; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-৩৮, আবু য়ালা লিখেছেন, একবার খারেজীদের একটি দল হযরত আলী রা. এর বিরোধিতা করল। একদিন হযরত আলী রা. যখন খুতবা দিচ্ছিলেন তখন এদের একজন স্লোগান দিল, 'লা হুকমু ইল্লা লিল্লাহ' আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম চলবে না। এতে আলী রা. বললেন– তোমার কথা যথার্থ কিন্তু তুমি এর ভুল অর্থ গ্রহণ করছো। তোমাদের ব্যাপারে আমরা তিনটি বিষয় মেনে চলবো।
এক. মসজিদে এসে আল্লাহর ইবাদত করার পথে আমরা তোমাদের বাধা দেবো না। দুই. আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করবো না। তিন. যত দিন তোমরা আমাদের প্রশাসনিক আইন মেনে চলবে ততদিন যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তোমাদের অংশ দিতে অস্বীকৃতি জানাবো না।

২ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-৫৬; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-৩৮-৩৯।

www.pathagar.com

হযরত আলী রা. এর আমলে খারেজীদের একটি উপদল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাহরাওয়ান এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। এমতাবস্থায় হযরত আলী রা. তাদের উপর একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তারা হযরত আলী রা. এর নিযুক্ত কর্মকর্তার শাসনাধীনেই ছিল। হযরত আলী রা. তাদের বিরুদ্ধে কোন সংঘর্ষে যাননি। এ থেকে বোঝা যায়, বিদ্রোহীরা যতক্ষণ শাসকের আনুগত্য করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না, যদিও তারা স্বতন্ত্র কোন এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে।[১]

কিন্তু যদি এই বিদ্রোহীরা শাসকের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং রাষ্ট্রের অধিকার আদায় না করে যা তাদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রকে দেয়া আবশ্যক, পক্ষান্তরে নিজেরা ভিন্ন শাসন প্রক্রিয়া চালাতে চেষ্টা করে, কর ইত্যাদি উসূল করতে শুরু করে, তাহলে তাদের অবস্থা দু'ধরনের হতে পারে :

(এক) হয়তো তারা নিজেদের কোন ইমাম বা শাসক মনোনীত না করেই এ কাজ করতে শুরু করেছে।

(দুই) নয়তো তাদের মধ্যে কাউকে ইমাম বা শাসক নিযুক্ত করে নিয়েছে।

কোন ইমাম বা শাসক নিযুক্ত করা ছাড়াই যদি তারা ট্যাক্স, কর ইত্যাদি আদায় করে থাকে তাহলে তারা যে সম্পদ ট্যাক্স-কর ইত্যাদির নামে আদায় করেছিল তা লুণ্ঠিত সম্পদের পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে। যাদের কাছ থেকে তারা এসব সম্পদ আদায় করেছে সরকারি কোষাগারে তাদের দেয় পাওনা অপরিশোধিত বলেই গণ্য হবে। সেই সাথে বিদ্রোহীদের প্রতিষ্ঠিত সকল বিচারালয় ও বিচার ব্যবস্থা অস্তিত্বহীন অবৈধ বলে গণ্য হবে। তাদের এসব প্রশাসনিক তৎপরতার কিছুই সরকারের কাছে গৃহীত হবে না। কিন্তু বিদ্রোহীরা যদি কোন ইমাম বা শাসক নিযুক্ত করে তার নির্দেশে ট্যাক্স, খাজনা ইত্যাদি আদায় করে, তার অনুমোদন সাপেক্ষে আদালত কায়েম করে বিচার কার্য শুরু করে তাহলে সাধারণ নাগরিকরা তাদের যে ট্যাক্স, খাজনা দিয়েছে তা পুনর্বার আর সরকারী কোষাগারে দিতে হবে না, সরকার তাদের কাছে পুনর্বার এসব ট্যাক্স দাবী করতে পারবে না। এবং তাদের বিচার বিভাগ যে সব ফয়সালা দিয়েছে সেগুলো অস্তিত্বহীন বিবেচিত হবে না। এতো গেলো প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপার কিন্তু বিদ্রোহীরা ইমাম মনোনীত করুক বা না

---

১ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-৩৯।

www.pathagar.com

করুক উভয় অবস্থাতেই এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যতোদিন না ওরা প্রকৃত সত্য পথে ফিরে আসে।[১]

'মুঈনুল হুক্কাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে, শাসকের কাছে যখন বিদ্রোহীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ পৌঁছে তখনই তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। তাদের পাকড়াও করে বন্দি করতে হবে যাতে তারা তাদের তৎপরতা বাস্তবায়িত করতে না পারে। কেননা যে কোন মন্দ বিকশিত হওয়ার আগেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া সহজ। কিন্তু শাসকবর্গ যদি যথাসময়ে খবর না পান আর বিদ্রোহীরা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে নেয়, তাহলে শাসকের উচিত তাদেরকে হকের দিকে প্রত্যাবর্তন করার আহবান জানানো। তারা যদি ইমাম বা শাসকের প্রস্তাব মেনে নেয় ভালো নয়তো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের পরাজিত করে বিভ্রান্তি নির্মূল করা শাসকের উপর ওয়াজিব।

বিদ্রোহ দমনে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে তাৎপর্যগত পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো–

(১) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান পরিচালনার আগে তাদেরকে সতর্ক করতে হবে এবং সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য অবকাশ দিতে হবে। সংশোধনের সুযোগ না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আকস্মিক দমনাভিযান চালানো বৈধ হবে না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নির্মূল করা নয় বরং তাদের সংশোধন করা যাতে বিদ্রোহীরা সঠিক পথে ফিরে আসে। কিন্তু মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বেলায় এ ধরনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

(২) বিদ্রোহীরা যতক্ষণ মোকাবেলায় থাকে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে কিন্তু যদি যুদ্ধ ছেড়ে তারা পালিয়ে যায় তাহলে পিছু ধাওয়া করা কিংবা পলায়নরতদের হত্যা করা বৈধ নয়।

(৩) আহত বিদ্রোহীদের আঘাত করা যাবে না কিন্তু যুদ্ধাবস্থায় মুশরিক ও মুরতাদ বিদ্রোহী আহত হলে তাদের উপর আঘাত করা যাবে। জঙ্গে জামাল এর দিন হযরত আলী রা. তার ঘোষককে একথা ঘোষণা করার

---

[১] আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-৫৬; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-৩৯, মুঈনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা-৮৫।

www.pathagar.com

নির্দেশ দেন "পলায়নপর কোন বিদ্রোহীর পিছু ধাওয়া করা যাবে না এবং কোন আহত বিদ্রোহীর উপর হামলা করা যাবে না।"

(৪) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে যদি কোন বিদ্রোহী গ্রেফতার হয় তাকে হত্যা করা যাবে না। পক্ষান্তরে মুশরিক ও মুরতাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে কোন মুশরিক বা মুরতাদ গ্রেফতার হলে তাকে হত্যা করা যাবে। যে বিদ্রোহীকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে, তার ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সে দ্বিতীয় বার আর বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুক্ত হবে না তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া যাবে। কিন্তু যদি কয়েদ খানায় বন্দি বিদ্রোহীর অবস্থা নেতিবাচক হয় তাহলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি দেয়া যাবে না। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বিদ্রোহী ব্যক্তিদের মুক্ত করে দিতে হবে, তখন আর তাদের কয়েদ করে রাখা বৈধ হবে না।[১]

পলায়নরত বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়া না করা, আহত বিদ্রোহীর উপর আক্রমণ না করা এবং বিদ্রোহী বন্দিদের হত্যা না করার পক্ষে ইমাম শাফেয়ী র. ও আহমদ র. সহ অধিকাংশ ফকীহ মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা র. এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যদি এমন কোন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব না থাকে, যাদের সাথে পলায়নরত বিদ্রোহীরা পালিয়ে গিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে তাহলে পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করাই যথেষ্ট কিন্তু যদি অন্য জায়গায় অনুরূপ কোন বিদ্রোহী গোষ্ঠী থাকে তবে তাদের পিছু ধাওয়া করে পাকড়াও করা এবং আহতদের উপর আক্রমণ চালানো এবং বন্দিদের হত্যা করা জায়েয। কারণ এমতাবস্থায় তাদের পালাতে দিলে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে গিয়ে জোট বাধবে এবং শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধ বাধাবে।

ইমাম আবু হানিফা র. আরো বলেন, কোথাও যদি অবশিষ্ট কোন বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী না থাকে তাহলে ওদের পাকড়াও করে খুব পিটিয়ে বিদ্রোহ করা থেকে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দি করে রাখতে হবে। প্রথম পক্ষের দলিল হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত জঙ্গে জামাল এ দেয়া নির্দেশ; যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতও

---

[১] আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-৫৬ এবং আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়া'লা, পৃষ্ঠা-৩৯।

www.pathagar.com

প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। রসূলুল্লাহ স. তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে উম্মে আবদ এর ছেলে, আমার উম্মতের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করবে তার ব্যাপারে ফয়সালা কি? হযরত আবদুল্লাহ আরয করলেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল এ ব্যাপারে ভালো জানেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. বলেন, পলায়নরত বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়া করা যাবে না। আহত বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করা যাবে না, বিদ্রোহী বন্দিদের হত্যা করা যাবে না এবং বিদ্রোহীদের সহায় সম্পদ গণীমতের সম্পদের মতো মুসলমান যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে না। এছাড়াও তাদের দলীল হলো– বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে তাদের বিরত করা, তাদের তাড়া করার মধ্যেই এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়, তাই তাদের হত্যা করা জায়েয হবে না। যেমন কোন আক্রমণকারীকে পাকড়াও করার পর হত্যা করা জায়েয নয়।[১]

গ্রন্থকার বলেন, আমার দৃষ্টিতে যে সব ফকীহ পলায়নকারী বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়া না করা এবং আহত বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ না করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন, তাদের অভিমত বেশি যৌক্তিক। প্রথমত তারা তাদের মতের পক্ষে দলীল উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয়ত বিদ্রোহীদের পরাস্ত করার পর পলায়ণরতদের পিছু ধাওয়া করা জরুরী নয় বরং বাড়াবাড়ি। ইসলামী শরীয়তের চেতনা এ কাজের পরিপন্থী। অবশ্য যদি পরাজিত বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আরো সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে হত্যা করা ছাড়াও শাস্তিমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের পথও খোলা আছে। এক্ষেত্রে মূল বিষয় হচ্ছে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা। যদি আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহলে তাদের শাস্তি দেয়া জায়েয।

(৫) বিদ্রোহী মুরতাদ ও মুশরিকদের তৎপরতা দমন আইনের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য পার্থক্যের মধ্যে এটিও একটি যে, বিদ্রোহীদের সহায় সম্পদ গণীমতের সম্পদ বিবেচিত হবে না এবং তাদের সন্তান-সন্ততি গোলাম বাদী বিবেচিত হবে না। কেননা এ ব্যাপারে হাদীস রয়েছে 'দারুল ইসলাম' তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তার নিয়ন্ত্রণাধীন সব কিছুকেই সংরক্ষণ করে এবং

---

[১] মুঈনুল হুককাম, পৃষ্ঠা- ২৮৫, এবং আশ-শারহুল কবীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৮।

www.pathagar.com

মুশরিকদের শাসন ব্যবস্থা তাদের অধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ডের সবকিছুকেই ভোগ্য বস্তু মনে করে।'[১]

এর মধ্যে আরো একটি পার্থক্য হলো, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তাদের উপর গোলা বারুদ নিক্ষেপ করা যাবে না, তাদের বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ করা যাবে না, তাদের শষ্যক্ষেত বৃক্ষরাজি পুড়িয়ে দেয়া যাবে না। কেননা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা তো দারুল ইসলামের সীমানার মধ্যেই সংঘটিত হচ্ছে। বস্তুত দারুল ইসলাম তার ভূখণ্ডের সমুদয় সৃষ্টিসহ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রাপ্ত।

অবশ্য বিদ্রোহীরা যদি শান্তিকামী জনগণকে ঘেরাও করে ফেলে তাহলে শান্তিকামী লোকজন বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করতে সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারবে। এমতাবস্থায় অবরুদ্ধদের অন্য বিদ্রোহীদের উপর গোলাবারুদ নিক্ষেপ এবং তাদের পাকড়াও করে হত্যা করা জায়েয। হত্যা করা ছাড়া যখন মুসলমানদের পক্ষে তাদের জীবন সম্পদ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন আগ্রাসীকে হত্যা করা জায়েয।[২]

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায়, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে পরিস্থিতির রকমফেরে শাস্তি নির্ধারণে ভিন্নতা ঘটে। অবস্থাভেদে শাসকগণ তাদের মৃত্যুদণ্ড ছাড়া যে কোন শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন। যেমন বিদ্রোহীদের গ্রেফতার করে তাদেরকে তাওবা না করা পর্যন্ত বন্দি করে রাখা। পরিস্থিতির জটিলতায় বিদ্রোহীদের হত্যা করাও জায়েয হয়ে যায়। বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে যদি পুনরায় যুদ্ধের আশংকা হয় তবে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করাও বৈধতা পায়। পরিস্থিতি যদি এমনই জটিল হয়ে পড়ে যে, মানুষজনের জীবনের নিরাপত্তা বিদ্রোহীদের কারণে ঝুকিপূর্ণ হয়ে ওঠে আর বিদ্রোহীদের দমনে ভিন্ন কোন পথ না থাকে তাহলে তাদের হত্যা করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

বিদ্রোহ সম্পর্কিত আইনের সকল শাখা প্রশাখার নানা দিক গভীর চিন্তা ভাবনা করার পর আমি (লেখক) যা বুঝেছি, তা হলো– যেসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের হত্যার অনুমতি দেয়া হয়েছে যুদ্ধাবস্থায় সেই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে।

---

১ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-৫৭ এবং আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়া'লা, পৃষ্ঠা-৩৯।

২ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়া'লা, পৃষ্ঠা-৪০।

www.pathagar.com

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যখন যুদ্ধ চলে তখন হত্যার জন্য পৃথক কোন প্রজ্ঞাপন জারির প্রয়োজন থাকে না। বিদ্রোহীদের দমনে হত্যা ছাড়া যখন আর কোন পথ না থাকে তখন এটিও একই পর্যায়ভুক্ত। এক্ষেত্রেও হত্যার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা, এই হত্যার অনুমতি প্রদান বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ডেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এর দ্বারা এই উপসংহারে উপনীত হওয়া যাবে না যে, বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে একটাই শাস্তির বিধান আর তা হলো মৃত্যুদণ্ড। বস্তুত শরীয়ত তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে চায় না, যেমনটি উপরে আলোচিত হয়েছে। তবুও বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির কারণে মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োগ হয়ে থাকে। বস্তুত উপরের আলোচনার পর একথা বলাই বেশী সঠিক হবে বলে মনে করি যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিদ্রোহীদের দমনে যে শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে এসবই তাযির পর্যায়ভুক্ত যা কখনো মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি মনে করি, বিদ্রোহ এমন অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না যেসব অপরাধের শাস্তি হিসেবে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট হদ্দ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বিদ্রোহজনিত অপরাধ একটা বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যদ্দরুন তাতে মুশরিক ও মুরতাদদের অপরাধের চেয়ে ভিন্ন ধরনের দণ্ডাদেশ প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্চনীয়। বিদ্রোহের শাস্তি এক দিকে যেমন মুশরিক ও মুরতাদদের দণ্ডাদেশ থেকে ভিন্ন অনুরূপ ডাকাত ও পথ দস্যুদের দণ্ডাদেশ থেকেও ভিন্ন। কারণ মানুষের ধন সম্পদ লুটতরাজ করা এবং নিরপরাধ মানুষকে হত্যার কোন ইচ্ছা বিদ্রোহীদের থাকে না। তাদের তৎপরতাকে ইসলাম বিরোধী বলেও অভিহিত করা যায় না। কারণ বিদ্রোহীরাও মুসলমান এবং তাদের মুসলমানিত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় সৃষ্টি হয় না। প্রকৃত পক্ষে বিদ্রোহীরা সমকালীন শাসক বা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের শাসন প্রক্রিয়া ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এবং বল প্রয়োগ করে ক্ষমতার পরিবর্তন করতে চায়। দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্যই শুধু বিদ্রোহ হয় না, অনেক সময় বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ করারও যুক্তি থাকে, থাকে তাদের দৃষ্টিতে কিছু নীতি আদর্শ। যে নীতি আদর্শের ভিত্তিতে তারা সমকালীন শাসক বা শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক তৎপরতা শুরু করে। বিদ্রোহীরা নিজেদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে কল্যাণকর কাজ বলে মনে করে, মহৎ উদ্দেশ্যে তারাও ইসলামের কল্যাণকামিতার দাবী করে। এজন্য তাদের উদ্দেশ্য অন্যান্য অপরাধের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিদ্রোহীরা অনেক ক্ষেত্রে পেশাদার অপরাধী হয় না। যদিও ইসলামী শরীয়ত শাসককে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছে এবং শাসকদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করতে গিয়ে

www.pathagar.com

বিদ্রোহীদের মৃত্যুও হতে পারে তবুও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাসকদের দমনাভিযানের অনুমোদন শরীয়ত এ জন্য দিয়েছে যাতে বিদ্রোহীদের কারণে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা ও হাঙ্গামার অবসান হয় এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলরা স্থিতিশীল হয় এবং তাদের শক্তি সামর্থ অক্ষুন্ন রাখতে পারে। এতটুকু শক্তি যে কোন শাসকের থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে শাসকরূপে তাদের শাসন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ করতে পারে। পক্ষান্তরে শরীয়ত বিদ্রোহীদের দিকটাও এড়িয়ে যায়নি, শরীয়ত বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যকেও বিবেচনায় রেখেছে, যে উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ করতে উদ্যোগী হয়।

সাধারণত বিদ্রোহীরা সমকালীন শাসকগোষ্ঠী বা শাসককে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে চায়, অথবা শাসন প্রক্রিয়ায় জড়িতদের উৎখাত করতে চায়, অথবা শাসকের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। এসব তৎপরতা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড, দেশীয় রাজনীতি ও শাসন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। বিদ্রোহের পক্ষে বিদ্রোহীদের যুক্তি থাকে, দলীল প্রমাণ থাকে সেসব দলীল প্রমাণ ও যুক্তি তারা জনসাধারণের কাছে প্রচার করে। যদিও তাদের যুক্তি ও দলীল প্রমাণ শক্তিশালী নয়, দুর্বল ও অপর্যাপ্ত তবুও শরীয়ত তাদের বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার যৌক্তিকতাকে বিবেচনা করে অন্যান্য অপরাধের তুলনায় এই অপরাধকে ভিন্ন ভাবে বিবেচনা করেছে।

উপরে আমরা একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছি, বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ড অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বস্তুত অন্যান্য অপরাধের চেয়ে বিদ্রোহজনিত অপরাধের মূল পার্থক্য বুঝতে হবে। বিদ্রোহীরা রাজনৈতিক অপরাধী, চারিত্রিক নৈতিক অপরাধে অপরাধী নয়। কাজেই তাদের শাস্তির ক্ষেত্রে এ দিকটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে যাতে তারা শাসকের আনুগত্য করে। শাসক ও শাসন প্রক্রিয়ার প্রতি যদি তারা আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে আর তাদের ক্ষেত্রে কোন শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তদ্রূপ যুদ্ধাবস্থায়ও বিদ্রোহীরা যে অপরাধ করে তাও অন্যান্য অপরাধের সাথে তুলনীয় হবে না। যেহেতু তাদের যুদ্ধটাও কোন না কোন শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেই সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই তাদের অপরাধ যুদ্ধমান মুরতাদ ও মুশরিকদের থেকে ভিন্ন। কারণ আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করা ও দীনের হেফাযতের জন্য মুরতাদ ও মুশরিকদের হত্যা করা হয়।

ডাকাত ও পথ দস্যুদের অপরাধ থেকে বিদ্রোহীদের অপরাধ এজন্যও ভিন্নতা রাখে যে, ডাকাত ও পথ দস্যুদের লক্ষ্য থাকে গণমানুষের ধন সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য মানুষের মধ্যে বিশৃংখলা ও ভীতি সৃষ্টি করা। এ ধরনের কর্মকাণ্ড খুবই জঘন্য। শুধু কোন অপরাধপ্রবণ লোকের দ্বারাই এসব সংঘটিত

www.pathagar.com

হয়ে থাকে। ফলে এ ধরনের অপরাধীদের কঠিন শাস্তি দেয়া হয় যাতে মানুষের মধ্যে স্বস্তি বিরাজ করে এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা যায়। যদ্দরুন ডাকাত ও পথদস্যুদের শাস্তির বিধান করা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড, শূলদণ্ড, হাত পা বিপরীত দিকে কেটে ফেলা অথবা দেশান্তর কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এ ধরনের জঘন্য অপরাধের জন্য গুরুদণ্ড হওয়াটাই সমাধান, যাতে করে মানুষের মধ্যে স্বস্তি বিরাজ করে আর লোকজন এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ডাকাত কিংবা পথদস্যুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিদ্রোহীদের তৎপরতা সম্পূর্ণই রাজনৈতিক। বিদ্রোহীরা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে শাসন প্রক্রিয়া ও সমাজকে গঠন করতে চায়। এর দ্বারা তারা দীন ও শাসন প্রক্রিয়ায় উন্নতি ঘটাতে চায়। বস্তুত অপরাধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ার কারণে শাস্তিও ভিন্নরকম হতে বাধ্য।

কিসাসযোগ্য অপরাধ

'কাসসা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'কর্তন করা'। এই শব্দ থেকেই কিসাস শব্দের উৎপত্তি। ইসলামী আইনে এর অর্থ কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষত, অঙ্গহানি কিংবা মৃত্যুর কারণে অপরাধীকেও শাস্তি স্বরূপ ক্ষত সৃষ্টি করা, অঙ্গহানি কিংবা হত্যা করা।[১]

ফকীহগণ কাসাসের সংগায় বলেছেন, কিসাস হলো কোন ব্যক্তির হক বিনষ্টের পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান যা ওয়াজিব। কিসাস 'হদ্দ' এর সাথে সামঞ্জস্য রাখার ক্ষেত্রে হদ্দ এর মতো। যেহেতু হদ্দ এর মতো কাসাসেও শাস্তির পরিমাণ নির্ধারিত। কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিতে হদ্দ ও কাসাসের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। কারণ, কিসাস বান্দার হক বিনষ্টের কারণে ওয়াজিব হয় আর হদ্দ আল্লাহর হক বিনষ্টের কারণে ওয়াজিব হয়। শাস্তি সুনির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে হদ্দ ও কাসাসের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য হলো, 'হদ্দ' এর কোন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায় নেই, যে উভয়ের মধ্যবর্তী আরো বিভিন্ন পর্যায় থাকবে। কিন্তু কোন মানুষের হক বিনষ্টের কারণে যে কিসাস ওয়াজিব হয় এর মধ্যে এই অবকাশ আছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত বা মৃত ব্যক্তির

---

১ লিসানুল আরব, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৪১, প্রথম সংস্করণ, মাতবায়ে আমিরিয়া, রিসালা আল কিসাস ফিশ শারীয়্যাতিল ইসলামিয়া, ডক্টর আহমদ মুহাম্মদ ইবরাহীম, প্রকাশকাল : ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ, মিসর, পৃষ্ঠা-৩৬।

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে খুনের ভর্তুকি না চেয়ে ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিও অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারে। এমতাবস্থায় শাস্তি রহিত হয়ে যাবে কিন্তু হদ্দ কারো পক্ষে রহিত করা সম্ভব নয়।[১]

যেসব অপরাধে আল্লাহ তাআলা কিসাস আবশ্যক করেছেন তার মধ্যে ইচ্ছাকৃত নরহত্যা ও কোন মানুষের দৈহিক ক্ষতিসাধন অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো।

স্বেচ্ছায় নরহত্যা

হত্যাকাণ্ডের শাস্তি সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর বহু নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

"মুমিনগণ! নিহতের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কাসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধি অনুসরণ করা এবং সততার সাথে তার দেয় আদায় করা বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ্য থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি"।[২]

–(সূরা আল-বাকারা : ১৭৮)

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ○

"কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি এর প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই"।[৩] –(সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৩)

---

১ তাবঈনুল হাকায়েক-শরহে কানযুদ দাকায়েক, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৭, প্রথম সংস্করণ : মাতবায়ে আমিরিয়া, বোলাক, মিসর ১৩১৫ হিজরী। বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০।

২ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল- মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-২১৯, আত-তাশরীউল জিনায়ীল ইসলামী, আবদুল কাদের আওদা, পৃষ্ঠা-৭৮, এর পর পৃষ্ঠা-৬৬৩।

৩ আহকামুল কুরআন, আল-জাসসাস, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৪-১৩৫।

www.pathagar.com

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

"আমি তাদের জন্য সেখানে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই গোনাহ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই জালিম"।[১] -(সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৫)

শেষ আয়াতে বনী ইসরাঈলের অপরাধের কথা বিবৃত হলেও যেহেতু এই আয়াতটি মনসূখ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণিত কোন দলীল নেই; সেহেতু এই আয়াতের বিধান মুসলমানদের ক্ষেত্রেও সমভাবে কার্যকর।[২]

হাদীস শরীফেও এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে "স্বেচ্ছায় নরহত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড"।[৩]

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিন কারণে কাউকে হত্যা করা বৈধ। তন্মধ্যে একটি হলো, হত্যার বদলে হত্যা।[৪]

ইমাম আবু হানিফা র.-এর দৃষ্টিতে সেটিকে হত্যাকাণ্ড বলা যাবে, যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কাউকে হত্যা করার জন্য এমন কোন অস্ত্র বা হাতিয়ার দিয়ে আঘাত করে যা দ্বারা কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। যেমন ধারালো কোন পাথর, কোন ধাতব অস্ত্র বা এমন ধরনের বস্তু। এ ধরনের জিনিসের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, এসব জিনিস হাতে নেয়াটাই প্রমাণ করে হত্যাকারী হত্যা করার ইচ্ছায়ই এসব হাতিয়ার হাতে নিয়েছে।[৫]

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. ইমাম আবু হানিফা র. এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, স্বেচ্ছায় হত্যাকাণ্ড কোন অস্ত্র দিয়েও হতে পারে ভিন্ন প্রক্রিয়ায়ও মানুষের মৃত্যু অনিবার্য হতে পারে। তাঁরা কাউকে পানিতে ডুবিয়ে রাখা, গলা টিপে ধরা, কোন উঁচু জায়গা কিংবা ঘরের ছাদের উপর

---

১ আহকামুল কুরআন, আল-জাসসাস, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৬।

২ প্রাগুক্ত।

৩ আদাঈয়ুস্-সানায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৩; শরহে আয যাইলাঈ আলা মাতানিল কানয, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৭ এবং তৎপরবর্তী।

৪ আল-কাসানী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫২ এবং তৎপরবর্তী।

৫ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫২-১৫৩।

www.pathagar.com

থেকে ফেলে দেয়া অথবা বিষ খাওয়ানোকেও স্বেচ্ছায় হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ এসব উদ্যোগ তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটায় এবং হত্যাকারী জানে এ কাজ জীবন সংহারী।[১]

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, হত্যাকারী যদি কোন ধারালো বস্তু দিয়ে হত্যা করে, যেমন লোহা বা এ জাতীয় পদার্থের তৈরী কোন জিনিস যা মানুষের দেহে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে অথবা এমন কোন জিনিস যার ভারে মানুষের মৃত্যু ঘটে যেমন পাথর, কোন ভারী কাঠ কিংবা লোহা বা ইস্পাতের ভারী জিনিস অথবা এমন কোন বস্তু যা দিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটানো সম্ভব বলে সবাই মনে করে এবং হত্যাকারী মনে করে এর দ্বারা মৃত্যু ঘটবে তবে এসবই স্বেচ্ছায় হত্যার পর্যায়ে পড়বে এবং হত্যাকারীর উপর কাসাসের দণ্ড অপরিহার্য সাব্যস্ত হবে।[২]

উপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়া সমূহের কোন একটিতে যদি স্বেচ্ছায় হত্যাকাণ্ডের শর্তসমূহ সাব্যস্ত হয়ে যায় তবে অপরাধীর উপর কাসাসের দণ্ড ওয়াজিব হয়ে যাবে। অবশ্য নিহতের ওয়ারিসগণ যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আর দণ্ড কার্যকর হবে না।[৩]

কিসাস থেকে দিয়াতের হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফকীহগণের মধ্যে কিছুটা মতভিন্নতা রয়েছে। মতভিন্নতার মূল বিষয় হলো, দিয়াত কি নিহতের উত্তরসূরীদের অধিকার (হক)? এ ব্যাপারে হত্যাকারী যদি দিয়াত দিতে সম্মত না হয় তাহলে নিহতের উত্তরসূরীরা কিসাস নিয়ে অথবা দিয়াত ছাড়াই কি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিবে? ইমাম মালিক র. বলেন, নিহতের উত্তরসূরীদের এই অধিকার আছে যে, তারা ইচ্ছা করলে কিসাস নিতে পারে অথবা দিয়াত ছাড়াও হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারে। অবশ্য হত্যাকারী যদি দিয়াত দিতে সম্মত হয় তাহলে দিয়াত নিবে। ইবনে কাসিম ইমাম মালিক র. থেকে একথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা র. ও অন্যান্য ফকীহদেরও একই অভিমত। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, দাউদ জাহেরী, ও আরো কিছু সংখ্যক ফকীহ বলেন, নিহতের উত্তরসূরীদের এই অধিকার আছে,

---

১ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল- মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-২১৯; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩২১।

২ শারায়েতে কিসাস, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৪ এবং তৎপরবর্তী।

৩ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৬; আল-মুগনী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৩৩।

www.pathagar.com

তারা দিয়াত ছাড়াই ক্ষমা করে দিতে পারে কিংবা কিসাস নিতে পারে। অথবা দিয়াত নিয়ে কিসাস ক্ষমা করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে হত্যাকারীর সম্মতির কোন প্রয়োজন নেই। ইবনে আশহাব র. ইমাম মালিক র. থেকে এমন একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইমাম মালিক র. এর প্রথমোক্ত মতই বেশি খ্যাত।[১]

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিসাস

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ–

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ○

"চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলেও কিসাস ওয়াজিব।" (সূরা আল-মায়িদা : ৪৫)

'হযরত আনাস বিন মালিক রা. এর বর্ণনা। রবীআ বিনতে নযর বিন আনাস এক দাসীর দাঁত ভেঙে দিলে তিনি দাঁত ভাঙার অপরাধের জন্য দিয়াত দেয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু দাসীর মালিক পক্ষ দিয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো এবং কিসাস প্রয়োগের দাবী করলো। এমতাবস্থায় বিবাদীর ভাই আনাস বিন নযর রসূলুল্লাহ স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাঁত ভাঙার অপরাধে কি রবীআ'রও দাঁত ভাঙা হবে? আনাস বললেন, আপনাকে যে প্রভু সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন সেই প্রভুর কসম করে বলছি, তার দাঁত ভাঙবেন না। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আনাস! আল্লাহ তাআলাই কাসাসের নির্দেশ দিয়েছেন।'

ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে দৈহিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিচারের বেলায় যতটুকু সম্ভব কিসাস বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। নরহত্যার কাসাসের ক্ষেত্রে যে দলীল ও শরয়ী বিধান কার্যকর হত্যাকাণ্ডের চেয়ে নিম্নের অপরাধের ক্ষেত্রেও একই বিধান ক্রিয়াশীল। কেননা শরীয়ত মানুষের জীবন রক্ষার জন্য কাসাসের বিধান দিয়েছে, জীবনের মতো মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তা বিধানও গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত নরহত্যার মতোই অঙ্গহানির ক্ষেত্রেও সমভাবে কিসাস প্রয়োগ যোগ্য হবে।[২]

---

১ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৬, আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৫৬।

২ আল-মুগনী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪০৯ এবং এরপর পৃষ্ঠা-৪১৬ ও তারপর।

www.pathagar.com

কোন অঙ্গ গোড়া থেকে কেটে ফেলার অপরাধে কাসাসের দণ্ডযুক্ত হবে।[১] অনুরূপ কোন অঙ্গের যদি এতটুকু ক্ষতি হয়ে যায় যে, অঙ্গটি বহাল থাকলেও তার কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলেও কিসাস প্রযোজ্য হবে।[২] যে আঘাতে হাড় দেখা যায় তাতেও কিসাস প্রযোজ্য হবে।[৩]

এসব পরিস্থিতিতে কিসাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ক্ষতি সাধনের কারণ ছাড়াও আরো কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলোর অন্যতম হলো, যে অঙ্গের কিসাস নেয়া হবে সেই অঙ্গটি অপরাধীর অঙ্গের সদৃশ হতে হবে। কারণ অনুরূপ অঙ্গ যাতে শাস্তি হিসেবে কাটা যায়। যাতে কিসাস নিতে গিয়ে অপরাধীর প্রতি জুলুম করা না হয়।[৪]

কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অঙ্গহানির বদলে দিয়াত গ্রহণে সম্মত হয় তাহলে তাকে পুরোপুরি দিয়াত দিতে হবে। যদি ক্ষতি নির্দিষ্ট একটি অঙ্গে হয়। হ্যাঁ, যে সব অঙ্গ শরীরে অন্তত দুটি রয়েছে তন্মধ্যে একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর যে অঙ্গ শরীরে চারটি রয়েছে তন্মধ্যে একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এক চতুর্থাংশ দিয়াত দিতে হবে।[৫] অনুরূপভাবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোন কিসাস নির্ধারিত নেই সে সব ক্ষেত্রে জরিমানা ওয়াজিব হবে।[৬]

---

১ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৬০।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৬৯।

৩ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০৯ এবং আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৬২।

৪ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯৭।

৫ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১১, আল-মুগনী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৮০।

৬ দিয়াতের মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে। দিয়াতকে কোন সময় শাস্তি (Punishment) বলা হয়। দিয়াতে বাদীর দাবীর প্রেক্ষিতে বিচারক নির্বিঘ্নে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে দিয়াতের পরিমাণের ব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে অপরাধীকে আর্থিক শাস্তি দেয়ার পথ উন্মুক্ত হয়।

দিয়াতকে জরিমানাও বলা হয়। কারণ অপরাধী এই টাকা মৃতের ওয়ারিসদের দিয়ে থাকে। দিয়াতের কোন অংশ সরকারি কোষাগারে যায় না। এজন্যও দিয়াতকে জরিমানা বলা হয়। এর দ্বারা মৃতের ওয়ারিসদের ক্ষয় ক্ষতি কিছুটা লাঘব হয়। এই দৃষ্টিতে অনেকেই দিয়াতকে শাস্তি ও জরিমানা উভয় নামেই অভিহিত করেন। এজন্যে দেখুন আত-তাশরীউল জিনাঈল ইসলামী, আবদুল কাদের আউদা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৬৮, অথবা রিসালা আদ-দিয়াত ফিশ শারীয়্যাতিল ইসলামিয়া, ডক্টর সাদেক আবু যায়েদ,

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়তে সুনির্দিষ্ট আইনের কিছু দায় ও বৈশিষ্ট্য

এর আগের আলোচনায় আমরা এ বিষয়টি পরিষ্কার করেছি যে, ইসলামী শরীয়াহ মাত্র কয়েকটি অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেসব অপরাধের শাস্তি সুনির্ধারিত এগুলোকে শরীয়তের পরিভাষায় হুদুদ ও কিসাস বলে অভিহিত করা হয়। এই দণ্ডগুলোর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। উল্লেখিত অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে শাস্তি বা দণ্ডাদেশ এক ও অভিন্ন। কোন অপরাধে দু'ধরনের শাস্তি নেই। আসল কথা হলো, বিচারকের কাছে যদি এসব অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে সেই অপরাধের জন্যে অপরাধীকে নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত করা বিচারকের জন্যে অপরিহার্য। বিচারক এসব অপরাধের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে লঘু গুরু করতে পারবেন না। অপরাধের ধরন কিংবা অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করেও বিচারক শাস্তির ক্ষেত্রে কোন ধরনের হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারবেন না। বর্তমানে প্রচলিত বিচার কার্যে বিচারকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অপরাধ ও অপরাধীর পরিবেশ পরিস্থিতি ও কার্যকারণের যথেষ্ট প্রভাব থাকে কিন্তু ইসলামী আইনে হুদুদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে দণ্ড প্রয়োগে এসব পারিপার্শ্বিকতা কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ইসলামী আইনে বিচারকের কোন অপরাধ ক্ষমা করার অধিকার থাকে না। তদ্রূপ কোন অপরাধীর শাস্তি বা দণ্ড মওকুফ করার ক্ষমতাও থাকে না। পক্ষান্তরে বর্তমান প্রচলিত আইনে সরকার প্রধান কিংবা রাষ্ট্র প্রধান অথবা সংসদ যে কোন অপরাধের শাস্তি রহিত করতে পারে। ইসলামী আইনে হুদুদ এর ক্ষেত্রে আপস মীমাংসার অবকাশ যেমন নেই

প্রকাশ : ১৯৩৬ খৃ. পৃষ্ঠা-৩। আমরা মনে করি, দিয়াতের মধ্যে শাস্তি ও জরিমানা উভয় দিকের মিলন ঘটেছে। এজন্য দিয়াত একই সাথে জরিমানা ও শাস্তি উভয়টির সাথে সামঞ্জস্য রাখে। অবশ্য দিয়াত শাস্তির সাথেই বেশি সামঞ্জস্য রাখে। কারণ কাসাসের স্থলে দিয়াত প্রবর্তিত হয়। আর কিসাস সর্বাংশেই একটি শাস্তি। অনেক ক্ষেত্রে দিয়াতের ক্ষেত্রে শাস্তিও কার্যকর করা হয়। যেক্ষেত্রে অত্যাচারিত দিয়াত নিতে অস্বীকৃতি জানায় সেক্ষেত্রে অত্যাচারিতের দাবী ছাড়াই অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হয়। সর্বাবস্থায়ই দিয়াতের মধ্যেও রয়েছে অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিবৃত রাখার ক্ষমতা। এসব গুণাবলী শাস্তির মৌল বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে একটা কথা প্রযোজ্য যে, কিসাস মৃতের ওয়ারিসীনের অধিকার। দিয়াতের দ্বারা শাস্তির উপাদান বিনষ্ট হয়ে যায় না। অবশ্য বলা যায়, যেহেতু দিয়াতের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয় না, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে দেয়া হয়, তাই এটা নিরেট শাস্তি নয়, জরিমানাও বটে।

www.pathagar.com

তদ্রূপ দায়মুক্তিরও কোন সুযোগ নেই। অবশ্য মিথ্যা অপবাদ আরোপের মতো হদ্দ প্রয়োগযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে আপস মীমাংসা কিংবা দায় মুক্তির[১] ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা যায়। তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে "হদ্দে কযফ' মিথ্যা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে আপস মীমাংসা কিংবা দায়মুক্তির সুযোগ নেই।[২] কিসাসের ক্ষেত্রে কিসাসের হকদার যদি তার প্রাপ্য অধিকার ক্ষমা করে দেয় তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বিচারক কিসাসের দণ্ড প্রয়োগ করতে পারেন না। অবশ্য অন্য শাস্তি প্রয়োগ করতে পারেন। এ দুটির মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো, কিসাস বান্দার হক আর হদ্দ আল্লাহর হক এর অন্তর্ভুক্ত।

দায়

উল্লেখিত অপরাধগুলোর জন্যে ইসলামী শরীয়ত কঠোর শাস্তির বিধান করলেও প্রত্যেকটি অপরাধ প্রমাণের জন্যে এমন কিছু শর্ত যুক্ত করেছে যেগুলো শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রকে করেছে খুবই সীমিত। যেমন, এসব অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে। অন্যান্য অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রমাণ পদ্ধতি এতোটা কঠোর করেনি। সেই সাথে এসব অপরাধে সামান্যতম সংশয় ও সন্দেহ হলেও তা অপরাধীর পক্ষে কল্যাণ বয়ে আনে। এসব অপরাধে শাস্তি প্রয়োগের মূলনীতিই হলো, কোন ধরনের অনিশ্চয়তা বা সংশয়ের অবকাশ থাকলে হদ্দ বা কিসাস রহিত হয়ে যাবে।

শর্তের মধ্যে সামঞ্জস্য

'হুদুদ' এর শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়ত যেসব সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে তা হলো– চুরির হদ্দ প্রয়োগ করতে হলে চোরাইকৃত জিনিসটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যমানের হতে হবে এবং চোর স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে, পরাধীন তথা দাসদাসী হলে হবে না। মিথ্যা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে আরোপিত ব্যক্তি বিবাহিত হওয়াকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কোন ফকীহর কাছে মাদকদ্রব্য সেবনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে মদ ছাড়া অন্যান্য মাদকের বেলায় নেশা সৃষ্টিকারী উপাদান থাকাকে শর্তযুক্ত করা

---

১ বাদায়ে আস সানায়ে; আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫৫, প্রথম সংস্করণ : মাতবায়াতুল জামালিয়া, মিসর ১৯১০ খৃঃ।

২ আল বাদায়ে, আল-কাসানী, ৭ম খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

হয়েছে। এসব শর্ত যদি বিদ্যমান না থাকে তাহলে চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটা এবং অপবাদ আরোপ ও মদ্যপানের ক্ষেত্রে 'দুররা' বা বেত্রাঘাত করার শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। হদ্দ থেকে কিছুটা লঘু ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। যেমন ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি ব্যভিচারী মুহসিন তথা বিবাহিত প্রমাণিত না হয়, যেভাবে এই অপরাধ প্রমাণকে শরীয়ত শর্তযুক্ত করেছে, তাহলে ব্যভিচারের অপরাধে তার ক্ষেত্রে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। বরং কুমার তথা অবিবাহিতের মতো হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ একশ বেত্রাঘাত কিংবা সেই সাথে দেশান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। একশ বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রয়োগে ফকীহগণের ঐকমত্য রয়েছে কিন্তু একই সাথে দেশান্তর করার ক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে।

অপরাধের প্রমাণ

ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণের জন্য ইসলামী শরীয়ত চারজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর শর্তারোপ করেছে। প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই কেবল ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণিত হবে। অবশ্য অপরাধীর স্বীকৃতিও অপরাধ প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। এক্ষেত্রে সাক্ষীর প্রয়োজন পড়ে না। এ ব্যাপারে কোন কোন ফকীহ বলেন, চার সাক্ষীর মতোই ভিন্ন ভিন্ন চারটি জায়গায় চারবার ব্যভিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ স্বীকার করতে হবে। শরীয়ত অপরাধ প্রমাণের জন্যে শর্তযুক্ত সাক্ষী এবং শর্তযুক্ত আত্মস্বীকৃতি এই দুই পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে জমহুরের মতে একথাও বলা হয়েছে যে, এসব হুদুদ ও কিসাসের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং শ্রুত বা অন্যের কাছ থেকে শোনা এমন কারো সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।

সংশয় সন্দেহ

যে কোন ধরনের সন্দেহ ও সংশয়ের কারণে হদ্দ এর শাস্তি রহিত হয়ে যায়।[১] মনে রাখতে হবে হদ্দ এর ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত সংশয় বা সন্দেহকে

---

[১] এই হাদীসটি সংশয় সন্দেহ দ্বারা হদ্দ ও কিসাস রহিত হয়ে যাওয়ার ভিত্তি। হাদীসে বলা হয়েছে "সংশয় সন্দেহ দেখা দিলে হদ্দ প্রয়োগ রহিত করে দাও। অপরাধীর পক্ষে যদি শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপাদান পেয়ে যাও, তাহলে তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ বিচারক যদি তাকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভুল করে বসেন এর চেয়ে বরং এটিই শ্রেয় যে তাকে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রেও ভুল করতে পারেন।" জাহেরিয়া সম্প্রদায় এ হাদীসকে সহীহ মনে করে না। এজন্য তারা

www.pathagar.com

একটা মৌল ভিত্তির মর্যাদা দিয়েছে। তাই সন্দেহ ও সংশয়ের কারণে নির্দিষ্ট অপরাধীর নির্দিষ্ট শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

সন্দেহের সংগা ও প্রকার

ফকীহগণ সংশয় সন্দেহ এর সংগা সম্পর্কে বলেন, সন্দেহ বাস্তব ঘটনার সাথে সাদৃশ্য রাখে তবে আদতে তা বাস্তব হয় না। কেউ কেউ বলেন, সন্দেহ বা সংশয় হলো এমন একটা জিনিস দৃশ্যত যার মধ্যে বাস্তবতার উপাদান থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাতে বাস্তবতা কিংবা বাস্তবতার প্রতিফলন থাকে না।

ইমাম আবু হানিফা র. সংশয় বা সন্দেহকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন– (১) সংশয়যুক্ত কর্ম, (২) সংশয়যুক্ত মালিকানা (৩) সংশয়যুক্ত চুক্তি।

সংশয়যুক্ত কর্ম : এটিকে সাদৃশ্যমূলক সংশয়যুক্ত কর্ম কিংবা অনুরূপ সংশয়যুক্ত কর্মও বলা হয়ে থাকে। সংশয় যুক্ত কর্মের অর্থ হলো– এমন কোন কাজে সন্দেহ হওয়া যাতে যে ব্যক্তির মধ্যে সংশয়যুক্ত হয়েছে তার জন্যে সেটি সংশয়যুক্ত আর যে ব্যক্তির মধ্যে কোন সংশয় দেখা দেয়নি তাতে তার কোন ধরনের সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। এ ধরনের সংশয়ের ক্ষেত্রে অপরাধী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের কর্মের পক্ষে কোন শক্তিশালী কিংবা দুর্বল দলিলের ভিত্তি ছাড়াই কিংবা অন্য কারো কাছ থেকে কোন ধরনের অবহিত হওয়া ব্যতিরেকে নিজের উপলব্ধিতে কোন হারাম জিনিসকে হালাল ভেবে তা সম্পাদন করে ফেলে। যেমন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে কিন্তু ইদ্দত চলাকালীন সময়ে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে, অথবা এমন স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে যে স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে সে তালাক দিয়ে দিয়েছে। সহবাস করার সময় সে মনে করেছে যে এই সময়ে সহবাস তার জন্যে হালাল, হারাম নয়। এ ধরনের সংশয়কে বলা হয় সংশয়যুক্ত কর্ম। এ ধরনের সংশয় কিংবা সন্দেহকে সংশয়যুক্ত কর্ম বলার

সন্দেহের ভিত্তিতে হদ্দ রহিত হয়ে যাওয়ার বিপক্ষে। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন 'আল-মুহাল্লা, ইবনে হাযম, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৫৩, দারুত তাবায়াতুল মুনীরিয়া, ১৩৫২ হিজরী) এ প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট শাস্তিগুলোর বর্ণনার পাশাপাশি সংশয় ও সন্দেহের আলোচনাকে আমি এজন্য সংযুক্ত করেছি যে, যদিও সংশয় সন্দেহের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে যায় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীকে সুনির্দিষ্ট শাস্তির পরিবর্তে সংশয়ের কারণে অনির্ধারিত শাস্তি তাযির দেয়া হয়। –গ্রন্থকার।

www.pathagar.com

কারণ হচ্ছে এই যে, এখানে শুধু কর্মের মধ্যে সংশয়, কর্মের সম্পাদন স্থলে কোন ধরনের সংশয়ের অবকাশ নেই। কর্মের সংশয় যুক্ত হয়েছে কর্ম সম্পাদনকারীর শরয়ী বিধানে অজ্ঞতার কারণে। বস্তুত এ ধরনের সংশয় ও সন্দেহের কারণেও সংশয়যুক্ত কর্ম সম্পাদনকারীর ক্ষেত্রে হদ্দ দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।

ক্ষেত্রের সংশয় : যাকে হুকমী সংশয় বা অধিকারগত সংশয়ও বলা হয়। এ ধরনের সংশয় তখনই হয়ে থাকে, যদি এমন কোন কাজ করা হয় যেটির স্বপক্ষে বৈধ হওয়ার দলিল থাকে বটে কিন্তু পক্ষের দলিলের চেয়ে কাজটি অবৈধ হওয়ার দলিল হয় বেশি শক্তিশালী ও বিদ্যমান। বস্তুত তখন একাজ প্রকৃত পক্ষে অবৈধ তথা হারাম বলে সাব্যস্ত হবে। তবে যেহেতু এর বৈধতার পক্ষেও দলিল বিদ্যমান রয়েছে সেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে একাজটি হারাম হওয়ার ব্যাপারটি সংশয়যুক্ত হয়ে যাবে। এ ধরনের সংশয়যুক্ত কাজগুলোর ক্ষেত্রে এ বিষয়টিই সাব্যস্ত হবে যে কাজটি বৈধ বা হালাল হওয়ার ব্যাপারে সম্পাদনকারীর সন্দেহ ছিল। যেমন মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর অপরাধ তখনই সংশয়যুক্ত হয় যখন মিথ্যা আরোপকারী আরোপিত ব্যক্তির পিতা হয়। এক্ষেত্রে অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান থাকে। বস্তুত শর্ত বিদ্যমান থাকাটা হদ্দ কার্যকরী হওয়ার তাকিদ দেয়। আমরা যদি প্রমাণাদির দিকে দৃষ্টি দেই যেসব প্রমাণাদিও শর্তাবলি দণ্ডকে অপরিহার্য ও সুনির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে এমতাবস্থায় মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী পিতার উপর দণ্ড প্রয়োগ হওয়াকেই সমর্থন করে। তবে এক্ষেত্রে এমন একটি দলিলও বিদ্যমান রয়েছে যা পুত্রের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধে পিতার উপর দণ্ড প্রয়োগকে অবৈধ করে দেয়।

কুরআনুল কারীম পরিষ্কার ঘোষণা করেছে, "পিতা-মাতাকে উহ্ শব্দ বলার মতো কষ্টও দিয়ো না।" এ আয়াত দাবী করে পিতা-মাতার অপরাধে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপভাবে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনে। মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে পিতার উপর কযফের দণ্ড প্রয়োগ সদ্ব্যবহারের পরিপন্থী। পিতা-মাতার কযফের অপরাধের ক্ষেত্রে যে হুকুম চুরির অপরাধের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। সেখানেও পুত্রের সম্পদে পিতার চুরি হারাম হওয়ার বিপরীতে একটি মজবুত দলিল রয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে হাত কাটার বদলে লঘু দণ্ডের অবকাশও আছে। সেখানে দলিল হলো "তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার সম্পদ" এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় পুত্রের সম্পদে পিতার এক ধরনের মালিকানা

www.pathagar.com

ও অধিকার রয়েছে। সাধারণত পুত্রের সম্পদে পিতা হস্তক্ষেপ করতে পারে; কেননা উভয়ের মধ্যে সীমাহীন মিল হওয়ার অবকাশ রয়েছে। একই বিধান স্বেচ্ছায় হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর ছেলে হয়। এ ধরনের সংশয়ের অবকাশ থাকার কারণে চুরি ও কযফের ক্ষেত্রে পিতার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না, তার হাত কাটা যাবে না, তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া যাবে না।

সন্দেহযুক্ত বিবাহ

ইমাম আবু হানিফা র. ও ইমাম যুফার র. এর দৃষ্টিতে সংশয়যুক্ত আকদ (বিবাহচুক্তি) বাহ্যিক বিবাহের সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট। এধরনের বিবাহের পর যদি নারী পুরুষের মধ্যে মিলন ঘটে তাহলে সেই মিলনটি সংশয়যুক্ত মনে করা হবে। যেহেতু এ ধরনের আকদকারী পক্ষদ্বয়ের ইজাব ও কবুল সম্পাদিত হয়েছে। বস্তুত পাত্র পাত্রীর মধ্যে ইজাব কবুল সম্পাদনের যোগ্যতা থাকা বাঞ্চনীয়। এ ধরনের বিবাহে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন ঘটে তবে তাতে সংশয়ের ভিত্তি থাকবে কিন্তু যিনার শাস্তি তথা হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। উদাহরণত কোন ব্যক্তি যদি মুহরিমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার সাথে সহবাসও করে ফেলে এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহচুক্তি বাতিল বা হারাম সাব্যস্ত হলেও আকদ (বিবাহচুক্তি) এর কারণে এর মধ্যে যে সংশয় সৃষ্টি হয় তার কারণে যিনার শাস্তি হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। যদিও এ ক্ষেত্রে মুহরিমার সাথে বিবাহ বন্ধনের বিষয়টি হারাম হওয়া ব্যভিচারী জ্ঞাত ছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ র. ও ইমাম মুহাম্মদ র. এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা র. এর বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, অপরাধীর যদি বিবাহ হারাম হওয়ার জ্ঞান না থাকে তাহলে হদ্দ রহিত হবে। কেননা এ ব্যাপারে ক্ষেত্রের সংশয় বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু মুহরিমার সাথে বিবাহ হারাম অপরাধীর যদি এই জ্ঞান থাকে তাহলে শাস্তি (হদ্দ) রহিত হবে না। ইমামদ্বয়ের কাছে সে ক্ষেত্রে শুধু বাহ্যিক বিবাহের আকদ সংশয় সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট নয়।

সংশয়ের আরেকটি প্রকার অপরাধ প্রমাণের সাথে সম্পৃক্ত। অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে যদি কোন ধরনের সংশয় সৃষ্টি হয় সে ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। যেমন ব্যভিচার, চোরাইপণ্য বা মদপানের অপরাধের ক্ষেত্রে এতো বিলম্বে সাক্ষী উপস্থাপন করা হয়েছে যে, বিচারকের কাছে এ বিলম্বের কোন যৌক্তিকতা নেই। এমতাবস্থায় সাক্ষীর ব্যাপারেই সংশয় জন্ম নেয়, আর সংশয়যুক্ত সাক্ষ্যে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না। যেমন স্বীকারোক্তি

www.pathagar.com

তাৎক্ষণিক করা হয়েছে বটে কিন্তু এর বর্ণনা রেকর্ড করা হয়েছে বেশি বিলম্বে। অপরাধী যদি বোবা হয়, সে যদি লিখিত আকারে কিংবা পরিষ্কার ইশারায় স্বীকারোক্তি দিয়ে থাকে কোন কোন ফকীহ'র দৃষ্টিতে তাতে সংশয়যুক্ত হওয়ার কারণে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।[১]

সংশয়ের আইনগত পরিণতি

সংশয়ের ভিত্তিতে যদি অপরাধীর উপর আরোপিত শাস্তি রহিত করে দেয়া হয় তাহলে ব্যাপারটি দুটির একটি পরিণতি লাভ করবে।

(এক) অপরাধীর উপর আরোপিত শাস্তি রহিত হওয়ার সাথে সাথে সে অভিযুক্ত অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ গণ্য হবে। কেননা তার অপরাধী হওয়ার ব্যাপারটিই সংশয়পূর্ণ। তাই তাকে একই অভিযোগে অন্য কোন ধরনের শাস্তি দেয়া যাবে না।

(দুই) হদ্দ প্রয়োগযোগ্য অপরাধে নির্দিষ্ট শাস্তির পরিবর্তে তাকে অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে। এটি এমন পরিস্থিতিতে করা হবে যখন তার ব্যাপারে সৃষ্টি হওয়া সংশয়টি তেমন শক্তিশালী নয় যে তাকে অপরাধীর বদলে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে সাব্যস্ত করবে। এক্ষেত্রে বিচারকের অধিকার আছে বরং বিচারকের কর্তব্য হলো, হদ্দ প্রয়োগের পরিবর্তে তার উপর অন্য কোন একটি বা একাধিক শাস্তি প্রয়োগ করা। বিচারক তাকে নিরপরাধ ঘোষণা করতে পারবেন না। এ ধরনের শাস্তিগুলোকে ইসলামী আইন তথা শরীয়তের ভাষায় তা'যিরাত অর্থাৎ ভীতিসঞ্চারমূলক এবং শিক্ষণীয় শাস্তি বলা হয়।

যে সব সংশয় সন্দেহের ভিত্তিতে অপরাধীর উপর থেকে নির্দিষ্ট শাস্তি রহিত করে দেয়া হয় এবং অপরাধীকে নিরপরাধ ঘোষণা করা হয় সেসব শক্তিশালী সংশয় সন্দেহকে দুভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

এক. সংশয় সন্দেহটা অপরাধের মূলভিত্তি তথা আরকানের মধ্যে থেকে মৌলিক কোন আরকানে সন্দেহ সংশয় পাওয়া যাবে।

দুই. যে কর্মের অপরাধে অভিযুক্তকে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেই কর্মের ব্যাপারেই সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে এই কর্মের ব্যাপারে যে

---

১ আল-মাবসূত, আস-সারাখসী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৫১, মাতবায়া আস-সায়াদাত, মিসর। আল-বাদায়ে লিল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৪৬ ও পৃষ্ঠা-২৩৫; তাবায়া আল জামালিয়া, মিসর ১৩২৮ হিজরী; আল আহওয়ালূশ শখসিয়া কিসমুয যাওয়াজ, মুহাম্মদ আবু যারা, পৃষ্ঠা-১৪৪; আত-তাশরীউল জিনাঈল ইসলামী, আবদুল কাদের আওদা, খণ্ড-১, কিসমুল আম, পৃষ্ঠা-২০৭।

www.pathagar.com

দলিল প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয় তার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে বা নাও থাকতে পারে।

অপরাধের মৌলভিত্তিগুলোর মধ্যে যদি সংশয় জন্ম নেয় তাহলে যেহেতু অপরাধটি সন্দেহজনক হয়ে ওঠে তাই অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে এবং তাকে আর কোন শাস্তিই দেয়া যাবে না। মূল অপরাধের ব্যাপারেই যদি সংশয় সৃষ্টি হয়, যেমন– কেউ যদি এমন কোন নারীর সংস্পর্শে যায় যে নারীকে বিবাহের দিনই তার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে এবং লোকজন যদি তাকে জানায় এই নারীর সাথেই তোমার বিবাহ হয়েছে, তাহলে এই পুরুষের ক্ষেত্রে যিনার ইচ্ছার ব্যাপারটি প্রমাণিত হবে না। কারণ সে যিনার উদ্দেশ্যে এ নারীর সংস্পর্শে যায়নি বরং সে তার বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ লাভের জন্যেই গিয়েছিল। আর সেটি ছিল তার কাছে সম্পূর্ণ বৈধ। যদি পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, সে তার বাগদত্তা স্ত্রীর কাছে যায়নি। অন্যকোন নারীর সাথে মিলিত হয়েছে তাতেও সে অপরাধ কর্ম করেছে বলে প্রমাণিত হবে না।

ইমাম আবু হানিফা র. মনে করেন, ভোতা এবং ধারালো নয় এমন কোন জিনিস দিয়ে কাউকে হত্যা করা হলে তা মৌল জরিমানামূলক কাজের মধ্যেই সংশয় সৃষ্টিকারীর পর্যায়ভুক্ত হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন সংশয়যুক্ত হয়ে পড়ে যে অভিযুক্তের হয়তো হত্যা করার ইচ্ছাই ছিলো না। হত্যার সংকল্পের মধ্যে সংশয় দেখা দেয়ায় অপরাধীর উপর থেকে কিসাস রহিত হয়ে যাবে এবং অপরাধীকে স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর পরিবর্তে সংশয়যুক্ত সংকল্পের অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে।[১]

যে নস বা প্রামাণ্য দলিল অভিযুক্তের কাজটিকে হারাম সাব্যস্ত করে সেই নস এর ইবারতে কাজটি সরাসরি উল্লেখ আছে কি নেই, যদি এ ব্যাপারে সংশয় থাকে, ফকীহদের মধ্যে যদি এক্ষেত্রে মতভেদ দেখা যায়, যদি কোন কোন ফকীহ বলেন, এই ইবারতের মধ্যে এ কাজটির অস্তিত্ব রয়েছে, আবার কোন কোন ফকীহ বলেন, এই ইবারতের সাথে উল্লেখিত কাজটির কোন অস্তিত্ব নেই। যেহেতু কোন কোন ফকীহর কাছে সম্পাদিত কাজটি অপরাধ হিসেবে গণ্য নয়, তাই অভিযুক্তের পক্ষে উপকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অভিযুক্তকে

---

১ বাদায়ে আস-সানায়ে, লিল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৩; আল-মাবসূত লিস-সরাখসী, খণ্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১২২; শরহে আয-যাইলাঈ আলা মাতানিল কানয, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৭।

www.pathagar.com

নিরপরাধ হিসেবে মুক্তি দেয়া হবে। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গটির উদাহরণ দেখা যায়। যেমন কোন পুরুষ যদি সাক্ষী ছাড়া বিবাহকর্ম সম্পাদন করে, অথবা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন তরুণী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং উক্ত পুরুষ সেই স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা যায়। কেউ কেউ এই সহবাসকে বৈধ বলেছেন, আবার কেউ কেউ এটিকে অবৈধ হারাম সাব্যস্ত করেছেন। এই মতভিন্নতার কারণে সহবাস হারাম করার নস এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি সংশয়পূর্ণ হওয়ার কারণে অভিযুক্তের উপর ব্যভিচারের হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

অনেক সময় অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রেও সংশয় দেখা দেয়। অপরাধের অস্তিত্ব সম্পর্কেই যদি সংশয় দেখা দেয়; যে অপরাধে শরীয়তে সুনির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে, সে ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তির বিধানটি অকার্যকর হয়ে যায়। তখন হয় অভিযুক্তকে সম্পূর্ণ নির্দোষ অভিহিত করে মুক্ত করে দিতে হবে নয়তো অন্য কোন লঘু শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে। যে শাস্তিকে তাযির বলা হয়।

অপরাধের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে যেসব সংশয়ের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ খালাস পেতে পারে এর উদাহরণ হলো, যেমন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরি, মদ্যপান অথবা ডাকাতির অভিযোগ উত্থাপন করা হলো, এখানে অপরাধ প্রমাণের একমাত্র ভিত্তি রাখা হয়েছে সাক্ষী। দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু বিচারক রায় ঘোষণার আগেই সাক্ষীরা তাদের দেয়া সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়। এক্ষেত্রে এই সংশয়টিই জোরালো হয়ে ওঠে সাক্ষী এখন যে কথাটি বলছে হয়তো এটিই সঠিক। এমন সংশয় জন্ম নেয়ার পর একই সাক্ষীর পূর্ব কথার উপর মোটেও নির্ভর করা যায় না। বস্তুত এক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ার কারণে অভিযুক্তের উপর থেকে শুধু হদ্দই রহিত হবে না, তখন বিচারকের জন্য আবশ্যিক হয়ে পড়বে অভিযুক্তকে নিরপরাধ ঘোষণা করা। কেননা সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়নি এবং এক্ষেত্রে সাক্ষী ছাড়া অপরাধ প্রমাণের আর কোন দলিল নেই।

যেসব অবস্থায় অপরাধ প্রমাণে সংশয় দেখা দেয়ায় অভিযুক্তের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যায় কিন্তু তাকে নিরপরাধ অভিহিত করা যায় না। এর উদাহরণ হলো, কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণের ভিত্তি যদি অপরাধীর স্বীকারোক্তি হয়, আর বিচারক শাস্তি ঘোষণার আগেই যদি সে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে তাহলে সেই অপরাধীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা

www.pathagar.com

যাবে না। কারণ স্বীকারোক্তি অস্বীকার কিংবা প্রত্যাহার করায় তার কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে সংশয়ের অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই স্বীকারোক্তি ও প্রত্যাহারের ঘটনায় তাকে অন্য কোন শাস্তি দেয়া যেতে পারে, যেসব শাস্তি তাযিরী অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উপরের আলোচনায় অপরাধীর অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা আর সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা একই দৃষ্টিতে দেখা যাবে না। সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি বেকসুর নিরপরাধ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু অপরাধীর অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার তাকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করবে না। কারণ সাধারণত মানুষ হদ্দ প্রয়োগযোগ্য এমন অপরাধে অপরাধী বলে স্বীকারোক্তি করে না। কিন্তু সাক্ষীদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেক মানুষ রাগ বা অনুরাগে, প্রলোভনে বা চাপে পড়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়? পক্ষান্তরে কোন অপরাধ না করে সাধারণত মানুষ অপরাধ করার কথা স্বীকার করে না। এক্ষেত্রে অপরাধী যদি বিচারকের অগোচরে অন্য কোন লোকের কাছে স্বীকারোক্তি দেয় তাহলে এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাযিরাতের অন্তর্ভুক্ত যে কোন শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে কিন্তু হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

বিচারক যদি মনে করেন, অপরাধী অপরাধ সংগঠনের ব্যাপারে যে অস্বীকৃতি দিয়েছে তা সঠিক তাহলে বিচারক তাকে নিরপরাধ ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অপরাধী যে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছে, জবরদস্তিমূলকভাবে তার কাছ থেকে এ ধরনের স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল, তাহলে সেই স্বীকারোক্তির গ্রহণযোগ্যতার শরয়ী ভিত্তি নেই। বস্তুত এজন্য এই অপরাধে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। উপরের আলোচিত স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে যে বিধান কার্যকর এ ধরনের অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রেও একই বিধান কার্যকর থাকবে। অপরাধ প্রমাণ ও হদ্দ প্রয়োগের পক্ষে যদি অতি আবশ্যিক প্রমাণাদি না থাকে, অথবা দলিল প্রমাণ আছে বটে কিন্তু হদ্দ ও কাসাসের দণ্ড প্রয়োগের জন্য অপরাধ প্রমাণের পক্ষে যে ধরনের শক্তিশালী প্রমাণাদি দরকার- প্রমাণাদি যদি তেমন শক্তিশালী না হয় তবে হদ্দ ও কিসাসের নির্দিষ্ট শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। তবে বিচারক যদি বুঝতে পারেন যে, প্রমাণাদি দিয়ে সাব্যস্ত না হলেও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঠিকই অপরাধী তাহলে তিনি তার বিবেচনা অনুযায়ী কোন শাস্তি দিতে পারেন। এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ জারি করার অধিকার বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভর করবে।

www.pathagar.com

উপরে উল্লেখিত অবস্থাগুলো ছাড়াও অন্যান্য কারণে সৃষ্ট সংশয়ের কারণে হদ্দ রহিত হয়ে যাওয়াটা অপরাধীকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করে না। হদ্দ রহিত হয়ে গেলেও বিচারকের বোধ বিবেচনায় যদি মনে হয় অপরাধী নির্দোষ নয় তাহলে তাযিরাতের পর্যায়ভুক্ত যেকোন ধরনের শাস্তির ঘোষণা বিচারক করতে পারেন।

হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে সংশয় কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং অপরাধীর শাস্তি প্রতিরোধ করে কিন্তু অপরাধীকে হদ্দ ও কিসাসের আওতা বহির্ভূত অন্যান্য লঘু শাস্তি দিতে বারণ করে না। যতক্ষণ না সংশয়টি মূল কাজটির ব্যাপারেই সন্দেহকে ঘণিভূত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– কেউ যদি এমন কোন নারীকে বিবাহ করে বসে, যে নারীর সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সব সময়ের জন্যেই সম্পূর্ণ হারাম এবং তার সাথে সহবাসও করে ফেলে তবে এই বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার ব্যাপারে তার জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক তবুও তার উপর শাস্তি বর্তাবে। ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির যদি সেই নারীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হওয়ার জ্ঞান থাকে তবে শাস্তিযোগ্য হবে। অথবা কোন ব্যক্তি যদি সামান্য কোন জিনিস চুরি করে অথবা এমন কোন জিনিস চুরি করে যা করাটা অপরাধের পর্যায়ভুক্ত নয়। যেমন বন্য শিকার। মূলত বনের শিকার যে কারো জন্যে হালাল কিন্তু যখন বনের কোন পশু পাখি কেউ শিকার করে তখন সেটি তার মালিকানাধীন হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোন কোন ফকীহর সংশয় থাকার কারণে শিকার চুরির অপরাধে হদ্দ এর শাস্তি দেয়া হবে না তবে তাযির অবশ্যই দেয়া হবে। বস্তুত যেসব কারণে এই চুরির হদ্দ থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে সেসব দলিল বিদ্যমান থাকার পরও এ ধরনের সম্পদ চুরি নিঃসন্দেহে হারাম। ফলে হারাম কাজের অপরাধী তাযিরী শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে না।

সংশয়ের ভিত্তিতে হদ্দ রহিত হয়ে যাওয়ার যেসব শর্ত ও মূলভিত্তি ইসলামী শরীয়ত নির্ধারণ করেছে, বর্তমান যুগের সকল আইন সেগুলোকে আত্মস্থ করেছে। অবশ্য আধুনিক আইনজ্ঞরা মুসলিম ফকীহদের অনেক বিশ্লেষণকে গ্রহণ করেননি। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অপরাধীকে সংশয় থেকে সৃষ্ট যে সকল সুবিধা পাশ্চাত্য আইনে দেয়া হয়েছে এর সবগুলোই ইসলামী আইন বিশারদদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে ধার করা। বিশেষ করে ফকীহদের মূলনীতি 'যে কোন হদ্দযোগ্য অপরাধে সংশয় হদ্দ প্রয়োগ রহিত করে দেবে'- এর প্রয়োগ আধুনিক আইনেও অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত।

www.pathagar.com

অসংখ্য অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থা এমন যে, বিচারক যদি এমন সংশয় পান যা অপরাধ আরো কঠিন করে তোলে যেমন, চুরির অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচারক যদি জানতে পারেন প্রকৃত পক্ষে এটি শক্তি প্রয়োগের চুরি নয়, তাহলে বিচারক অপরাধীকে শক্তি প্রয়োগে চুরির অভিযোগ থেকে রেহাই দিতে পারেন। কিন্তু শক্তি প্রয়োগ না করলেও মূলত চুরি কর্মটি যদি প্রমাণিত হয় তাহলে সাধারণ চুরির শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে।

অনুরূপ ইচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগের ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় অভিযুক্ত ব্যক্তি আগে থেকে নিহতের পিছু লেগেছিল এবং সুযোগের অপেক্ষা করছিল, তাহলে হত্যাকাণ্ডটির প্রমাণ সংশয়যুক্ত হলেও ইচ্ছাকৃত হত্যার বিষয়টি সংশয়যুক্ত হবে না বরং এক্ষেত্রে এ বিষয়টিও সাব্যস্ত হবে যে, হত্যাকারী ইচ্ছাকৃত ভাবেই নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। যদি সন্দেহ এমন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যা মূলত অভিযোগকে সংশয়যুক্ত করে ফেলে, যেমন হত্যাকাণ্ড ঘটানোর শুরুতে হত্যার ইচ্ছা ছিল কি-না, সেক্ষেত্রে বিচারক নিজ বিবেচনায় সিদ্ধান্ত দিবেন অপরাধী ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর অভিযোগে অভিযুক্ত না ভুলবশত আঘাতকারীর অপরাধে অপরাধী।

কোন কোন সময় বিচারক অপরাধের মূল ভিত্তিগুলোতেই সংশয়ে পড়েন, যে সবের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণিত হয় সেসব ক্ষেত্রে বিচারক অপরাধীকে বেকসুর নিরপরাধ অভিহিত করতে পারেন। যেমন চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারকের দৃষ্টিতে যদি দুর্নীতির সংশ্রব আছে বলে মনে হয়, সংশয়যুক্ত ক্ষেত্রের ভিত্তিতে বিচারক অপরাধীকে নিরপরাধ ঘোষণা করতে পারেন।

www.pathagar.com

তাযির বা শাস্তি

ইতোপূর্বে আমরা সেই সব অপরাধ কর্ম নিয়ে আলোচনা করেছি যেসব অপরাধের শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধের ক্ষেত্রেই শাস্তি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এগুলো ছাড়া আর যেসব অপরাধে শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি সেসব অপরাধে হদ্দ ও কিসাসের চেয়ে লঘু যে কোন ধরনের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। শরীয়তের পক্ষ থেকে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি সেগুলোকে তাযির নামে অভিহিত করা হয়।

تعزير এর সংগা

তাযির আরবী (عزر) উযর শব্দ থেকে উদ্ধৃত। আভিধানিক অর্থে তাযির শব্দের অর্থ হলো– বাধা দেয়া, নিষেধ করা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা রুখে দেয়া। আরবীতে বল হয়– عَزَّرَفُلَانٌ اَخَاهُ 'আযযারা ফুলানুন আখাহু' সে তার ভাইকে সাহায্য করেছে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে– وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ তুয়াযযিরুহু ওয়া তুআককিরুহু' রসূল স. এর সাথে সহযোগিতা করো এবং তাকে মহান মনে করো? (সূরা আল-ফাতাহ : ৯) এছাড়া আরো বলা হয় 'আযযারতুহু' আমি তাকে সম্মান করেছি। এ বাক্যটি আমি তাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাযির শব্দটি বিপরীত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যখন কোন ব্যক্তি শাস্তি ভোগের কারণে অপরাধ কর্ম থেকে বিরত থাকে তখন সে নিজেকে সম্মানিত করে সমাজে মর্যাদাবান হয়ে যায়। এ ধরনের শাস্তিকে এ অর্থেও তাযির বলা হয় যে, শাস্তি অপরাধীকে অপরাধ কর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখে। অথবা কোন একবার অপরাধ করে শাস্তি ভোগের পর আর দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করার সাহস করে না।

ফকীহদের দৃষ্টিতে তাযিরের সংগা

তাযির এমন এক অনির্দিষ্ট শাস্তি যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অপরাধী মানুষের উপর আবশ্যিকভাবে আপতিত হয় কিন্তু তা হদ্দ ও কিসাসের মতো সুনির্দিষ্ট নয়। শিষ্টাচারের প্রতি আগ্রহী করে তোলা, মানুষকে সংশোধন করা

www.pathagar.com

এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে তাযির হদ্দ ও কিসাসের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।[১]

সুনির্দিষ্ট শাস্তির সাথে তাযিরও কি যুক্ত হতে পারে? ফকীহগণ তাযির বলতে এমন শাস্তিকে বোঝান যেসব অপরাধে শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হদ্দ বা কাফফারা নেই সেসব অপরাধে শাস্তি স্বরূপ তাযির কার্যকর হয়। এ সংগার আলোকে বলা যায় যে, হদ্দ, কিসাস ও কাফফারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কয়েকটি বিশেষ অপরাধে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কোন একটি অপরাধে যদি কোন ধরনের শাস্তি নির্দিষ্ট থাকে তাতে এটাই সাব্যস্ত হয় যে এর পর আর কোন অনির্দিষ্ট শাস্তি এতে যোগ করার কোন দরকার নেই। কিন্তু তারপরও অনেকের মনে এই খটকা থেকেই যায়; শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট হদ্দ, কিসাস ও কাফফারার পর একই ব্যক্তির উপর তাযির প্রয়োগ কি জায়েয না নাজায়েয?

হদ্দ ও কিসাসের সাথে তাযির

পূর্ববর্তী ফকীহদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যাতে হদ্দ ও কিসাসের সাথে সাথে তাযিরও প্রয়োগ করা যায়। হানাফী মতাবলম্বীদের একথা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। হানাফী মতাবলম্বীগণ অবিবাহিত ব্যভিচারীকে শাস্তিস্বরূপ দেশান্তর করাকে হদ্দ এবং-এর অংশ বলে বিবেচিত নয় বলে মনে করেন। তাদের দৃষ্টিতে শুধু একশ বেত্রাঘাতই হদ্দ যে সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু দেশান্তরকে হদ্দ এর অন্তর্ভুক্ত মনে না করলেও তারা এ ধরনের অপরাধীদেরকে বেত্রাঘাতের পাশাপাশি দেশান্তর করাও জায়েয মনে করেন। বস্তুত হানাফীদের দৃষ্টিতেও অবিবাহিত ব্যভিচারীকে শাস্তিস্বরূপ শত বেত্রাঘাতের পর দেশান্তর করা যাবে। তাদের মত হলো, তাযির হিসেবে দেশান্তরের শাস্তিও বলবৎ করা যাবে যদি তাতে কোন উপকারিতা থাকে।

---

১ আস-সারাখসী, খণ্ড-৯ পৃষ্ঠা-৩৬; ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১৯; শরহে কানয লিয যাইলাঈ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩০৭; সুবুলুস্ সালাম, শরহে বুলুগুল মারাম, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৯; কাশশাফ আলকিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭২; আল আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-২২৪; নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৮২ ছাপা ৎ ১৯২২ খৃ. আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবূ য়ালা পৃষ্ঠা-২৬৩।

www.pathagar.com

'মুঈনুল হুক্কাম' গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. মদপানকারীকে কোরা(চাবুক) লাগানোর পর সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'একে তোমরা শাস্তি দাও এবং ধিক্কার জানাও।' রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশে সাহাবায়ে কিরাম মদপানকারীকে বলতে লাগলেন, "ওহে তোমার কি আল্লাহর কোন ভয় নেই, তোমার কি লজ্জা শরম নেই"? এতে পরিষ্কার বোঝা যায় এসব লাঞ্ছনা ছিলো হদ্দ এর অতিরিক্ত আর এই অতিরিক্তটা তাযির ছাড়া আর কি হতে পারে! বস্তুত এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, হদ্দ ও তাযির একই সাথে প্রয়োগ করা যায়।[১]

"তাবসিরাতুল হুককাম" গ্রন্থে মালিকী মাযহাবের একটি মতামত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আহত করে তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবে। সেই সাথে তাকে সংশোধনমূলক শাস্তিও দেয়া হবে। একথা থেকে বোঝা যায়, মালিকী মাযহাবের অনুসীরাও হত্যাকাণ্ডের চেয়ে কম পর্যায়ের ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রে কাসাসের সাথে সাথে তাযিরও যুক্ত করাকে বৈধ মনে করেন। তারা বলেন, কিসাস হলো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতির ভর্তুকি কিন্তু তাযির হলো অপরাধীর আত্মসংশোধনমূলক শাস্তি যা সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত।

অবশ্য মালিকীদের এই যৌক্তিকতার প্রয়োগ তখন প্রযোজ্য হবে না, যখন ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ কাউকে হত্যা করে। কারণ তখন তার অবধারিত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের পর আর কোন শাস্তি দানের অবকাশ থাকে না। হ্যা, অবশ্য তখন তাযির বৈধ হয়ে যায় যখন কোন কারণে কিসাস নেয়া সম্ভব না হয় যাতে অপরাধী শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ রেহাই না পেয়ে যায়।

হানাফী মতাবলম্বীদের কাছেও মালিকীদের মতো মদ্যপানকারীর উপর হদ্দ জারী করার পর মৌখিক তাযির প্রয়োগ করা যায়। তাদেরও প্রামাণ্য দলিল হলো আবু হুরায়রা রা. এর সেই হাদীস, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।[২]

ইমাম আহমদ র. এর দৃষ্টিতে চোরের হাত কাটার পর তার কাটা হাতটি গলায় ঝুলিয়ে দেয়া উচিত। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর অনুসারীরা এ ক্ষেত্রে ফাদালা বিন উবায়েদ এর বর্ণনা থেকে প্রমাণ পেশ করেন। এ বর্ণনায়

---

১ মুঈনুল হুক্কাম, ফিমা য়াতারাদ্দাদু বায়নাল খাছমাইনি মিনাল আহকাম, পৃষ্ঠা-১৮৯।

২ তাবসিরাতুল হুক্কাম, ইবনে ফারহুন আলা হামশিন ফাতহুন আলাল মালিক, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২২ ও ৩৬৭; মাওয়াহিবুল জলীল, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭; আত-তাশরীউল জিনাঈল ইসলামী, আবদুল কাদের আওদা, পৃষ্ঠা-১৩০।

www.pathagar.com

বলা হয়েছে, নবী কারীম স. এর সামনে এক চোরকে হাজির করা হলে তার হাত কেটে দেয়া হলো। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হলো, তার কাটা হাত তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হোক। হযরত আলী র. তার শাসনামলে এ বর্ণনার নির্দেশ কার্যকর করেছেন। এক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, এ কাজের মধ্যে চুরি সম্পর্কে মারাত্মক ঘৃণা, ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা যায়। এটাকে এ দৃষ্টিতে তাযির বলা যায়। কারণ চুরির অপরাধে সুনির্দিষ্ট শাস্তি প্রয়োগের পর এটি অতিরিক্ত আরেকটি সাজা বা তাযির।[১]

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, ইসলামী শরীয়তে তাযির সাধরাণত এ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত কোন বিশেষ শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়নি। এটিই এ আইনের মূলভিত্তি। তবে ইসলামী আইনে এমন কোন বিধান নেই যা হদ্দ ও কিসাসের সাথে তাযির যুক্ত হওয়াকে রোধ করে। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে হদ্দ ও কিসাসের শাস্তি প্রয়োগের সাথে তাযির প্রয়োগ কল্যাণকর বিবেচিত হয়। কেননা তাযির প্রয়োগ করা হয় সামাজিক কল্যাণ ও ব্যক্তির আত্মসংশোধনের জন্য।

অবশ্য যেসব শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের পর্যায়ভুক্ত যেমন স্বেচ্ছায় হত্যা করার কিসাস; সেসব ক্ষেত্রে তাযির প্রয়োগের বিষয়টি ভেবে চিন্তে করতে হবে। কেননা মৃত্যুদণ্ড যেহেতু অপরাধীর জীবনাবসান ঘটাবে সে ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের আগে তার উপর তাযিরী শাস্তি প্রয়োগ মৃত্যুদণ্ডকে আরো ভয়ানক করে তুলবে। বস্তুত এক্ষেত্রে আইনদাতা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে তাযির প্রয়োগের কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

শাস্তি ও কাফফারা

ফকীহদের ব্যাপক অংশের মত হলো, কাফফারা দণ্ডের সাথে সাজা বা শাস্তিও যুক্ত হতে পারে।[২] তাঁরা বলেন, কোন কোন অপরাধ এমন যেগুলোতে

---

১ নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৭২-১৭৩; আসনাল মাতালিব, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬২; আত-তাশরীউল জিনাঈল ইসলামী, পৃষ্ঠা-১৩০-১৩১।

২ কাফফারা এক ধরনের ইবাদত। এমন কোন কারণে যদি কাফফারা ওয়াজিব হয় যা গোনাহর পর্যায়ভুক্ত নয় তাহলে সেই কাফফারা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন যে ব্যক্তি দৈহিকভাবে রোযা রাখতে অক্ষম তাকে রোযার বদলে কাফফারা স্বরূপ অসহায় নিঃস্ব লোকদের আহার করাতে হয়। কিন্তু কাফফারা যদি কোন গোনাহর কারণে ওয়াজিব হয় তাহলে সেই কাফফারাকে নির্ভেজাল শাস্তি বলে। যেমন ভুলবশত হত্যাকাণ্ড কিংবা স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করে যিহার করার কারণে শাস্তিস্বরূপ ওয়াজিব কাফফারা।

www.pathagar.com

কাফফারা ও সংশোধনমূলক শাস্তি উভয়টিরই প্রত্যাশা থাকে। যেমন, কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করে, অথবা রমযানে দিনের বেলায় স্ত্রীসঙ্গম করে অথবা কেউ স্ত্রীর সাথে যিহার করে তখনই সেই ব্যক্তির নির্দিষ্ট কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব। ওয়াজিব কাফফারা আদায় করার আগেই যদি সেই ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গম করে এমতাবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের অপরাধ করার কারণে তার উপর সংশোধনমূলক দণ্ড ও কাফফারা উভয়টিরই প্রয়োগ হবে।

ইমাম শাফেয়ী র. এর মতে, স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে মিথ্যা কসমের কাফফারার সাথে দণ্ডও যুক্ত হওয়াটা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কিন্তু হানাফীদের মতে, মিথ্যা কসমের ক্ষেত্রে শুধু কাফফারা আবশ্যিক, এর সাথে দণ্ড যুক্ত করা আবশ্যিক নয়। অনুরূপ যে হত্যাকাণ্ডে রক্তপণ আদায় আবশ্যিক নয়, যেমন কোন হত্যাকাণ্ডে নিহতের উত্তরাধিকারীগণ যদি কিসাস ক্ষমা করে দেয় সেক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর রক্তপণ তথা দিয়াত আদায় করা আবশ্যিক এবং এক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর কাফফারা মুস্তাহাব। ইমাম মালিক র. বলেন, এধরনের অপরাধীকে একশ কুরা (বেত্রাঘাত) এবং এক বছরের জেল দিতে হবে। ইমাম মালিক র. এর মতানুযায়ী দণ্ড কার্যকর করলেও দেখা যায় এতে শাস্তির সাথে কাফফারও যুক্ত হতে পারে।[১]

কোন কোন ফকীহ ইচ্ছাকৃত সংশয়যুক্ত হত্যাকাণ্ডের শাস্তির ক্ষেত্রেও দণ্ড ও কাফফারা যুক্ত হওয়াকে আবশ্যিক মনে করেন। তাদের মতের দলিল হিসেবে তারা বলেন, ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের কাফফারার মতো উপরে বর্ণিত

কোন কোন ফকীহ বলেন, কাফফারা ইবাদত ও শাস্তির মাঝামাঝি একটি জিনিস। কেননা, কাফফারা এমন অপরাধে ওয়াজিব হয়ে থাকে যেসব বিষয় নিরেট মুবাহ বা নিরেট অপরাধের মাঝামাঝি পর্যায়ের কর্ম। উদাহরণত বলা যায়, আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নে জল্লাদের হত্যাকাণ্ডে তার উপর কোন কাফফারা ওয়াজিব হয় না। অনুরূপ স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর উপর কোন কাফফারা নেই। কিন্তু ভুলবশত হত্যাকাণ্ডে কাফফারা রয়েছে। কারণ এখানে হত্যাকাণ্ডটি অপরাধ হিসেবে সংঘটিত হয়নি কিন্তু হত্যাকাণ্ডটি যে ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়ে গেছে সেই ব্যক্তিটি ছিলো নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। কেউ কেউ কাফফারাকে জরিমানার অনুরূপ মনে করেন। কেননা কাফফারা কখনো আর্থিক জরিমানার আদলে শাস্তিস্বরূপ হয়ে থাকে, আবার কখনো ভর্তুকির সূরতে এক ধরনের আর্থিক বদলা হয়ে থাকে, তখন কোন ক্ষতির বিপরীতে কাফফারা আদায় করা হয়। কাফফারা কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তি ও প্রতিদান উভয়ই হয়ে থাকে। আল-মাবসূত, সারাখসী, খণ্ড-২৭, পৃষ্ঠা- ৮৬; আত-তাশরীউল জিনাঈল ইসলামী, পৃষ্ঠা-১৩১।

১ তাবসিরাতুল হুক্কাম, ইবনে ফারহুন, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৬-৬৭; নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা- ১৭২,১৭৩।

www.pathagar.com

কাফফারার বিষয়টিও আল্লাহর হক। কারণ এই কাফফারা শুধু হত্যাকাণ্ডের জন্যে আবশ্যিক করা হয়নি, আবশ্যিক করা হয়েছে এই কারণে যে, হত্যাকাণ্ডের কারণে যে সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে তার প্রতিবিধান করা। অবশ্য ভুলবশত ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের শাস্তি ভিন্ন এবং তাতে কাফফারা আবশ্যিক নয়। উল্লেখিত মতাবলম্বীগণ এ বিষয় থেকেও স্বপক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন যে, কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করে, কৃত অপরাধে যদি অপরাধীর দ্বারা কোন জিনিসের ক্ষতি না হয় তাহলে অপরাধী অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে বটে কিন্তু তার উপর কোন ধরনের কাফফারা আবশ্যিক হবে না। এর বিপরীতে অপরাধী অপরাধ কর্ম সম্পাদন করেনি কিন্তু তার দ্বারা প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে অপরাধীকে শাস্তিভোগ করতে হবে না কিন্তু কাফফারা অবশ্যই আদায় করতে হবে। বস্তুত রোযা বা ইহরামরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃত স্ত্রীসহবাস করায় যেমন কাফফারা ওয়জিব হয় ভুলবশত স্বেচ্ছায় হত্যাকাণ্ডের কাফফারার বিষয়টিও তেমন।[১]

উপরের আলোচনা শেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শাস্তি ও কাফফারা একই সাথে যুক্ত হতে পারে। যদি এই সংযুক্তির মধ্যে কোন ধরনের কল্যাণকর দিক থাকে। অবশ্য অধিকাংশ ফকীহর মতে উপরের প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকলেও মূলনীতি হলো, যে অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে হদ্দ ও কাফফারা আবশ্যিক নয় মূলত সেই অপরাধই তাযিরের পর্যায়ভুক্ত।

তাযির : আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের হক

ফকীহগণ অন্যান্য অধিকার বা মৌলিক হক এর মতো তাযিরকেও দুভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো সেই তাযির যা আল্লাহর অধিকারভুক্ত আর অপরটি হলো মানুষের অধিকারভুক্ত।[২]

---

[১] কাশশাফুল কিনা আন-মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭২,৭৩।

[২] কোন কোন ফকীহ আট প্রকার হক্কুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। (১) একান্ত ইবাদত যেমন ঈমান (২) শাস্তি যেমন হদ্দ। (৩) এ ধরনের শাস্তি যেগুলো মানুষকে অনাত্মীয় ঘোষণা করে, যেমন মীরাস (উত্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিতকরণ। (৪) এ ধরনের অধিকার যেগুলো শাস্তি ও ইবাদত উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করে। অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে শাস্তি ও ইবাদত উভয়টি পাওয়া যায়। যেমন : কাফফারা। (৫) সেইসব ইবাদত যেগুলোর মধ্যে মানুষের উপর আর্থিক দায়িত্বভার থাকে যেমন সাদকা-ফিতরা। (৬) সেই সব আর্থিক কর্তব্য পালন যেগুলোর মধ্যে ইবাদতের সংশ্লিষ্টতাও রয়েছে যেমন উশর। (৭) সেইসব আর্থিক কর্তব্য পালন যেগুলোর মধ্যে একধরনের শাস্তির আভাস রয়েছে যেমন– খারাজ আদায়। (৮) সেইসব অধিকার যেগুলো নিজেরাই অস্তিত্বমান থাকে,

www.pathagar.com

আইনের দৃষ্টিতে আল্লাহর হক বা অধিকার বলতে বোঝায়– যেসব বিষয়ের সাথে ব্যাপক গণমানুষের স্বার্থ জড়িত। অথবা যেসব বিষয়ে ব্যাপক গণমানুষের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করার ব্যাপার রয়েছে, কোন ব্যক্তি বিশেষের লাভ ক্ষতির সাথে যে বিষয় সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপক গণমানুষের স্বার্থ, কল্যাণ অকল্যাণের বিষয়গুলোকেই ইসলামী শরীয়ত আল্লাহর হক বা অধিকার বলে অভিহিত করেছে। এগুলোকেই মানব রচিত আইনে (Public Right) বলা হয়ে থাকে।

কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন মন্দ কাজ করে যে ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোন শাস্তির বিধান নেই এবং উক্ত ব্যক্তির মন্দ কাজের দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বিশেষের কোন ক্ষতিও সাধিত হয়নি, তাহলে উক্ত মন্দ কাজের অপরাধে অপরাধীকে যে শাস্তি দেয়া হবে সেটি আল্লাহর হক (আল্লাহর অধিকার) ক্ষুণ্ন করার অপরাধ বলে পরিগণিত হবে। কেননা সমাজকে সব ধরনের মন্দ, অপরাধ ও ক্ষতিকর বিষয়াবলী থেকে মুক্ত রাখা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখা শরীয়তের অপরিহার্য কাজের অন্যতম। এ আইনের উদ্দেশ্য হলো মানব সমাজকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা এবং গণমানুষের স্বার্থের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন একক ব্যক্তি বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বলা হয় ব্যক্তি অধিকার বা নাগরিক অধিকার যা প্রচলিত আইনে (Private Right) বলে অভিহিত।

তাযিরাতের পর্যায়ভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে হক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) বা হক্কুল ইবাদ-এর (গণ অধিকার) মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কিছু শাস্তি শুধুই হক্কুল্লাহ বিনষ্টের কারণে দেয়া হয় হক্কুল ইবাদের সাথে সেগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। যেমন স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগকারী, মদ্যপানকারী, শরীয়ত

যেমন খুমুস (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ সরকারী ট্রেজারীতে জমা দেয়া আবশ্যিক) ও পশু সম্পদের আদায়যোগ্য যাকাত।

হক্কুল্লাহর এসব বিভাজন সম্পর্কে ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক সানুরী, একটা চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, হক্কুল্লাহর সাধারণ সীমানা ব্যাপক। হক্কুল্লাহর মধ্যে দীন ও গণঅধিকার আইন (Public Law) একাকার হয়ে যায় তদ্রূপ ফৌজদারী ও অর্থনৈতিক আইনের মধ্যেও মিশ্রণ ঘটে। (আত-তালবীহ, পৃষ্ঠা-৭০৫, মাসাদিরুল হাক্কি ফিল ফিকহিল ইসলামী মাআল মুকারিনাতু বিল ফিকহিল গারবী।) এগুলো হলো অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সানুরীর বক্তৃতামালার সংকলন যা তিনি আরব লীগের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান উচ্চতর গবেষণা সংস্থায় দিয়েছিলেন। প্রকাশ : ১৯৫৪, পৃষ্ঠা-৪৪।

www.pathagar.com

অনুমোদিত অসুবিধা ছাড়া রমযানের রোযা ত্যাগকারী এবং মদের আড্ডায় অংশগ্রহণ কিংবা ব্যবস্থাপনায় জড়িত থাকার অপরাধে ইসলামী আইনে যে শাস্তি দেয়া হয় সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই হক্কুল্লাহ লঙ্ঘিত হওয়ার বিষয়টিই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কারণ এ ধরনের অপরাধে সমাজ ও গণমানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। এজন্য এসব অপরাধ নির্মূল করে গণমানুষ ও সমাজকে ক্ষতির আশঙ্কা থেকে মুক্ত রাখাই শাস্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্য। এসব অপরাধের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হয় না, যার কারণে এটিকে আমরা ব্যক্তি বা গণ অধিকার ক্ষুণ্নের অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে পারি।

অবশ্য কোন কোন সময় হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের মধ্যে এমন মিশ্রণ ঘটে যে হক্কুল্লাহ প্রাধান্য বিস্তার করে। যেমন পরস্ত্রীকে চুমু দেয়া, প্রেম নিবেদন করা কিংবা নির্জনে মিলিত হওয়ার (যার মধ্যে দৈহিক মিলনের প্রমাণ নেই) মতো অপরাধে যে শাস্তি দেয়া হয় তাতে হক্কুল ইবাদও রয়েছে। কিছু সংখ্যক ফকীহ এমত প্রকাশ করেছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে তাযিরী শাস্তি শুধু হক্কুল ইবাদ তথা ব্যক্তিস্বার্থ ক্ষুণ্নের অপরাধেই দেয়া হয়। যেমন কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক (নাবালেগ) বালক যদি কাউকে অশ্লীল গালি দেয় সে অপরাধে তাকে যে শাস্তি দেয়া হয় সেটি একান্তই ব্যক্তি অধিকার ক্ষুণ্নের অপরাধ। কেননা নাবালেগ বালকের হক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর অধিকার পালনের উপযুক্ততা নেই। কোন কোন তাযিরী শাস্তির ক্ষেত্রে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদত উভয়টিই কার্যকর ভূমিকা পালন করে কিন্তু এক্ষেত্রে হক্কুল ইবাদ প্রাধান্য বিস্তার করে। যেমন, কাউকে গালিগালাজ করা কিংবা কোন ব্যক্তির গায়ে হাত তোলার অপরাধে যে শাস্তি দেয়া হয় তা এমন পর্যায়ভুক্ত যাতে একদিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং সেই সাথে সেই ব্যক্তির মান সম্মান সমেত সামাজিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে, নয়তো সে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা একান্তই সেই ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপর দিকে এই অপরাধে আল্লাহর অধিকারেও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর সকল সৃষ্টিকুলকে অনর্থক কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা আল্লাহর অধিকার পালনের অন্তর্ভুক্ত।[১]

---

[১] দেখুন শরহে তাওয়ালিউল আনওয়ার, শরহে আস-সুনদী আলা দুররিল মুখতার। খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬২১ ও ৬৩৬। এই কিতাবটি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। এ কিতাবটিতে দেখা যায়, ১২৯৪ হিজরী সনের যিলকদ মাসে এটার লেখা শেষ হয়েছে। আল ফসূলু খামসাতা আশারা ফি-মা ইউজিবুত তাযিরু ওয়া মা লা ইউজিবু ওয়া গাইরু যালিকা, আল্লামা আল আসতার ওয়াশনী, পৃষ্ঠা-৫। আল-

www.pathagar.com

হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ এর মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব

হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ এর শাস্তির মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠেছে। নিম্নের কয়েকটি উদাহরণ এই দুই ধরনের শাস্তির মধ্যে পার্থক্যকে আরো সহজবোধ্য করবে।

(১) কোন ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি ধার্য করা হয় কিংবা যে অপরাধে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের মিশ্রণ থাকলেও হক্কুল ইবাদের প্রাধান্য থাকে যেমন, কাউকে গালিগালাজ করা কিংবা কারো উপর হাত উঠানো এবং এর শাস্তি প্রয়োগের বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্তের অভিযোগের (Complain) উপর নির্ভর করে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যখন প্রতিকারের দাবী করা হয়, তখন এর প্রতিকার করা বিচারকের জন্যে আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সেই সাথে প্রতিকার প্রত্যাশী ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিচার ও শাস্তির জন্যে অবিচল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিচারক এই মামলা খারিজ করতে পারবে না। এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে সমকালীন শাসকের পক্ষ থেকেও অপরাধীকে ক্ষমা করার ঘোষণা করা কিংবা ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে বাদীকে সুপারিশ করাও বৈধ নয়। এর বিপরীতে হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তির শাস্তির ক্ষেত্রে সমকালীন শাসকের পক্ষ থেকে ক্ষমা ঘোষণা কিংবা ক্ষমার সুপারিশ উভয়টিই বৈধ। কিন্তু ক্ষমা করা কিংবা অপরাধীর শাস্তি কমিয়ে ভিন্ন উপায়ে তার সংশোধনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এক বর্ণনায় রয়েছে, 'তোমরা আমার কাছে সুপারিশ করো যদিও আল্লাহ তাআলা তার নবীর মুখ থেকে সেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবেন যে অভিপ্রায় তিনি পোষণ করেন।'[১]

দ্বিতীয় প্রকার তাযিরে শাস্তি প্রয়োগ সমকালীন শাসকের উপর ওয়াজিব তথা আবশ্যিক কি না এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, যেসব শাস্তি সম্পর্কে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, সে সব শাস্তি প্রয়োগ করা

আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-২২৫। আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৬৫। মাসাদিরুল হাক্কি ফিল ফিকহিল ইসলামী- ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক সানুরী, পৃষ্ঠা-৪৪।

১ দেখুন, হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯২, আল-ফুসূলুল খামসা আশারা ফিত তাযির, আল আসতার ওয়াশনী, পৃষ্ঠা-৩, এবং আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২৫।

www.pathagar.com

শাসকের জন্য আবশ্যিক তথা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, এ ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করা শাসকের জন্যে আবশ্যিক নয়। তিনি প্রমাণ স্বরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেন, 'একদিন এক ব্যক্তি নবী কারীম স. এর কাছে এসে বললো, আমার কাছে এক মহিলা এসেছিল, সঙ্গম ছাড়া আর সব কিছুই আমি তার সাথে করেছি। নবীজী স. বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করোনি? লোকটি বললো, জী হ্যা, আমি আপনাদের সাথে নামায আদায় করেছি। অতঃপর নবীজী স. এই আয়াত পাঠ করলেন, ইন্নাল হাসানাতি ইউযহিবনাস সাইয়্যিয়াত– 'নিশ্চয়ই ভালো কাজ মন্দকাজকে দূর করে দেয়।' ইমাম শাফেয়ী র. এই হাদীস থেকে উসূল গ্রহণ করেছেন। নবী কারীম স. মদীনার আনসার সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তাদের ভালো কাজগুলোকে তোমরা গ্রহণ করো আর মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দাও।' ইমাম শাফেয়ী র. এই ঘটনাকেই প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। একবার একটি মোকদ্দমায় নবী কারীম স. হযরত যোবায়ের রা. এর পক্ষে সিদ্ধান্ত দিলে প্রতিপক্ষ তার উদ্দেশ্যে বললো, ও! যোবায়ের তো আপনার ফুফাতো ভাই, তাই না? এর অর্থ ছিল আত্মীয়তার খাতিরে তিনি ইনসাফ না করে ফুফাতো ভাইয়ের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এ কথায় নবীজী স. লোকটির উপর ভীষণ মনোক্ষুণ্ন হন কিন্তু কোন শাস্তি দেননি।

হাম্বলী মাযহাবের কিছু সংখ্যক অনুসারীও অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, যেসব শাস্তির ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে সেসব শাস্তি প্রয়োগ করা আবশ্যিক। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীর মালিকানাধীন দাসীর সাথে কিংবা যৌথ মালিকানাধীন দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে এর শাস্তি প্রয়োগ অপরিহার্য। কিন্তু যেসব শাস্তির ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই সেসব ক্ষেত্রে কল্যাণকর দিক হলো শাস্তি প্রয়োগ করা। কেননা শাস্তি প্রয়োগ ছাড়া অপরাধীকে অপরাধ থেকে বিরত রাখার আর কোন কার্যকর পন্থা যদি না থাকে তবে শাস্তি প্রয়োগ আবশ্যিক। কারণ হুকুল্লাহর পর্যায়ভুক্ত বলে শাস্তি প্রয়োগ শরীয়ত নির্দেশিত আর শাস্তি প্রয়োগ করে মানুষকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করাই শরীয়তের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রেও হদ্দ এর মতো শাস্তি প্রয়োগ করা আবশ্যিক। তবে যদি এ বিষয়টি অনুধাবন করা যায় যে, শাস্তি দেয়া ছাড়াই অপরাধীকে সংশোধন করা সম্ভব তাহলে শাস্তি প্রয়োগ আবশ্যিক নয়। এক্ষেত্রে শাসক ভালো মনে করলে শাস্তি ক্ষমা করে দিতে পারেন। উল্লেখিত ফকীহগণ ইমাম শাফেয়ী র. বর্ণিত হাদীস থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

www.pathagar.com

এ কথা মনে রাখতে হবে, উল্লেখিত মতভিন্নতা শুধু এমন শাস্তির ক্ষেত্রে যে শাস্তি হক্কুল্লাহর পর্যায়ভুক্ত। হক্কুল ইবাদ তথা ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি আবশ্যিক হয়ে পড়ে সে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমকালীন শাসক কিংবা বিচারকের বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই।

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি, হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি নির্ধারিত তা বাস্তবায়ন করা শাসকের জন্যে অপরিহার্য। এক্ষেত্রে শাসকের পক্ষ থেকে কোন ধরনের ক্ষমা প্রদর্শন, কল্যাণ অন্বেষণ বা অপরাধীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা বৈধ নয়। অবশ্য শাসক যদি মনে করেন, শাস্তি দেয়া ছাড়াই সংশোধন সম্ভব তাহলে শাস্তি কার্যকর নাও করতে পারেন।

উপরে যে সাহাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তিনি এক মহিলার সাথে সংগম ছাড়া আর সবকিছুই করেছিলেন, কিন্তু নবী কারীম স. তাকে শাস্তি দেননি। কারণ তাকে অপরাধী হিসেবে পাকড়াও করা হয়নি বরং তিনি স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে সংশোধনের জন্য লজ্জাবনত হয়ে রসূলুল্লাহ স. এর দরবারে এসে আত্মস্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যার ফলে রসূলুল্লাহ স. বুঝতে পেরেছিলেন তাকে সংশোধনের জন্যে শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ সে নিজেই অপরাধ থেকে বিরত থাকতে প্রস্তুত। আর অপর ঘটনায় এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স. এর ফয়সালা শুনে তার বিচারের প্রতি কটাক্ষ করেছিল তাতে লোকটি রসূলুল্লাহ স. এর মর্যাদা ও ইনসাফের প্রতি সংশয় প্রকাশ করে তার অধিকার ক্ষুণ্ন করেছিল। যেহেতু বিষয়টি হক্কুল ইবাদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিল তাই সেক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তির অধিকার রয়েছে তার প্রতি কেউ যদি অবিচার করে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার। অন্যভাবে বলা যায়, লোকটি রসূলুল্লাহ স. এর ন্যায় বিচারের ব্যাপারে আক্রমণ করে নবীজী স. এর ব্যক্তিসত্তাকে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে, নবীজী তার বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দেন।[১]

আলোচনার এ পর্যায়ে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে, গণঅধিকার লঙ্ঘনের কারণে যে শাস্তি অবধারিত হয় সেই অপরাধীকে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় তাহলে শাসক ইচ্ছা করলে সংশোধনের জন্যে অপরাধীকে শাস্তি দিতে

---

[১] হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯২; আল আসতার ওয়াশনী ফিত-তাযির, পৃষ্ঠা-৫; শরহে তাওয়ালিউল আনওয়ার, শরহে আস-সুনদী আলা দুররিল মুখতার, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৩৬, কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৬৪, পৃষ্ঠা-৭৪। আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৪৮/৩৪৯। আশ-শারহুল কবীর যা আল-মুগনীর সাথে যুক্তভাবে ছাপানো, পৃষ্ঠা-৩৬২-৩৬৩।

www.pathagar.com

পারেন। কারণ সমাজকে অপরাধমুক্ত করা এবং অপরাধ প্রবণতা রোধ করার জন্য কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা শাসকের অধিকার। শাসক যদি মনে করেন ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম কিংবা শাস্তি প্রয়োগ ছাড়াও অপরাধীর সংশোধন সম্ভব তাহলে শাস্তি রহিত করতে পারেন।[১]

(২) হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদের মধ্যে একটা পার্থক্য এও রয়েছে যে, গণঅধিকার প্রশ্নে যে শাস্তি অপরাধীর উপর প্রয়োগ আবশ্যিক হয়ে পড়ে. তার মধ্যে মিশ্রণ হয় না। অর্থাৎ অপরাধের পুনরাবৃত্তিতে শাস্তিও পুনরায় প্রয়োগ হবে। যেমন কেউ যদি বিভিন্ন সময় কাউকে গালিগালাজ করে তাতে সাধারণত এটাই মনে করা হবে যে, বিচারক অপরাধীকে একাধিকবার শাস্তি দেবেন। কিন্তু হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি নির্ধারিত হয় তাতে শাস্তির পুনরাবৃত্তি হয় না, এতে শাস্তির মধ্যে সংযুক্তি হতে পারে। উদাহরণ, যদি কোন ব্যক্তি রমযান মাসে ইচ্ছা করে কয়েকদিন রোযা না রাখে তাহলে কয়েকটি বা সারা মাস রোযা ত্যাগ করার জন্যে তাকে একবারই শাস্তি দেয়া হবে।[২]

বিখ্যাত ফিকহের কিতাব 'কাশশাফুল কিনা' এ ভিন্ন একটি মতামতও বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে– কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি একাধিক অপরাধের অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং এসব অপরাধ একান্তই আল্লাহর অধিকার হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেগুলো যদি একই পর্যায়ভুক্ত হয়, যেমন কোন ব্যক্তি পরনারীকে একাধিকবার চুমু দেয় অথবা অপরাধের পর্যায় যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমন কোন অজ্ঞাত পরিচয় নারীকে ভুলবশত চুমু দেয় আর অপর কাউকে ইচ্ছা করেই চুমু দেয় তাহলে উভয় অপরাধে একই শাস্তি কার্যকর হবে এবং এই শাস্তির মধ্যে মিশ্রণ হবে। যেমনটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ব্যভিচার একাধিকবার করলেও শাস্তি একবারই হয়ে থাকে।

অনুরূপ গণঅধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যেসব শাস্তি অপরিহার্য হয় এগুলোর মধ্যে একই ব্যক্তিকে একাধিকবার গালি দিলে অথবা বহুজনকে যেমন পাড়া মহল্লা কিংবা গোষ্ঠীকে গালি দিলে শাস্তির প্রয়োগে মিশ্রণ হবে, যেমনটি

---

[১] আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা-২২৫।

[২] শরহে তাওয়ালিউল আনওয়ার, শরহিল মুনদী আলা দুররিল মুখতার, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৩৬। মাসাদিরুল হাক্কি ফিল ফিকহিল ইসলামী, ডক্টর আবদুর রাজ্জাক সানুরী, পৃষ্ঠা-৪৫।

www.pathagar.com

হক্কুল্লাহর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেননা এসব ক্ষেত্রে শাস্তি কার্যকর করার উদ্দেশ্য হলো অপরাধীদের সংশোধন করা এবং তাদেরকে অপরাধের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত রাখা। তাতে একাধিক অপরাধে একাধিকবার শাস্তি প্রয়োগ জরুরী নয়। বস্তুত হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে হোক বা হক্কুল ইবাদ লঙ্ঘনের অপরাধে শাস্তি নির্ধারিত হোক এ ধরনের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা নেই।[১]

(৩) হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য হলো, হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি অপরিহার্য হয় তা যে ব্যক্তির সামনে সংঘটিত হয় ইচ্ছা করলে সে ব্যক্তিই শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে। কেননা এই অপরাধ 'নাহি আনিল মুনকার' এর অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ স. নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমাদের কেউ যদি তোমাদের সামনে কোন গর্হিত কাজ হতে দেখো, তাহলে সাধ্য থাকলে হাত দিয়ে বাধা দাও, তা সম্ভব না হলে মুখের দ্বারা বাধা দিতে চেষ্টা করো, তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে গর্হিত কাজটিকে মনে মনে ঘৃণা করো, এটা ঈমানের দুর্বল পর্যায়।' অবশ্য অপরাধ কর্মটি যদি সম্পন্ন হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এই অপরাধের শাস্তি দ্রুত কার্যকর করার অধিকার শাসকবর্গের উপর বর্তাবে।

এর কারণ হলো, এই ধরনের অপরাধ যখন সংঘটিত হয় তখন সেটি 'নাহি আনিল মুনকারের' পর্যায়ে পড়ে এবং প্রত্যেক মানুষকেই 'নাহি আনিল মুনকারে' বাধা দেয়ার সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অপরাধ সংঘটিত হয়ে যাবার পর সেটির শাস্তি প্রয়োগ করাটা 'নাহিআনিল মুনকারের' পর্যায়ে পড়ে না। কেননা, যে অপরাধটি সংঘটিত হয়ে গেছে, সেটিকে এখন আর রোধ করা সম্ভব নয়। বস্তুত এখন অপরাধের শাস্তি কার্যকর করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। শাস্তি কার্যকর করার অধিকার সাধারণ মানুষের উপর বর্তায় না। তা একান্তই শাসকবর্গের উপর বর্তায় এবং এটা শাসকদেরই কর্তব্য ও দায়িত্ব। আমার মনে হয়, অপরাধ সংঘটিত হতে দেখে তাৎক্ষণিকভাবে সেটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা বা প্রতিরোধ করাটা অপরাধের সূচনাক্ষণমাত্র, সেটিকে তখনো অপরাধ বলা যায় না। সাধ্য মতো অপরাধ কর্ম থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। এই গণদায়িত্ব শুধু সেই সব অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো একান্তই হক্কুল্লাহর

---

[১] কাশাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭৩ এবং মাসাদিরুল হক্ক, ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক সানুরী, পৃষ্ঠা-৪৫।

www.pathagar.com

পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু যেসব অপরাধ গণঅধিকারের পর্যায়ভুক্ত সেই অপরাধের শাস্তি অকুস্থলেই কার্যকর করার অধিকার জনসাধারণের নেই। কেননা এ ধরনের অপরাধের শাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাবীর উপর নির্ভর করে। শাসক অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর কারো গণঅধিকার লঙ্ঘনের অপরাধের শাস্তি প্রয়োগের অধিকার নেই। অবশ্য বাদী এবং বিবাদী উভয়ে মিলে যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে সালিশ (Arbiter) নির্ধারণ করে তাহলে সেই ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

অবশ্য এক্ষেত্রে এ ধরনের একটি অভিমত রয়েছে যে, গণঅধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি অবধারিত সেই শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির, কিসাসের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে এক্ষেত্রে ঠিক তেমনটিই হবে। বস্তুত এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ এ ধরনের অপরাধে শাস্তি প্রয়োগের বিষয়টি প্রকৃত পক্ষে শাসকবর্গের দায়িত্ব। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা দেয়াটা হবে সীমালঙ্ঘনের নামান্তর। কেননা, তাযির এমন ধরনের শাস্তিকেই বলা হয়ে থাকে, হদ্দ বা কিসাসের মতো যার সীমা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয়। এটিকে কিসাসের সাথে তুলনা করাটাই হবে ভুল। কেননা কিসাস শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি। তাতে কারো পক্ষে হ্রাস বৃদ্ধি করার অধিকার নেই।[১] আমার মতে শেষোক্ত মতই যুক্তির নিরীখে উত্তীর্ণ এবং শরীয়তের চেতনার সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি যেমন ভারসাম্যপূর্ণ তেমনি অপরাধীর উপর জুলুমের অবকাশও থাকে না। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রয়োগের অধিকার দিলে সে অবশ্যই শাস্তি প্রয়োগে সীমালঙ্ঘন করবে। কারণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রই এক্ষেত্রে উত্তেজিত ও আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হবে। খুব কম লোকের পক্ষেই এক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্ভব।

(৪) হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরেকটি পার্থক্য হলো, গণঅধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি আবশ্যিক হয় তাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অধিকার তার অবর্তমানে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। পক্ষান্তরে অপরাধীর অপরাধ তার উত্তরাধিকারীদের দিকে সম্প্রসারিত হয় না। বিষয়টা আরো বিশদভাবে বললে এভাবে বলা যায়, কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি

---

[১] আল-ফূসূলুল খামসাতা আশারা ফিমা ইউজিবুত তাযির ওয়ামা লা ইউজিবু, আল আসতার ওয়াশনী, পৃষ্ঠা-৪-৫, রাদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৬/১৮৭ এবং তুলনা করার জন্যে দেখতে পারেন, মাসাদিরুল হাক্কি ফিল ফিকহিল ইসলামী, ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক আহমদ সানুরী, পৃষ্ঠা-৪৫।

www.pathagar.com

মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারীগণ শাস্তি প্রয়োগের দাবী করতে পারে কিন্তু অপরাধী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারীদের উপর শাস্তি প্রয়োগের দাবী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার উত্তরাধিকারীগণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে যে শাস্তি হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে নির্ধারিত হয় তা উত্তরাধিকারীদের দিকে সম্প্রসারিত হয় না। কারণ হক্কুল্লাহর কোন ওয়ারিস হয় না। এ কারণে হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধীর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীদের শাস্তি দেয়া যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণও শাস্তি প্রয়োগের দাবী করতে পারবে না। অপরাধীর মৃত্যুতে শাস্তি অকার্যকর হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তো পরিষ্কার। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি জীবিত থাকলেও শাস্তি প্রযুক্ত হবে না। কেননা হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি অবধারিত হয় সেটির কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাবীর উপর নির্ভরশীল নয়; তাই তার উত্তরাধিকারীদের শাস্তি প্রয়োগের দাবী করা এক্ষেত্রে অবান্তর।[১]

হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে প্রয়োগযোগ্য শাস্তি এবং হক্কুল ইবাদ লঙ্ঘনের অপরাধে প্রয়োগযোগ্য শাস্তির মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ফিকহের কিতাবসমূহে যা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো আমরা উপরে আলোচনা করেছি। এই দুধরনের অপরাধের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সর্বজন স্বীকৃত। কেননা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কোন কোন অপরাধ এমন যেগুলো ব্যক্তির চেয়ে সমাজকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার এগুলোর মধ্যে কিছু অপরাধ এমনও রয়েছে যেগুলো সমাজের চেয়ে ব্যক্তিকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমার দৃষ্টিতে এমন কোন অপরাধ নেই সমাজের স্বার্থের সাথে যার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। যার দ্বারা সমাজের মান মর্যাদায় কোন প্রভাব বিস্তার করে না, অথবা যার শাস্তি প্রয়োগের দ্বারা সমাজের কোন কল্যাণ হয় না। পক্ষান্তরে এমন নয় যে, অপরাধীকে বিনা বিচারে ছেড়ে দিলে সমাজের জন্যে উপকারী বিবেচিত হয়। যেমন কাউকে প্রহার করার দ্বারা শুধু ব্যক্তি অধিকারকেই খর্ব করা হয় না বরং সামাজিক অধিকারও খর্ব করা হয়। সমাজের প্রত্যেক সদস্য বা নাগরিকের কর্তব্য হলো, প্রত্যেকেই সর্বজনগ্রাহ্য একটা নীতি মেনে চলবে এবং অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকারের সীমানায় অবস্থান করবে। কেউ যদি কাউকে গালি দেয় কিংবা হুমকি ধমকি দেয় তাহলে সে সমাজের সেই অধিকারকে বিনষ্ট করে, যাকে বলা হয় হক্কুল্লাহ বা গণঅধিকার। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে

---

[১] মাসাদিরুল হাক্কি ফিল ফিকহিল ইসলামী, ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক সানুরী, পৃষ্ঠা-৪৫ ও এর পর।

www.pathagar.com

কোন ধরনের কষ্ট না দেয়াটাই হক্কুল্লাহ। এ ধরনের অপরাধীর শাস্তি হওয়াটা জরুরী যাতে অপরাধী নিজে থেকেই অপরাধ থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদের জন্যে এই শাস্তি হয় দৃষ্টান্ত আর সাধারণ মানুষ বোধ করতে পারে নিরাপত্তা। ফলে সমাজে হ্রাস পাবে অপরাধ প্রবণতা। যদি এ ধরনের অপরাধী কিংবা সীমালঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেয়া না হয় তাহলে এ ধরনের অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে যাবে আর অন্যেরা অপরাধ কর্মে আসকারা পাবে। এর ফলে গণমানুষের মধ্যে দেখা দেবে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা। বেআইনী কাজকে লোকজন স্বাভাবিক ঘটনা মনে করতে থাকবে। তাতে অপরাধ সমাজকে গ্রাস করে ফেলবে।

গালি-গালাজ হুমকি-ধমকি সম্পর্কে এর আগে যা বলা হয়েছে, তা এমন সব অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ কিংবা কারো অধিকারের উপর অনধিকার চর্চা করা হয়। এ কথা আমরা নাবালেগ অপরাধীর ক্ষেত্রেও বলতে পারি। দাবী করা যেতে পারে এই নাবালেগের কৃত অপরাধ অন্যের অধিকারের উপর নির্জলা হস্তক্ষেপ। কেননা নাবালেগ বালক-বালিকা শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত নয়, তাদের ওপর কোন হক্কুল্লাহ কার্যকর নয়। বস্তুত ছোট বালকও যদি অপরাধ করে তবে তা অবশ্যই সামাজিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপের পর্যায়ে পড়ে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্যে নাবালেগ শিশুদের অপরাধেরও উপযুক্ত শাস্তি দেয়া জরুরী, যাতে ভবিষ্যতে সে পেশাদার অপরাধীতে পরিণত না হয় এবং অন্য শিশুরাও অপরাধপ্রবণ শিশুকে দেখে অপরাধ কর্মে উৎসাহিত না হয়।

'গায়রে মুকাল্লাফ' (শরীয়তের দণ্ডাদেশ প্রয়োগের আওতামুক্ত) হওয়ার কারণে আমরা যদি শিশুদের অপরাধকে সম্পূর্ণ বিবেচনার বাইরে রাখি, তাহলে সেটি শুধু সেই অপরাধী শিশু ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যেই ক্ষতিকর হবে না, গোটা সমাজের জন্যেও ক্ষতির কারণ ঘটবে।

এমনটি কিভাবে ভাবা যায় যে, নাবালেগ শিশু ব্যভিচার, চুরি কিংবা ছিনতাই ডাকাতির মতো অপরাধ করলো অথচ তাকে সামাজিকভাবে অপরাধী বলেই গণ্য করা হবে না? এমনটি ভাবা হবে আইনের ভুল ব্যাখ্যা। পূর্ণবয়স্ক অপরাধীর অপরাধ যেমন আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ তেমনি নাবালেগ শিশুর অপরাধও আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। পার্থক্য শুধু এতটুকু, শিশু অপরাধীদের উপর সুনির্দিষ্ট শাস্তি যেমন হদ্দ, কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা এসব

www.pathagar.com

শাস্তি প্রয়োগের জন্যে পূর্ণবয়স্ক হওয়ার শর্ত রয়েছে। অবশ্য কোন শিশু যদি শরীয়তের সুনির্দিষ্ট শাস্তিসমূহের মতো কোন গুরুতর অপরাধ করে, অথবা সুনির্দিষ্ট তাযিরী অপরাধসমূহের মধ্যে কোন অপরাধ করে তাহলে তার অপরাধের মাত্রা ও উপযুক্ততা বিচার করে সংশোধনমূলক কোন শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ নেই। এ ব্যাপারটিতে কোন সংশয় সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নাবালেগদের যে সংশোধনমূলক শাস্তি দেয়া হয় তা তাযিরের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাযির প্রকৃতপক্ষে সংশোধন ব্যবস্থা। এই মূলনীতি যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে যারা বলেন, 'নাবালেগ শিশুদের শাস্তি শুধু ব্যক্তি অধিকার খর্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য' তাদের কথার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। বস্তুত আমার মত হলো, কোন অপরাধ এমন নেই নিরেট ব্যক্তি অধিকার বিনষ্টের জন্যে যেখানে তাযিরী শাস্তি ওয়াজিব হয়। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, অনেক অপরাধে সামাজিক অধিকারের চেয়ে ব্যক্তি অধিকার প্রাধান্য থাকে, সেসব ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগ হয় ব্যক্তি অধিকার হরণের জন্যে, সামাজিক অধিকার হরণের জন্যে নয়। এ কথা যদি মেনে নেয়া যায় তাহলে এর পরিণতি হবে এই যে, সমাজ কোন কোন অপরাধের শাস্তি প্রয়োগে অক্ষম হয়ে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে অপরাধীরা যে কোন ধরনের অপরাধ সংঘটনের মতো দুঃসাহস পাবে, সেই অপরাধে ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘিত হোক কিংবা সামাজিক অধিকার লঙ্ঘিত হোক তা অপরাধীরা বিচার করবে না। বস্তুত এটি সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতার কারণ হয়ে ওঠবে যা ইসলামী শরীয়তের মূল চেতনা ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণে ফকীহ আল-মাওয়ারদী তাঁর কিতাব 'আল-আহকামুস সুলতানিয়ায়' লিখেছেন, "ব্যক্তি অধিকার বিনষ্টের কারণে যদি কোন তাযিরী শাস্তি ওয়াজিব হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে দেয় যেমব গালি-গালাজ কিংবা মারপিটের মতো ঘটনায়, তারপরও শাসকের এই অধিকার রয়েছে অপরাধীর মেজাজ বুঝে তিনি শাস্তি প্রয়োগ করবেন কিংবা ক্ষমা করে দেবেন। কেননা এ ধরনের অপরাধে সর্বাবস্থায় শাসকের শাস্তি প্রয়োগের অধিকার থাকে। এ ব্যাপারটি তখন ঘটে যখন বিষয়টি আদালতে চলে যায় আর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধ ক্ষমা করে দেয়।' অপরাধ আদালতে গড়ানোর আগেই যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় তবে এ ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীর শাস্তি প্রয়োগের অধিকার রয়েছে কি-না এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সঠিক কথা হলো, এ পর্যায়েও শাসকের হস্তক্ষেপ ও শাস্তি প্রয়োগের অধিকার বহাল থাকবে। বাদীরা অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলেও শাসক

www.pathagar.com

প্রয়োজন মনে করলে অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারবে। কেননা শাসকদের হস্তক্ষেপ ব্যাপক কল্যাণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কোন একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়ার দ্বারা শাসকের অধিকার রহিত হয়ে যায় না।[১]

এ বক্তব্য যখন সাব্যস্ত হলো, অপরাধ যে ধরনেরই হোক না কেন, তার শাস্তি প্রয়োগের অধিকার সমাজের রয়েছে, তখন এই নীতির ভিত্তিতে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, অপরাধীদের পাকড়াও করা, তাদের শাস্তি দেয়া সর্বাবস্থায়ই একটি সামষ্টিক সামাজিক কর্তব্য। কেননা সমাজের মধ্যে যে অপরাধ সংঘটিত হয় তা অবশ্যই সমাজের মূলভিত্তিকে আঘাত করে এবং তাতে সমাজের অধিকার খর্ব হয়। উপরে বর্ণিত মূলনীতি থেকে এই বিধান বের হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ফরিয়াদের ওপর নির্ভরশীল নয় এবং অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়া, অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়া অথবা কোন আপস-মীমাংসা করার অধিকার সংরক্ষিত নয় বরং শাস্তি প্রয়োগ সেই প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছাধীন যে প্রতিষ্ঠান সমাজের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার দায়িত্ব বহন করে। বরঞ্চ নিরঙ্কুশ ক্ষমা নির্ভর করবে সমকালীন শাসকের ওপর। শাসক তখনই ক্ষমা করতে পারবেন যখন তার কাছে ক্ষমা করে দেয়াটা শাস্তি প্রয়োগের চেয়ে বেশি কল্যাণকর মনে হবে।[২]

অবশ্য মজলুম ব্যক্তি যদি জালেমকে ক্ষমা করে দেয়, 'তাহলে তার এই ক্ষমা আদালতের নির্ধারিত শাস্তিকে প্রভাবিত করবে', এই মূলনীতি এ ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। সেই সাথে উল্লেখিত মূলনীতি এ বিষয়টিতে বাধা সৃষ্টি করে না যে আইন প্রয়োগ কিংবা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কিছু অপরাধের শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মজলুমের অভিযোগকেই মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করবে এবং এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে বিচার কার্যক্রমের দাবি শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিই করতে পারবে।[৩]

---

১ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২৫-২২৬।

২. এই অধিকার যদি ব্যক্তিকেও দেয়া হয় তবুও আদালতের তত্ত্বাবধানে তা প্রয়োগ করতে হবে। আদালত যদি মনে করে ব্যক্তিকে দেয়া অধিকারের অপব্যবহার হচ্ছে, তাহলে আদালতের এই অধিকার থাকা উচিত, প্রয়োজন বোধ করলে কাযী ক্ষমা প্রত্যাহার করে শাস্তি দিতে পারেন। (অনুবাদক)

৩. মিসরে একটি আইন করা হয়েছে যে, আইনের দৃষ্টিতে কিছু কিছু অপরাধ এমন রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার কোন প্রতিনিধি যতক্ষণ পর্যন্ত পুলিশের কাছে অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখত বা মৌখিক অভিযোগ না করে

www.pathagar.com

গ্রন্থকার বলেন, আমার অভিমত হলো, তাযিরের ক্ষেত্রে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের মধ্যে যে পার্থক্য তাতে কোন বিশিষ্টতা নেই। আমার এ মতের পক্ষে যেসব জিনিস সমর্থন যুগিয়েছে সেগুলো হলো, আল্লাহর অধিকার ও ব্যক্তি অধিকারের পার্থক্যের কারণে গুরুত্বপূর্ণ যেসব সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে এগুলোতে উলামা ও ফকীহগণের মধ্যে ব্যাপক মতভিন্নতা রয়েছে। মতভিন্নতার কারণে এই পার্থক্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

আগে আমি একথা পরিষ্কারভাবে বলেছি, যে কোন অপরাধেই অপরাধীকে প্রশাসন শাস্তি দিতে পারে। অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকারের প্রভাব যতো বেশিই হোক না কেন সে যদি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয় তবুও প্রশাসনের শাস্তি প্রয়োগে এই ক্ষমা কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে না। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমা, মীমাংসা, সন্ধি কিংবা নিরপরাধ ঘোষণা কোনটাই প্রশাসনের শাস্তি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। অধিকাংশ ফকীহেরও এদিকেই ঝোঁক যে, ব্যক্তি অধিকার হরণের কারণে যে শাস্তি ওয়াজিব হয় তা প্রয়োগের অধিকার প্রশাসনের রয়েছে। হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে যেমন

ততক্ষণ পর্যন্ত মামলা চালু করা যায় না। এমন অভিযোগকেও আমলে নেয়া হয় না অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর যদি তিন মাসের মধ্যে অভিযোগ দায়ের না করা হয়। যেসব অপরাধ এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে সেগুলো হলো, মিথ্যা অপবাদ, গালি-গালাজ, ভিত্তিহীন বদনাম, স্বামী-স্ত্রীর কারো ব্যভিচার, কোন নারীর প্রতি অশ্লীল আচরণ (প্রকাশ্য না হলেও) কোন শিশুর লালন-পালন ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কে আদালতের দেয়া ফয়সালার পরও সেই ব্যক্তির কাছে শিশুকে হস্তান্তর না করা। পিতা বা মাতার কেউ আদালত নির্ধারিত অভিভাবকের কাছ থেকে শিশুকে নিয়ে যাওয়া (যদি সেটি বল প্রয়োগ কিংবা প্রতারণার মাধ্যমে নাও হয়ে থাকে) যার বিরুদ্ধে স্ত্রীর খোরপোষ দেয়া, অথবা অভিভাবকত্বের অনুমোদন, অথবা শিশু লালন-পালনের ব্যয় পাওয়ার অধিকার অথবা পালনকারীর ব্যয় প্রাপ্তির, অথবা কোন ঘর ভাড়ার ডিক্রি থাকে এবং সেই ডিক্রির কপি তার হাতে বর্তমান থাকার পরও যদি তিন মাসের মধ্যে প্রাপ্য টাকা পরিশোধ না করে। আমি মনে করি, উল্লেখিত অপরাধগুলোর অধিকাংশই যেগুলো ব্যক্তি অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যেগুলোর মধ্যে সামাজিক অধিকারের চেয়ে ব্যক্তি অধিকার প্রাধান্য বিস্তার করে, সম্ভবত এসব কারণেই মিসরের আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কিংবা তার কোন প্রতিনিধির লিখিত বা মৌখিক অভিযোগের উপর নির্ভরশীল করেছে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ফকীহগণ এটার ব্যাখ্যা করেন যে, যে সব শাস্তি ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের কারণে ওয়াজিব হয় সেগুলোর কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, অর্থাৎ এর বিচারের জন্য বিচার প্রার্থীর পক্ষ থেকে দাবী করতে হবে।

www.pathagar.com

শাস্তি প্রয়োগের অধিকার প্রশাসনের আছে। কোন কোন ফকীহ এ কথাও বলেছেন যে, ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যে তাযিরী শাস্তি ওয়াজিব হয় এর মধ্যেও একত্রীকরণ (AMALGAMATION) হতে পারে। হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হওয়া তাযিরের মধ্যেও শাস্তি একত্রীকরণের অবকাশ আছে।

ব্যক্তি অধিকার হরণের অপরাধে যে শাস্তি সাব্যস্ত হয় তাতে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা কার্যকর কিন্তু হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে শাস্তি দানের দাবী উত্তরাধিকারদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় না। বস্তুত এর মূল কথা হলো, অপরাধী যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে উভয় ধরনের অপরাধের দায়-দায়িত্ব উত্তরাধিকারের কাঁধে বর্তায় না। কেননা শাস্তি তো সেই ব্যক্তিকে দেয়া হয় যে অপরাধী। উভয় প্রকারই তাযিরী শাস্তির আওতায় পড়ে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তাহলে শাস্তি দানের দাবীর অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। এ ক্ষেত্রেই শুধু একটু পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে না। কেননা উভয় ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা প্রশাসনের। কেননা মজলুমের উত্তরাধিকারীগণ যদি অপরাধীকে ক্ষমাও করে দেয় তবুও প্রশাসনের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা রহিত হয়ে যায় না। প্রশাসন প্রয়োজন বোধ করলে শাস্তি দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, অধিকার স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনা শুধু সম্পদের ক্ষেত্রে ঘটে। (rights whose value can be expressed in money) আর আর্থিক অধিকারের সাথে সবচেয়ে বেশি কযফের সামঞ্জস্য রয়েছে। হানাফীদের মতে, 'হদ্দে কযফে'র অধিকার উত্তরাধিকারদের প্রতি স্থানান্তরিত হওয়া নাজায়েয। যারা হদ্দে কযফ স্থানান্তরযোগ্য মনে করেন, তাদের মতেও শুধু সে ক্ষেত্রে হদ্দে কযফের অধিকার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে যখন মিথ্যা অপরাধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্য কথায় বলা যায়, যদি তারাও এই অপরাধে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে তারা অপরাধীর শাস্তি দাবী করতে পারবে।

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, হদ্দে কযফে এ শাস্তির অধিকার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় কিন্তু এটা কোন একক উত্তরাধিকারীর মধ্যে হয় না, অল্প বিস্তর সকল উত্তরাধিকারীর মধ্য এটি সমভাবে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু পরিত্যক্ত সম্পদের মতো এটি বণ্টিত হয় না। বস্তুত হদ্দে কযফের ক্ষয়ক্ষতি

www.pathagar.com

ও অন্যান্য তাযিরযোগ্য অপরাধের ক্ষতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। এর একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করা যাবে না।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা এই উপসংহারে পৌঁছাতে পারি, তাযির হক্কুল্লাহ্ লঙ্ঘনের অপরাধে হোক আর ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে হোক উভয় অবস্থায় সেটি সাধারণ ফৌজদারী আইনের পর্যায়ভুক্ত। ফৌজদারী আইনে এগুলো হদ্দ-এর চেয়ে ভিন্ন নয়। কেননা উভয় প্রকার তাযির অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় একই। সামান্য তারতম্যের কারণে এগুলোকে বিশেষভাবে আলাদা করা অর্থহীন।[১]

হদ্দ কিসাস ও তাযিরের মধ্যে পার্থক্যের বিভিন্ন দিক

হদ্দ ও কিসাসের এবং হদ্দ ও তাযিরের বিধানের মধ্যে কয়েক পর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে, তন্মধ্যে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) ইসলামী শরীয়তে হদ্দ ও কিসাসের অপরাধীর ক্ষেত্রে বিচারককে এই স্বাধীনতা দেয়া হয়নি যে বিচারক তাঁর বিবেচনা মতো শাস্তি নির্ধারণ করবেন অথবা শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। শরীয়ত এসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং এগুলোর সীমারেখা একই। যার ফলে এগুলোকে হদ্দ বলা হয়। অবশ্য হদ্দ পর্যায়ভুক্ত কিছু অপরাধ এমন রয়েছে যেগুলোর সীমারেখা দু'ধরনের হতে পারে, যেমন কোড়া মারার শাস্তি। এ ক্ষেত্রে

---

[১] এ ক্ষেত্রে এ দিকটি মনে রাখতে হবে, কোন বিচারক যদি কোন ব্যাপারে ইজতিহাদ করতে অপারগ হন, তবে তিনি সেই মামলাটি আরো উচ্চতর আদালতে স্থানান্তরিত করতে পারেন। ফকীহগণের ইজমা (Concensus) হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের আইন পরিষদের অধিকার রয়েছে, তারা তাযিরী অপরাধের জন্য বিস্তারিত বিধান চিহ্নিত করে বিচারকদের ব্যাপক স্বাধীনতাকে আইনের মাধ্যমে সীমিত করতে পারে। ইসলামী শাসনের শুরুর দিকে খলীফার মজলিসে শূরার এই ক্ষমতা ছিল। পরবর্তীতে এই আইন বিচারকদের কার্যবিধি প্রণয়নের (JUDG EMADE LAW) মাধ্যমে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। যার মধ্যে বিচারকদের অবশ্যই এমন মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার অধিকারী হতে হতো যাদের উদ্ভাবনী বা ইজতিহাদী সক্ষমতা সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বীকৃত ছিলো। এ দিক থেকে সেইসব ব্যক্তি বর্তমান সময়ের আইন প্রণয়নকারী সদস্যদের তুলনায় বিশেষ করে আইনের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলেন। যার ফলে তাদের ক্ষমতার ব্যবহারকে কোন অবস্থাতেই স্বৈরতান্ত্রিক কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার বলে চিহ্নিত করার সুযোগ নেই। বর্তমানে যেমন কোন আইন পরিষদ কিংবা সংসদে তৈরি আইনকে স্বৈরতান্ত্রিক আইন বলা হয় না। (অনুবাদক)

www.pathagar.com

বিচারকের কাছে যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, অপরাধী প্রকৃতপক্ষেই অপরাধ সংঘটন করেছে তাহলে বিচারককে অবশ্যই শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি দিতে হবে। এক্ষেত্রে শাস্তির মধ্যে কোন ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি করার অধিকার বিচারকের নেই। অথবা শাস্তি মওকুফ করার অধিকারও বিচারকের থাকবে না। এ ধরনের অপরাধে অপরাধীর অবস্থা বা পারিপার্শ্বিকতা নির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্রে কোনই প্রভাব ফেলবে না। যেমন চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস্তবিকই চুরি কর্মে জড়িত ছিল, এই প্রমাণ সাক্ষীর দ্বারা হোক কিংবা স্বীকারোক্তির দ্বারা হোক, তাহলে বিচারকের কর্তব্য চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেয়া। অপরাধ যদি তার সকল শর্তাবলী ও আরকানসহ প্রমাণিত হয়, তাহলে অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থা যাই থাকুক, হাত কাটার শাস্তিই কার্যকর হবে। জেনে বুঝে হত্যার অভিযোগ যদি অকাট্য প্রমাণসহ বিচারকের কাছে প্রমাণিত হয়, তাহলে বিচারকের কর্তব্য অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া।

কিসাস ও হদ্দের মধ্যে পার্থক্য হলো, কিসাসের ক্ষেত্রে যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা রক্ত সম্পর্কের অভিভাবক শাস্তি ক্ষমা করে দেয় তাহলে বিচারকের কর্তব্য হলো কিসাসের নির্দেশ ঘোষণা না করা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিচারকের এই অধিকার রয়েছে, তিনি প্রয়োজনবোধ করলে অপরাধীকে এক বা একাধিক তাযিরী শাস্তি দিতে পারেন। এ পার্থক্যের মূল কারণ হলো, হদ্দ আল্লাহর হক লঙ্ঘনের অপরাধে কার্যকর হয় এবং কিসাস মানুষের অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে সাব্যস্ত হয়। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের অধিকার রয়েছে তারা ইচ্ছা করলে শাস্তি কার্যকর করার দাবী করতে পারে। পক্ষান্তরে অপরাধীকে ক্ষমা করে দিয়ে শাস্তির দাবী প্রত্যাহারও করতে পারে।

তাযিরাতের পর্যায় হদ্দ ও কিসাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামী শরীয়ত পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে কি কাজ অপরাধ (CRIMES)। সেই সাথে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তিও দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে। ব্যাপক তদন্ত ও অনুসন্ধানে বিচারকের কাছে যদি কোন অপরাধ তাযিরী শাস্তি বলে প্রমাণিত হয়, আর এই তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণ যদি সঠিক বলে বিচারক মনে করেন, তাহলে অপরাধ ও অপরাধীর পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচারক তাযিরী শাস্তিসমূহ থেকে যে কোন একটি কিংবা একাধিক শাস্তির সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বিচারককে ব্যাপক স্বাধীনতা ও অধিকার দেয়া হয়েছে। বিচারকের এই স্বাধীনতাও রয়েছে যে, শাস্তি ঘোষণার সময় তিনি অপরাধীর মনোভাব, তার প্রতিক্রিয়া, তার ব্যক্তিত্ব ও তার পূর্বাপর কর্মকাণ্ড এবং শাস্তির

www.pathagar.com

পর অপরাধীর সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করবেন। সেই সাথে বিচারককে এই অধিকারও দেয়া হয়েছে, শাস্তি ঘোষণার সময় তিনি অপরাধের পর্যায় এবং সমাজে এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াও বিবেচনা করবেন। এক্ষেত্রে বিচারক যে কোন একটি তাযিরী শাস্তিও দিতে পারেন আবার কয়েকটি শাস্তিও একসাথে দিতে পারেন। বিচারকের এই স্বাধীনতাও রয়েছে যে, শাস্তির সবচেয়ে নিম্ন পর্যায় ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের মাঝামাঝি কোন শাস্তি ঘোষণা করবেন, যা অপরাধী ও অপরাধের মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই সাথে বিচারক এই অধিকারও রাখেন, তিনি শাস্তি কার্যকর করার নির্দেশ দিতে পারেন কিংবা শাস্তি মওকুফ রাখার নির্দেশও দিতে পারেন।

স্বাভাবিকভাবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে, বিচারককে যেসব স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এগুলো তাকে স্বৈরাচারে পরিণত করবে। কারণ তার স্বাধীনতা ও অধিকারগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী বিধি নেই। সেই সাথে অভিযুক্তদের অধিকার রক্ষার কোন বিধানও এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এর ফলে এই আশঙ্কা রয়েছে বিচারক স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগের বশীভূত হয়ে কোন অবিচার না করলেও তার অনিচ্ছা কিংবা ভুলে অভিযুক্তের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন। বরং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যে এই পদ্ধতিই বেশি উপযোগী। এই পদ্ধতিতেই সব ধরনের অপরাধে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা সম্ভব। ইসলামী শরীয়ত প্রকৃত অপরাধগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যদিও এই নির্দিষ্টকরণ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কিন্তু অপরাধ নির্ণয়ের জন্যে এমন পদ্ধতি রয়েছে যা দ্বারা যে কোন অপরাধের শাস্তি বিধানে ত্রুটিমুক্ত থাকা সম্ভব। ইসলামী আইনে তাযিরী অপরাধগুলোর শাস্তি ও ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। শরীয়ত যেসব কর্মকাণ্ডকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে বিচারক তদন্ত ও শুনানি অনুষ্ঠানের পর সেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত তাযিরী শাস্তিসমূহ থেকে অপরাধের উপযোগী কোন শাস্তি নির্ধারণ করবেন। বস্তুত শরীয়ত কোন ব্যক্তিকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করার জন্যে কিছু শর্তারোপ করেছে, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে এগুলো বিবেচনা করতে হবে। বিচারক নিয়োগের শর্তগুলোর অন্যতম একটি হলো, বিচারকের ইজতিহাদ করার যোগ্যতা থাকতে হবে অর্থাৎ বিচারক ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় আহকাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ইলম ও অভিজ্ঞতা এবং উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতিতে শরীয়তের বিধান মতো ফয়সালা নির্ধারণের উপযুক্ত মেধা ও প্রজ্ঞার অধিকারী হবেন।

www.pathagar.com

সারকথা হলো, হুদুদ ও কিসাসের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শাস্তির জন্যে একটি অপরিবর্তনীয় সীমা রয়েছে, অপরাধীর অবস্থা যে ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু তাযিরী শাস্তির ক্ষেত্রে যে সীমারেখা দেয়া হয়েছে তা পরিবর্তনযোগ্য ও নমনীয়। এক্ষেত্রে অপরাধী ও অপরাধ উভয়টির মাত্রা অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতি শাস্তির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। ফয়সালার সময় এসব ব্যাপারকে বিবেচনায় রাখতে হয়।[১]

(২) হদ্দ অবশ্য প্রয়োগযোগ্য ওয়াজিব। কোন অবস্থাতেই এক্ষেত্রে ক্ষমা করা, মওকুফ করা, সুপারিশ কিংবা নিরপরাধ ঘোষণা করার অবকাশ নেই। কিসাসও অনুরূপ। কিসাসের ক্ষেত্রে সমকালীন শাসক, প্রশাসক কিংবা বিচারকের ক্ষমা, সুপারিশ, শাস্তি মওকুফ কিংবা নিরপরাধ ঘোষণা করার অধিকার নেই। কিন্তু তাযির এ দু'টির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তাযির যদি হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের কারণে ওয়াজিব হয় তাহলে আইনের চাহিদা হলো তাযির বাস্তবায়ন জরুরী। কিন্তু বিশেষ কল্যাণের স্বার্থে অথবা অপরাধীর যদি শাস্তি ছাড়া সংশোধনের সুযোগ থাকে তাহলে সমকালীন শাসকের অধিকার রয়েছে এই শাস্তি মওকুফ করার কিংবা অপরাধীকে ক্ষমা করার। সেই সাথে বিচারকের কাছে শাসক অপরাধীর পক্ষে সুপারিশও করতে পারেন।

আর যদি তাযির ব্যক্তি অধিকার বিনষ্টের অপরাধে ওয়াজিব হয় তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার থাকে। সেই সাথে অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করার বিনিময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোন কিছু গ্রহণও করতে পারে। ব্যক্তি অধিকার বিনষ্টের শাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাবীর ওপর নির্ভরশীল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি শাস্তি প্রয়োগের দাবী করে সেক্ষেত্রে শাসক না ক্ষমা করতে পারেন, না ক্ষমার সুপারিশ কিংবা শাস্তি মওকুফের নির্দেশ দিতে পারেন।[২]

---

১. সুবুলুস সালাম, শরহে বুলুগুল মারাম, মাতবায়ে ইসতিকামাত, কায়রো, ছাপা ১৩৫৭ হিঃ খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-৫৪; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, অর্থাৎ রদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা. ১৮৩; সুবুলুস সালামের শব্দগুলো এমন– 'যাদেরকে তাযিরের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, অপরাধের ধরন ও অপরাধীর অবস্থা বিবেচনায় রেখে উপযোগী ফয়সালা দেয়ার জন্যে ইজতিহাদ করা তাদের জন্যে খুবই জরুরী।

২ সুবুলুস সালাম, শরহে বুলুগুল মারাম, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৪, হাশিয়া আবিল খালাস আলা হামশ। দুরারুল হুক্কাম, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৯৪-৯৫, মাতবায়ে ওয়াহাবিয়া, মিসর : ১৯২৪ খৃ.। হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৩, ওয়াকিয়াতুল মুফতিয়্যিন, পৃষ্ঠা-৬০,

www.pathagar.com

এ পার্থক্য ও ব্যবধানের মূলনীতি হলো, হুদুদ শুধুমাত্র আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয় আর কিসাস ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয়। কিন্তু তাযির দু'প্রকার। একটি হক্কুল্লাহ অপরটি হক্কুল ইবাদ।

(৩) জমহুর ফুকাহার মত হলো, হদ্দ ও কিসাসের অপরাধ সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হবে নয়তো অপরাধীর স্বীকারোক্তির দ্বারা। সাক্ষী ও স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো অবশ্যই সাক্ষী ও স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে থাকতে হবে। এ সব অপরাধের বেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা বাদীর কোন সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না। বাদীর কোন শোনা কথায় সাক্ষ্য দেয়া (HEARSAY EVIDENCE) যেমন গ্রহণযোগ্য হবে না তেমনি তার হলফ ও নারীর সাক্ষ্যের উপরও ফয়সালা দেয়া যাবে না। সাক্ষ্যের ব্যাপারেও হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যার অবকাশ ও পার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।[১]

৪. ইমাম শাফেয়ী র.-এর মতে হদ্দ ও তাযিরের মধ্যে এটিও একটি পার্থক্য যে, হদ্দ বাস্তবায়নের সময় দুর্ঘটনাজনিত কারণে যদি নির্দিষ্ট শাস্তির চেয়ে বেশি কোন ক্ষতি হয়ে যায় তবে এটির জন্য কোন শাস্তি হয় না। কিন্তু তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের সময় যদি কোন অপরাধী ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা আসল শাস্তির চেয়ে বেশি বলে গণ্য হয় তবে সেটির জন্য (DAMAGES) জরিমানা দেয়া ওয়াজিব। এ মতের পক্ষে ইমাম শাফেয়ী র. হযরত উমর রা. এর কাজকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। একবার কোন একটি মোকাদ্দমায় একজন মহিলাকে হযরত উমর রা. ধমক দেন। এতে আতঙ্কিত হয়ে মহিলা তার পেট সংকুচিত করে এবং এভাবে তার গর্ভপাত হয়। এ ঘটনায় হযরত উমর হযরত আলীর সাথে পরামর্শ করে গর্ভপাতের দিয়াত আদায় করেন। অবশ্য এখানে মতবিরোধ রয়েছে, এ ধরনের দুর্ঘটনার দিয়াত কে আদায় করবে? কোন কোন ফকীহ বলেছেন, যে শাসকের হুকুমে এ ক্ষতি হয়েছে তার আকিলারা[২] এই দিয়াত আদায় করবে। কোন কোন ফকীহ বলেন, দিয়াত আদায়ের ভার বহন করবে সরকারী ট্রেজারী তথা বায়তুল মাল।[৩]

মাতবায়ে আমীরিয়া (মিসর) ১৩০০ হিঃ। ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৭। দ্বিতীয় সংস্করণ, মাতবায়ে আমীরিয়া, বোলাক, মিসর, ১৩১০ হিঃ।

১ আলমগীরী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৭।

২ ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'আকীলা' শব্দের দ্বারা ঐসব লোককে বোঝায়, যারা দিয়াত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত অপরাধীর সাথে অংশগ্রহণ করে। (অনুবাদক)

৩ আলমগীরী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৭।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা র. ইমাম মালিক র. ও ইমাম আহমদ র. বলেন, শাসক যার উপর হদ্দ অথবা তাযির কার্যকর করবেন তার যদি মৃত্যু ঘটে তবে এই মৃত্যুর দায় কারো উপর বর্তাবে না। কেননা হদ্দ ও তাযির উভয় ক্ষেত্রে সমকালীন শাসক আইনের বিধান প্রয়োগের জন্য আদিষ্ট। বস্তুত আদিষ্ট কোন ব্যক্তির উপর এ দায় চাপানো যায় না যে, নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে অজান্তে কিংবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হাতে কোন ক্ষতি হবে না।

লেখক বলেন, আমার মতে এই মতটিই গ্রহণযোগ্য। অন্য মত যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে দেশের শাসক ও দায়িত্বশীলদের জন্যে অপরাধের মোকাবেলা করা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করা এবং অস্থিতিশীলতা রোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে। প্রশাসন অপরাধীদের কাছে অসহায় ও অকার্যকর হয়ে যাবে।[১]

৫. হদ্দ ও তাযিরের মধ্যে পার্থক্য এও রয়েছে যে, নাবালেগের ওপর হদ্দ ওয়াজিব হয় না। কারণ হদ্দ প্রয়োগের জন্যে অপরাধীর বালেগ হওয়া শর্ত। কিসাসের ক্ষেত্রেও একই শর্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে তাযিরী শাস্তি নাবালেগের উপরও প্রয়োগ হয়। কেননা তাযিরী শাস্তির উদ্দেশ্য হলো সংশোধন। বস্তুত শিশু ও বালক বালিকাদেরকে সংশোধনমূলক শাস্তি দেয়া জায়েয।[২] অবশ্য কোন কোন ফকীহ এ মতও ব্যক্ত করেছেন, তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরাধীর বালেগ হওয়া শর্ত।[৩]

---

১ বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২৬, হাশিয়া ইবনে আবেদীন অর্থাৎ রদদুল মুহতার আ'লা দুররিল মুখতার, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৫ এবং এরপর। শরহে তানবীরুল আবসার, পৃষ্ঠা-১৯৫, আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়া'লা, পৃষ্ঠা-২৬৫। তাতে লেখা হয়েছে, 'তাযির বাস্তবায়নের সময় যদি ঘটনাক্রমে কোন ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে জরিমানা ওয়াজিব হবে না।'

২ হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৩।

৩ আল-ফুসূলুল খামসাতা আশারা ফিত তাযির, আল আসতার ওয়াশনী, পৃষ্ঠা-২।

www.pathagar.com

শাস্তির ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানগর্ভ কর্মনীতি

কিছু নির্দিষ্ট অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়ার কৌশল

দৃশ্যত মনে হয় ইসলামী শরীয়ত যেসব অপরাধের বিশেষ শাস্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন হ্রাস বৃদ্ধি করার অনুমতি দেয়নি। এগুলো এমন অপরাধ যেগুলোর ভয়াবহতা সম্পর্কে জাতি, ধর্ম ও অঞ্চল ভেদে কোন মানুষের মধ্যেই দ্বিমত নেই। কোন সমাজেই মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারে না যদি তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা সম্পূর্ণ নির্মূল না হলেও অন্তত নিয়ন্ত্রণে না থাকে। ইসলামী শরীয়ত যে সব অপরাধে হদ্দ সাব্যস্ত করেছে বস্তুত এসব মারাত্মক অপরাধ থেকে সমাজকে মুক্ত করা অত্যন্ত জরুরী, যাতে সমাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে। এসব অপরাধ সমাজের মূল ভিত্তিকে ধসিয়ে দেয়। এসব অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সমাজের মূল ভিত্তিগুলো সংরক্ষণের জন্যে জরুরী। এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমাজের স্থিতি ও শান্তি এবং সমাজের মান-সম্মানও এগুলোর নিয়ন্ত্রণের উপরই নির্ভর করে।

নির্দিষ্ট শাস্তিমূলক অপরাধ বিভিন্ন ধরনের। কিছু কিছু অপরাধ এমন যেগুলো মানুষের জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করে। যেমন ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড। আর কিছু অপরাধ এমন রয়েছে যেগুলো মান-সম্মানের ওপর আঘাত হানে, যেমন ব্যভিচার ও অপবাদ। কিছু অপরাধ এমন যেগুলো অপর মানুষের সহায় সম্পদে হস্তক্ষেপ করে, যেমন চুরি ও ডাকাতি। আর কিছু অপরাধ মানুষের মেধা ও জ্ঞানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে যেমন মদ্যপান। কিছু এমন অপরাধও রয়েছে যেগুলো রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, যা প্রশাসনিক স্থিতি ও আইন-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। যেমন বিদ্রোহ, আইন অমান্য। আর কিছু অপরাধ এমনও আছে যা ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেমন ধর্মদ্রোহিতা ইরতিদাদ বা মুরতাদ হয়ে যাওয়া।[১]

---

[১] দীনের বিরুদ্ধাচরণ তথা মুরতাদ হওয়া আর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ইসলামী আইনে একই পর্যায়ভুক্ত। ইসলামে দীন ও রাজনীতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কোন ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও আনুগত্য গ্রহণের পর যদি আনুগত্য পরিপন্থী কাজ করে অথবা ইসলাম প্রত্যাখান করে উভয় অবস্থাতেই তাকে বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়।-(অনুবাদক)

www.pathagar.com

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ইসলামী শরীয়ত মানুষের জীবন ও সমাজ গঠনের মৌলিক কোষ হিসাবে বিবেচিত। মানুষের পারিবারিক ব্যক্তিগত সম্পদের নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও আইন-শৃঙ্খলা যার ওপর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ইসলামী আইন এর ওপর সবচেয়ে গুরুত্বারোপ করেছে। এ কারণেই ইসলামী শরীয়ত এই মৌলিক বিষয় ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষতি করতে পারে এমন অপরাধগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়েছে। এগুলোর ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছে এবং এগুলোর শাস্তির ক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যাতে এসব অপরাধকে মূল শিকড়সহ উপড়ে ফেলা যায়। এসব অপরাধের শাস্তি প্রদানের সময় ইসলামী আইন অপরাধীর ব্যক্তিগত অবস্থা ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে না। যাতে এসব অপরাধ নির্মূলের কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদিত হতে পারে এবং সাধারণ মানুষ এসব অপরাধ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়।

সাধারণ অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট না করার কারণ

ইসলামী শরীয়ত কিছু সংখ্যক গুরুতর অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করে দিয়ে অপরাপর অপরাধের শাস্তি অনির্দিষ্ট রেখেছে। এটা এমন এক দূরদর্শী ব্যবস্থা যার ফলে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা স্থান কাল ও পাত্রভেদে সকলের জন্যে সকল সময়ে সমানভাবে কার্যকর এবং প্রত্যেক যুগের মানুষের জন্যে সেই যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সমকালীন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণের এসব আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কার তথা কঠোর নমনীয় কিংবা হ্রাস বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রয়েছে। যদি প্রথম যুগেই শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো তাহলে পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হয়তো তা যথার্থ বিবেচিত হতো না। সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধ ছাড়া অন্যান্য অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করে না দেয়ার মধ্যে জনগণের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যাতে সবযুগের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ সময় উপযোগী আইন সংস্কার করে নিতে পারেন। এ প্রক্রিয়ায় ইসলামী শরীয়ত যুগোপযোগিতার সাথে সাথে সব ধরনের যুগ চাহিদার প্রয়োজন পূরণ করে আপন মহিমায় জীবন্ত রয়েছে।

কিসাসকে ব্যক্তি অধিকারভুক্ত করার কারণ

প্রশ্ন হতে পারে ইসলামী শরীয়ত কিসাসকে ব্যক্তি অধিকারভুক্ত করেছে কেন? আর ব্যক্তিকে কেন এই অধিকার দিয়েছে যে, ইচ্ছা করলে মানুষ কিসাস ক্ষমা করে দিতে পারে? এর কারণ হলো, স্বেচ্ছায় হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য যেসব অপরাধে কিসাস ওয়াজিব হয় সেগুলো দুই ধরনের সীমালঙ্ঘনের কারণে ঘটে

www.pathagar.com

থাকে। প্রথমত সীমালঙ্ঘন সেই ব্যক্তির উপর করা হয় যাকে হত্যা করা হয় অথবা যার কোন অঙ্গহানি করা হয়। দ্বিতীয়ত সীমালঙ্ঘন করা হয় সমাজ ব্যবস্থার ওপর যে ব্যবস্থার ওপর সমাজের শান্তি নিরাপত্তা নির্ভরশীল এবং সমাজের মানুষের জীবন ও সম্পদ যাতে নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকে, যাতে মানুষ একে অন্যের উপর হস্তক্ষেপ করতে না পারে। এই প্রকারের সীমালঙ্ঘনের মধ্যে সামাজিক অপরাধের চেয়ে ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ বেশি ক্ষতিকর। কারণ কারো নিহত হওয়া কিংবা অঙ্গহানির শিকার হওয়ার মতো ঘটনাগুলো ঘটে থাকে সাধারণত দু'পক্ষের মধ্যে কোন শত্রুতা অথবা ঝগড়া ফাসাদের কারণে। এই কারণটা সীমিত, ব্যাপক নয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিই হয় লক্ষ্য, সমাজের ক্ষতি এক্ষেত্রে অপরাধীর লক্ষ্য হয় না। প্রতিপক্ষের ওপর যদি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি সুযোগ পায় তখন তার ক্ষতি করে, সুযোগ না পেলে সমাজের অন্য কারো উপরে আঘাত হানে না। ফলে এ ধরনের অপরাধে ক্ষয়ক্ষতিটা একান্তই আক্রান্ত ব্যক্তিরই হয়ে থাকে।

হদ্দ ও কিসাসের অপরাধের মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য

কোন অপরাধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় হদ্দ ও কিসাসের হত্যাকাণ্ড থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন ডাকাতির সময় যে হত্যাকাণ্ড ঘটে। কারণ ডাকাতির মধ্যে অপরাধীর মূল লক্ষ্য থাকে ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করা। ফলে ডাকাতি ও দস্যুতার ক্ষয়ক্ষতি হয় ব্যাপক। কেননা ডাকাতির সম্পর্ক থাকে ধন-সম্পদের সাথে, আর ধন-সম্পদ সঙ্গতি অনুযায়ী কমবেশি প্রত্যেক মানুষের কাছেই থাকে। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে খুন করা ডাকাতের উদ্দেশ্য থাকে না, তাদের টার্গেট হয় যাদের কাছে সম্পদ থাকে। ফলে তাদেরকেই ডাকাত ও দস্যুরা হত্যা করে যাদেরকে তারা সম্পদ ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে বাধা মনে করে।

চুরির ব্যাপারটিও অনুরূপ। চোরের লক্ষ্য থাকে সম্পদ চুরি করা। একজনের কাছে সম্পদ না পেলে সে অন্যের সম্পদে হাত বাড়ায়।

চোর যখন চুরি করে তখন সে যার সম্পদ চুরি করে সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু চোরাইকৃত জিনিসের মধ্যে চুরির ক্ষয়ক্ষতি সীমাবদ্ধ থাকে না। সম্পদশালী ব্যক্তির অন্যান্য সম্পদও চুরি হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। কোন একটা চুরির ঘটনা ঘটলে অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যেও চুরির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ দৃষ্টিতে চুরি একটা ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

অনুরূপ ব্যভিচারও একটি ব্যাপক ক্ষতিকর অপরাধ। কোন ব্যভিচারীর যদি নির্দিষ্ট নারীর সাথেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্য থাকে তবে অনেকের মধ্যে এই আশঙ্কাও দেখা দেয় যে, সে যদি নির্দিষ্ট নারীকে ভোগ করতে না পারে তবে অন্যের উপরও আঘাত হানতে পারে। এ কারণে কোন ব্যভিচারের দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ব্যভিচার অপরাধটি সহজাতভাবে ব্যাপক ভিত্তিক ক্ষতি করে। কারণ অন্য যে কোন ব্যক্তিও এই অপরাধের শিকার হতে পারে।

ওপরের আলোচনা থেকে হদ্দ ও কিসাসের অপরাধের মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। হদ্দযোগ্য অপরাধের শিকার যদিও ব্যক্তিগতভাবে হয়ে থাকে এবং ক্ষয়ক্ষতিটাও ব্যক্তির উপরই বর্তায় কিন্তু এর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা গোটা সমাজে বিস্তার লাভ করে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরিস্থিতি বিচারে সমাজ এর চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য শরীয়ত হদ্দের শাস্তি প্রদানের অধিকার সমাজকে দিয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি সত্তাকে যুক্ত করেনি। এর বিপরীতে কিসাস সমাজের চেয়ে ব্যক্তি সত্তাকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। এজন্য ইসলামী আইন কিসাসকে সেই ব্যক্তির অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষমা, সমঝোতা, মৈত্রী ব্যক্তি অধিকারের ক্ষেত্রেই জায়েয করা হয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রতিশোধ নেয়ার দ্বারা যাতে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। কোন কারণে যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করা বা ছাড় দেয়াকে ভালো মনে করে তাহলে তাকে তা করার সুযোগ দেয়া উচিত। কেননা ক্ষতিগ্রস্ত তো সেই হয়েছে। মূল কথা হলো, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি কোন বিশেষ কারণে প্রতিশোধের বদলে ক্ষমা বা ছাড় দেয়াকে প্রাধান্য দেয় তবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা বিচারক তার এই দাবীকে মেনে নেবে।

কিসাস ক্ষমা করার পরও কেন তাযিরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে?

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, ক্ষমা, ছাড় কিংবা কোন সঙ্গত কারণে যদি অপরাধী কিসাস থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, তবে এর অর্থ এই নয় যে, সে সব ধরনের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। কেননা কিসাসযোগ্য অপরাধে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে গোটা সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সমাজের অধিকার আছে তাকে কিসাস ছাড়া অন্য কোন শাস্তি দেয়ার। তাযিরের সীমানা খুব ব্যাপক। তাছাড়া সমকালীন শাসকের অধিকার রয়েছে যে কোন ধরনের অপরাধীকে এমন শাস্তি দেয়ার যাতে ভবিষ্যতে সে এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকে এবং অন্য লোকেরাও যাতে শাস্তির ভয়ে এ ধরনের

www.pathagar.com

অপরাধ করার সাহস না পায়। বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমা করার দ্বারা কিসাস মুলতবী হয়ে গেলেও অপরাধীকে আর কোন শাস্তি না দেয়ার ব্যাপারটিকে মজবুত করে না বরং অপরাধী ক্ষমাপ্রাপ্ত কিংবা কিসাস মওকুফ হলেও শাসক-প্রয়োজন বোধে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন।

অপরাধ ও শাস্তি বিভাজনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত

পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি, ফকীহগণ হদ্দের সংগা এভাবে দিয়েছেন, হদ্দ এমন শাস্তির নাম হক্কুল্লাহ (PUBLIC RIGHT) লঙ্ঘনের অপরাধে যা ওয়াজিব হয় আর কিসাস এমন শাস্তি নাগরিক অধিকার (PRIVATE RIGHT) লঙ্ঘনের অপরাধে যা ওয়াজিব হয় এবং তাযির এমন অনির্ধারিত শাস্তি যা কখনো ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধেও ওয়াজিব হয়। এই তিন প্রকার শাস্তির মধ্যে পার্থক্যের উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী আইন দ্বারা গণমানুষকে অপরাধমুক্ত রাখা এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখা। তাযির ও হদ্দের মধ্যে পার্থক্য হলো, তাযিরের মধ্যে শাস্তি পূর্ব নির্ধারিত থাকে না, আর হদ্দের শাস্তি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। সেই সাথে তাযির ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধেও হয়ে থাকে আবার হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধেও হয়ে থাকে। কিন্তু হদ্দ শুধুই হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে হয়। তাযির ও কিসাসের মধ্যে পার্থক্য হলো, তাযির অনির্দিষ্ট শাস্তি আর কিসাস নির্ধারিত শাস্তি। সেই সাথে তাযির কখনো ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের জন্য কখনো হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে প্রয়োগ হয় কিন্তু কিসাস শুধুমাত্র ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধেই ওয়াজিব হয়। কিসাস ও হদ্দের মধ্যে পার্থক্য হলো, কিসাস শুধু ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে সাব্যস্ত হয় আর হদ্দ শুধুই আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকেই শাস্তি পূর্ব নির্ধারিত।

কিসাসের শাস্তিকে হদ্দও বলা হয়। কারণ অন্যান্য হদ্দের মতো কিসাসের শাস্তিও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট। হদ্দ শব্দটি ব্যাপক অর্থে সেইসব মর্যাদাবান অধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ঐগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা বা হদ্দ ওগুলোর কাছেও যেয়ো না'। কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় মীরাসের আইন এবং বৈবাহিক আইনের ক্ষেত্রে হদ্দ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দ বা সীমা, এই সীমা অতিক্রম করো না'। মোদ্দাকথা হলো, আল্লাহ যে শাস্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাই হদ্দ।

www.pathagar.com

শুধু নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহকে হদ্দ বলা আর কিসাসকে হদ্দ থেকে আলাদা করা ফকীহগণের পারিভাষিক ব্যাপার; নয়তো আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট হওয়ার দিক থেকে কিসাস ও হদ্দের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কারণ উভয় শাস্তি অপরাধ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখে। ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে কিসাস ওয়াজিব হওয়ার কারণে এটিকে হদ্দ বলা যাবে না এমন নয় এবং এর ভিন্ন নামকরণের বিষয়টিও জরুরী নয়। কেননা শাস্তিকে হদ্দ বলে অভিহিত করা এবং সেটিকে হক্কুল্লাহ কিংবা হক্কুল ইবাদ লঙ্ঘনের অপরাধে কার্যকর করার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যেসব কারণে হদ্দকে হদ্দ বলা হয় সেইসব উপাদান কিসাসের মধ্যেও পাওয়া যায়। এগুলো হদ্দের মতোই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং এই শাস্তি মানুষকে এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখে।

আবু য়া'লা ও আল মাওয়ারদী উভয়ের 'আল-আহকামুস সুলতানিয়া' গ্রন্থে আমার এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁরা উভয়েই বলেছেন, 'অপরাধ হলো এমন নিষিদ্ধ জিনিস মহান আল্লাহ যেগুলো থেকে হদ্দ ও তাযিরের দ্বারা মানুষকে বিরত রাখেন। ফকীহগণ হদ্দসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হলো, যা হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে সাব্যস্ত হয় আর অন্যটি হক্কুল ইবাদ লঙ্ঘনের অপরাধে সাব্যস্ত হয়। হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে যা সাব্যস্ত হয় সেটিও দুই প্রকার। একটি হলো যা আল্লাহ তা'আলা নির্দেশিত কোন ফরয লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয় আর অপরটি আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কোন অপরাধ কর্ম করার অপরাধে ওয়াজিব হয়। প্রথমটির উদাহরণ নামায, রোযা যাকাত আদায় না করা। যে হদ্দ মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজ করার অপরাধে ওয়াজিব হয় সেটি আবার দুই প্রকার। মহান আল্লাহর হক হিসেবে যেসব নিষিদ্ধ কাজের ওপর হদ্দ প্রয়োগ হয় তা চার ধরনের। যথা– ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি ও ডাকাতি। যেসব নিষিদ্ধ কাজের ওপর ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘন হিসেবে হদ্দ ওয়াজিব হয় তা দুই ধরনের– যেমন মিথ্যা অপবাদ ও মানুষের জীবনের ওপর হস্তক্ষেপ।

এই বিভাজনের দৃষ্টিতে কিসাস (দৈহিক ক্ষতির জরিমানা) হুদুদের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে দেখলে শাস্তি তিন প্রকার না হয়ে দুই প্রকার হয় তথা হদ্দ ও তাযির। বস্তুত সব অপরাধ দুই পর্যায়েই পড়ে হদ্দযোগ্য অপরাধ ও তাযিরযোগ্য অপরাধ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ'য় বলেছেন, তাযির যদি হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয় তাহলে কেউ কেউ তাযিরকেও হদ্দ অর্থে ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে তারা বিখ্যাত হাদীস

www.pathagar.com

'দশ দুররার বেশি শাস্তি কেবল আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দের ক্ষেত্রেই দেয়া যেতে পারে' এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন, এখানে হুদুদুল্লাহ দ্বারা সেইসব অপরাধকে বোঝানো হয়েছে যেগুলো হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয়। কোন ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি লোকজন দিয়ে থাকে তা কোন অবস্থাতেই দশ দুররার বেশি হতে পারে না। ইবনে তাইমিয়া বলেন, তাযিরী শাস্তিকেও হদ্দ বলার একটা নতুন রীতি চালু হয়েছে।[১]

সারকথা : হদ্দ শব্দের ব্যাপকতার দাবি হলো, অপরাধকে শ্রেণীবিন্যাস করার ক্ষেত্রে আমরা যেন একটি সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী নীতিমালা মেনে চলি। আমার মনে হয়, আমরা কিসাস ও হদ্দ উভয়টিকে নির্দিষ্ট (PRESCRIBED) শাস্তি বলতে পারি। যদি এগুলোর কোনটি হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয় তবে ওসব অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে কোন হেরফের ঘটে না। কারণ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত। এর বিপরীতে তাযিরের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাযির হক্কুল্লাহ বা হক্কুল ইবাদ যাই লঙ্ঘনের অপরাধে সাব্যস্ত হোক না কেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয়। বস্তুত আমরা তাযিরকে অনির্দিষ্ট শাস্তি (UNPRESCRIBED PUNISHMENT) বলতে পারি। এভাবে শাস্তি হয় দুই প্রকার। একটি নির্ধারিত শাস্তি আর অপরটি অনির্ধারিত শাস্তি। শাস্তির এই বিভাজন শাস্তি নির্দিষ্টকরণ ও অনির্দিষ্টকরণের ভিত্তিতে করা হয়। এটি এমন একটি মৌলিক ভিত্তি যা দৃষ্টিগ্রাহ্য, পরিষ্কার ও সর্বজনসম্মত। ফকীহগণ অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে অপরাধের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন, তাতে আমাদের এই বিভাজনকে রোধ করে এমন কোন যুক্তি প্রমাণ নেই। বস্তুত এই মতভিন্নতা একান্তই ভাষাগত। তাই আমাদের শ্রেণী বিন্যাস যে ফকীহদের শ্রেণী বিন্যাসের উপযোগী হতে হবে তা জরুরী নয় বরং আমাদের বিভাজন ফকীহদের বিভাজনের পরিপন্থীও হতে পারে।[২]

---

১ শারহিল মুনতাহা, শায়খ মনসুর বিন ইউনুস আল-বাহুতি আল-হাম্বলী প্রণীত এই কিতাবটি কাশশাফুল কিনা আন-মাতানিল ইকনা'র হাশিয়াতে ছাপা হয়েছে। খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৫; আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-৫৫-৫৬।

২ আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, পৃ.-৫৫-৫৬।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী আইনে তাযিরী অপরাধ

অপরাধের সংগা

ফকীহদের দৃষ্টিতে অপরাধ 'শরীয়তের এমন নিষিদ্ধ কর্ম যা রোধ করার জন্য আল্লাহ তাআলা হদ্দ অথবা তাযির ঘোষণা করেছেন। এ সংগার দ্বারা বুঝা যায়, যে কাজের অপরাধে শাস্তি বা তাযির দেয়া হয় তা শরীয়ত প্রণেতা তথা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ। শরীয়ত প্রণেতাই সেই কাজটিকে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করেছেন। এই সংগা থেকে আরেকটি বিষয় বুঝা যায়, কোন নিষিদ্ধ কর্ম অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় না যদি সেই অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি না থাকে। কোন কৃতকর্মের জন্যে যদি সুনির্দিষ্ট শাস্তি না থাকে তাহলে সেটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় না।[১]

প্রশ্ন হলো, নিষেধাজ্ঞাগুলো কি? বা কোন ধরনের? যেগুলো অপরাধের এই সংগার আওতায় পড়ে? জমহুর ফকীহের মতে সর্বসম্মত মূলনীতি হলো, যে অপরাধের হদ্দ বা কাফফারা নির্দিষ্ট নয় তাতে তাযির সাব্যস্ত হয়।

কিন্তু এই মূলনীতির পরও আমরা দেখতে পাই যে, অনেক অপরাধের ক্ষেত্রে তাযিরী শাস্তি কার্যকর হয় না। পক্ষান্তরে কিছু কর্ম এমনও রয়েছে অপরাধ না হলেও এগুলো সম্পাদনকারীকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হয়।

অপরাধ বিবেচিত হওয়ার পরও যেগুলোতে শাস্তি কার্যকর হয় না আবার শাস্তি কার্যকর হওয়ার পরও যেগুলো অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় না সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা জরুরী।

গোনাহের সংগা

কোন হারাম ঘোষিত আদেশ অমান্য করা এবং কোন ওয়াজিব ঘোষিত নির্দেশ লঙ্ঘন করা গোনাহ বা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এ ব্যাপারে সকল ফকীহ

---

[১] ফকীহদের দেয়া জুরম্ বা অপরাধের সংগা আধুনিক আইনে বর্ণিত অপরাধের সংগার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আধুনিক আইন বিশারদগণও বলেন, আইন যে সব কর্ম করা বা লংঘন করার জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে এগুলোই অপরাধ। যে সব কাজ করা বা না করার জন্যে শাস্তি নির্দিষ্ট থাকে না সেগুলো অপরাধ হিসেবে বিবেচিত নয়। দেখুন, আল আহকামুল আম্মাতু ফি কানুনিল উকুবাত, ড. সাঈদ মুস্তাফা সাঈদ, পৃষ্ঠা-২৬, প্রকাশ : ১৩৭১ হিজরী মোতাবেক ১৯৫২ খৃ.।

www.pathagar.com

একমত। কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন কর্ম সম্পাদন করে যা তার জন্যে হারাম অথবা এমন কোন নির্দেশ অমান্য করে যা পালন করা তার উপর ওয়াজিব তাহলে সে গুরুতর অপরাধে গোনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে। যদি শরীয়তে হারাম কর্ম সম্পাদন কিংবা নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি না থাকে তাহলে এই ব্যক্তি তাযিরী শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।[১]

ওয়াজিব লঙ্ঘনের কারণে ফকীহগণ যে সব তাযিরী শাস্তি নির্ধারণ করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ : যাকাত আদায় না করা, ফরয নামায আদায় না করা, আমানতের খেয়ানত করা, যেমন কারো আমানত রাখা সম্পদ ফিরিয়ে না দেয়া, এতীমের সম্পদ গ্রাস করা, কোন ওয়াকফ সম্পদের আয় উৎপাদন গ্রাস করা, কোন এজেন্সির সম্পদ অথবা অংশীদারদের অংশ নিজের কাছে থাকা সত্ত্বেও আদায় না করা তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

'কাশশাফুল কিনা' গ্রন্থের লেখক বলেন, বিক্রেতা যদি বিক্রির সময় পণ্যের এমন কোন ত্রুটি আড়াল করে যার ফলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাও তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেননা সে পণ্যের ত্রুটি আড়াল করে প্রতারণা (FRAUD) করেছে। অনুরূপ কোন জিনিস ভাড়া দেয়ার ব্যাপারে কিংবা বিবাহের ব্যাপারে ধোঁকা দেয়া অথবা কোন দ্বিপাক্ষিক ব্যাপারে এক পক্ষ যদি ধোঁকা দেয় তাহলে এসবের অপরাধে তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। কোন বিষয়ে যদি কারো সাক্ষ্য দেয়া জরুরী হয় কিংবা কোন তথ্যদাতা যদি তথ্য

---

১ তাবসিরাতুল হুক্কাম, ইবনে ফারহুন, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৬-৩৬৭; মুঈনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা-১৮৯; কাশশাফুল কিনা' আন-মাতানিল ইকনা' খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭৫; আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-৫৫, আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম, ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-৩৮; আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৪৪; আল আহকামুস সুলতানিয়া, আলমাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১০; ওয়াজিব এবং হারাম এর সংগার জন্যে দেখুন– ইলমে উসূলিল ফিকহ, আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, পৃষ্ঠা-১১৬ ও পৃষ্ঠা-১২৫, প্রকাশ ১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৪ খৃ.। সেখানে বলা হয়েছে, শরীয়ত প্রবর্তক সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালনে সক্ষম মানুষকে যে কর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তাকেই বলে ওয়াজিব। আর হারাম হলো শরীয়ত প্রবর্তক আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালনে সক্ষম মানুষকে যে কর্ম না করার নির্দেশ দিয়েছেন তাই হারাম।
এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, হানাফীগণ ওয়াজিব ও ফরযের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। হানাফীদের মতে ফরয হলো সেই নির্দেশ যা সুনির্দিষ্ট এবং এর দলীল অকাট্য যার মধ্যে সংশয় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। হানাফীদের মতে হারামের বিপরীত ফরয আর মাকরূহে তাহরীমের বিপরীত ওয়াজিব।

www.pathagar.com

দেয়ার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয় এমতাবস্থায় তারা যদি সাক্ষ্য ও তথ্য সরবরাহে ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় নেয় তবে তাযিরী শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। সেই সাথে কোন একটা জিনিস নাপাক হওয়ার কথা কেউ জানে কিন্তু জানা সত্ত্বেও সে অন্যকে তা জানায়নি। অনুরূপ কোন আমলা কিংবা বিচারক যদি তার কর্তব্য পালনে অবহেলা করে তবে তারাও তাযিরী শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। ইবনে রুশদ বলেন, কোন ব্যক্তিকে যদি বিচারক (Judge) নিযুক্ত করা হয় আর সেই ব্যক্তি বিনা কারণে বিচারকের দায়িত্ব এড়িয়ে যায় তবে বিচারকের দায়িত্ব পালনের জন্যে শাসক তাকে বাধ্য করতে পারেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তাকে কয়েদ ও দৈহিক শাস্তিও দেয়ার বিধান রয়েছে। কারণ তাকে বিচারক নিযুক্ত করার পর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। এই ওয়াজিব কর্তব্য পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে সে অপরাধ করেছে, সে অপরাধে তাকে শাস্তি দেয়া বৈধ।[১]

হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে ফকীহগণ নিম্নোল্লিখিত উদাহরণ দিয়েছেন– এমন চুরি যে চোরাইকৃত সম্পদ নেসাব পরিমাণ না হওয়া কিংবা অন্যান্য কারণে চোরের উপর যদি হদ্দ প্রয়োগ করার অবকাশ না থাকে তাহলে এ ধরনের চুরির অপরাধে তাযিরী শাস্তি নির্ধারিত হবে। অথবা পরনারীকে চুমু দেয়া, কিংবা পরনারীর সংগে একান্তে সময় কাটানো যাতে ব্যভিচার প্রমাণ করার সুযোগ নেই। ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কসম করা, প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, চিহ্নিত অপরাধীকে আড়াল করা কিংবা আশ্রয় দেয়া। এ ধরনের কর্ম সম্পাদন করা এমন বেআইনী কাজ যার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাযিরী শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।[২]

---

১ 'ওয়াজিব তরক' সম্পর্কে দেখুন, তাবসিরাতুল হুককাম, ইবনে ফারহুন, হাশিয়া ফাতহুল আলী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৬; মুঈনুল হুককাম, পৃষ্ঠা-১৮৯, আল আহকামুস সুলতানিয়া, আলমাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১০; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবুয়ালা, পৃষ্ঠা-২৪৭; আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-৫৫; আল হিসবাহ ফিল ইসলাম, ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-৩২; কাশশাফুল কিনা' আন মাতানিল ইকনা', খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭৫।

২ তাবসিরাতুল হুককাম, ইবনে ফারহুন, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৭, এটি ফাতহুল আলী আল মালিক এর হাশিয়াতে লেখা হয়েছে।

www.pathagar.com

মুসতাহাব ছেড়ে দেয়া এবং মাকরূহ কর্ম করার বিধান

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, ওয়াজিব পালন না করা এবং হারাম কর্মে লিপ্ত হওয়া এমন ধরনের গোনাহ্ এগুলোর ব্যাপারে যদি শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে কোন ধরনের শাস্তি নির্ধারিত না থাকে তাহলে এসব গোনাহ্ করার কারণে তাযিরী শাস্তি কার্যকর করা যায়।

কিন্তু একটা বিষয় ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে যে, কোন মুস্তাহাব পালন না করা কিংবা কোন মাকরূহ কর্ম সম্পাদন করার ফলে তাযিরী শাস্তি হবে কি-না? এ ধরনের কাজ কি মাসিয়াতের (গোনাহের) অন্তর্ভুক্ত?

উসূলে ফিকহের কোন কোন বিজ্ঞজন মনে করেন, প্রতিটি মুস্তাহাব পালন করা আসলে শরীয়ত প্রবর্তকের উদ্দেশ্য। শরীয়ত প্রবর্তকের প্রত্যাশ্যা হলো প্রতিটি মুস্তাহাব পালিত হোক। এর বিপরীতে প্রতিটি মাকরূহ কর্মই শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ। শরীয়ত প্রবর্তকের আকাঙ্ক্ষা হলো মানুষ এসব থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মধ্যে পার্থক্য হলো, ওয়াজিব লঙ্ঘনকারী নিন্দা ও শাস্তির যোগ্য কিন্তু মুস্তাহাব পালন না করলেও কোন নিন্দা ও শাস্তি নেই।

অনুরূপ মাকরূহ ও হারামের মধ্যে পার্থক্য হলো, হারাম কর্ম সম্পাদনকারী নিন্দা ও শাস্তিযোগ্য কিন্তু মাকরূহ কর্ম সম্পাদনকারীর জন্যে নিন্দা ও শাস্তি নেই। এই নীতির ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক উসূলবিদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব ত্যাগকারী এবং মাকরূহ সম্পাদনকারী মাসিয়াত তথা গোনাহগার বলে বিবেচিত হয় না।

কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে এমন সব কর্ম করা মাসিয়াত বা গোনাহ্ যেগুলো সম্পাদনকারী তিরস্কৃত ও শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হয়। এসব কাজকে তারা নিন্দনীয় মনে করেন না। অবশ্য মুস্তাহাব ত্যাগকারী ও মাকরূহ সম্পাদনকারীকে তারা শরীয়ত পরিপন্থী কর্ম সম্পাদনকারী মনে করেন, শরীয়তের একনিষ্ঠ অনুগত ব্যক্তি বলে মনে করেন না। তাদের বিবেচনায় এসব লোক নাফরমান।

উসূলবিদদের অপর একটি অংশের মতে, মুস্তাহাব বিষয়গুলো শরীয়তের পালনীয় নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। তদ্রূপ মাকরূহ বিষয়গুলো শরীয়তের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না। তাই তাদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব কর্ম করা পছন্দনীয় আর মাকরূহ কর্ম সম্পাদন অপছন্দনীয়। এদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব ত্যাগকারী ও মাকরূহ সম্পাদনকারীকে মাসিয়াতে (গোনাহে) লিপ্ত মনে করা

www.pathagar.com

হয় না। কারণ শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ পালনের যোগ্য (Imposition of Binding duty) ব্যক্তি ছাড়া কোন কর্ম সম্পাদন কিংবা আজ্ঞা পালন না করাকে গোনাহ বলা যায় না। বস্তুত মুস্তাহাব ও মাকরূহের মধ্যে এসব গুণাবলী অনুপস্থিত।

প্রশ্ন হলো, মুস্তাহাব ত্যাগকারী এবং মাকরূহ সম্পাদনকারীকে যদি গোনাহগার সাব্যস্ত করা না হয় তাহলে এ দুই কাজের জন্যে কি তাযিরী শাস্তি দেয়া যায়? এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এক অংশের মত হলো, শাস্তি দেয়া যেতে পারে আর অপর অংশের মত হলো, মুস্তাহাব ত্যাগ ও মাকরূহ সম্পাদনের জন্যে শাস্তি দেয়া জায়েয নয়। যারা শাস্তি না দেয়ার পক্ষে তাদের দলীল হলো, মুস্তাহাব ও মাকরূহ প্রমাণের ক্ষেত্রে পরিষ্কার কোন দলীল থাকে না। বস্তুত "যেক্ষেত্রে পরিষ্কার কোন হুকুম বা নির্দেশ নেই সেক্ষেত্রে শাস্তিও নেই"– এই মূলনীতির ভিত্তিতে কোন কোন ফকীহ বলেন, শাস্তি হওয়া বা না হওয়াই প্রমাণ করে কাজটি মুস্তাহাব না ওয়াজিব, মাকরূহ না হারাম। অর্থাৎ শরীয়ত-প্রবর্তকের পক্ষ থেকে যদি কোন ব্যাপারে শাস্তি নির্ধারিত থাকে তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায় সেই কাজটি হারাম না হয় ওয়াজিব। আর যদি শাস্তির ঘোষণা না থাকে তাহলে বোঝা যায় কাজটি মুস্তাহাব অথবা মাকরূহ।[১]

যেসব ফকীহ মাকরূহ কর্ম করার কারণে এবং মুস্তাহাব কর্ম না করার কারণে শাস্তি দেয়ার পক্ষে তাদের দলীল হযরত উমর রা. এর ঘটনা। এক ব্যক্তি ছাগল জবাই করার জন্যে ছাগলটি বেঁধে ফেলে রেখে ছুরি ধার দিতে শুরু করে, এটা দেখে হযরত উমর রা. তাকে তাযিরী শাস্তি দেন। যেহেতু এ কাজটি ছিল মাকরূহ। লোকটি মাকরূহ কাজটি করার কারণে উমর রা. তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, ফলে মাকরূহ কাজ সম্পাদনকারী এবং মুস্তাহাব কাজ ত্যাগকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে।[২]

---

১ প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী আইনে কোন কাজ করা এবং করা থেকে বিরত থাকা (Doing and sastention From Doing) উভয়টি বোঝানোর জন্যে আরবী (فعل) ফা'আলা শব্দই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২ আল মুস্তাস্‌কা, আল গাযালী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৫-৭৬, প্রথম প্রকাশ : মাতবায়ে আমিরিয়া, বুলাক, মিসর ১৩২২ হিজরী; আল-আহকাম ফি উসূলিল ইহকাম, আমেদী, খণ্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১৬০, প্রকাশ : ১৩৩২ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খৃ. মাতবায় আল মারূফ, মিসর। এতে লেখা হয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন, মাকরূহ ও মুস্তাহাব

www.pathagar.com

গ্রন্থকার বলেন, আমার অভিমত হলো, মাকরূহ কাজ সম্পাদনকারী এবং মুস্তাহাব কাজ ত্যাগকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে। কেননা অনেক ক্ষেত্রে মুস্তাহাব পালন করা এবং মাকরূহ না করার মধ্যে গোটা সমাজের মঙ্গল অমঙ্গল জড়িত থাকে। শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যই হলো সমাজকে ক্ষতিকর ও মন্দ জিনিস থেকে হেফাজত করা। মানুষকে এমন কাজে অভ্যস্ত করা যাতে সমাজের কল্যাণ থাকে এবং সমাজের অকল্যাণ থেকে মানুষকে বিরত রাখা। যেসব মাকরূহ ও মুস্তাহাব ব্যাপক সমাজের ভালো মন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট এ ধরনের মাকরূহ ও মুস্তাহাব কাজ করা ও ত্যাগের জন্যে প্রশাসন তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে। আমার এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়, যারা মুস্তাহাব ও মাকরূহকে করণীয় ও বর্জনীয় হুকুমের আওতা বহির্ভূত মনে করেন, তারাও মুস্তাহাব ত্যাগকারীকে নিন্দা এবং মাকরূহ সম্পাদনকারীকে তিরস্কারযোগ্য মনে করেন। তাদের দৃষ্টিতে এই নিন্দা ও তিরস্কার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একথা থেকে বোঝা যায়, দুনিয়ায় নিন্দা ও তিরস্কার হালকা তাযিরের পর্যায়ে পড়ে। উল্লেখিত মতামতকে যদি সঠিক ধরে নেয়া যায় তাহলে মুস্তাহাব ত্যাগ এবং মাকরূহ সম্পাদন শাস্তিযোগ্য হওয়ার পরিণতি হলো, মুস্তাহাব ত্যাগ করা এবং মাকরূহ সম্পাদন এমন কাজ যা গোনাহ বা মাসিয়াতের অন্তর্ভুক্ত না হলেও নিষিদ্ধ। আমরা তো আগেই বলে এসেছি, সেই নিষিদ্ধ জিনিসগুলো অপরাধ শরীয়ত প্রবর্তক যেগুলোকে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করেছেন। বস্তুত মাকরূহ সম্পাদন এবং মুস্তাহাব ত্যাগে যদি শাস্তি হয় হবে তা অপরাধের পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে।

মাসিয়াত বা গোনাহ ছাড়াও তাযিরী শাস্তি

কোন কোন ফকীহ বলেন, কোন কাজ যদি মাসিয়াতের পর্যায়ে না পড়ে তবুও সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তাযিরী শাস্তি দেয়া যেতে পারে। যেমন কোন গায়ের মুকাল্লাফ ব্যক্তি (শরীয়তের নির্দেশ পালনের বাধ্যবাধকতা যার

তাকলিফী আহকাম (Binding orders) এর অন্তর্ভুক্ত। মাওয়াহিবুল জলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩২০, প্রথম প্রকাশ : ১৩২৯ হি. মাতবায়ে আস-সাআদাত, কায়রো, মিসর। ইলমে উসূলে ফিকহের অধ্যাপক শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, পৃষ্ঠা-১২৩। খাল্লাফ মুস্তাহাব এর সংগায় বলেন, মুস্তাহাব এমন বিধান শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে যা পালন করার নির্দেশ রয়েছে কিন্তু তা অলংঘনীয় নয়। এবং মাকরূহ এমন বিধান যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু তাও অলংঘনীয় নয়। আত্ তাশরীউল জিনাঈ আল ইসলামী, পৃষ্ঠা-১২৯-১৩০ এবং ১৫৩-১৫৬।

www.pathagar.com

উপর নেই) যদি এমন কোন কাজ করে যে কাজের জন্য একজন মুকাল্লাফ হলেও গণকল্যাণের পরিপন্থী বলে তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এমন ব্যক্তিকেও শাস্তি দেয়া যেতে পারে, যে কোন মুবাহ খেলাধুলাকে জীবিকার মাধ্যম বানিয়ে ফেলে। মুবাহ কোন খেলাধুলাকে জীবিকার উপায় অবলম্বনকারী ব্যক্তিই নয় যারা এতে পয়সা খরচ করে গণকল্যাণের বিবেচনায় তাদেরকেও তাযিরী শাস্তি দেয়া যাবে। জনস্বার্থের জন্যে হিজড়াদেরকেও দ্বীপান্তর করা যায় যাতে সাধারণ মানুষদের তাদের বেহায়াপনা ও নারী সদৃশ কুরুচিপূর্ণ আচার-আচরণ দেখতে না হয় এবং অসচেতন মানুষ তাদের অশ্লীল কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত না হতে পারে।[১] জনস্বার্থে মাসিয়াত নয় এমন কাজের জন্যে তাযিরী শাস্তি দেয়ার সমর্থন পাওয়া যায় রসূলুল্লাহ স. এর কর্ম থেকে। চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ স. কয়েদখানায় বন্দি করেন। অতঃপর তদন্তে যখন জানা গেল চুরির অভিযোগে সে জড়িত নয় তখন তাকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, লোকটি এমন কোন প্রকাশ্য অপরাধ করেনি যে তারিযী শাস্তির উপযোগী হয়েছিল।[২]

গ্রন্থকার বলেন, আমি মনে করি, যেসব লোক নারী সদৃশ পোশাক পরে ও অঙ্গভঙ্গি করে মাসিয়াতের অপরাধেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কেননা পুরুষের জন্যে নারীর সদৃশ হওয়া নাজায়েয। তাই যে পুরুষ এ ধরনের কাজ করবে সে অবশ্যই মাসিয়াত করলো। রসূলুল্লাহ স. চুরির অভিযোগে যে ব্যক্তিকে কয়েদ করেছিলেন, আমার মতে তদন্তের জন্যে সেটি ছিল একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা মাত্র। অভিযোগ আরোপের পর অভিযুক্তের নিরাপত্তার স্বার্থেই রসূলুল্লাহ স. তাকে বন্দিশালায় রেখেছিলেন যতক্ষণ না সে তদন্তে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে। এটা ছিল জনস্বার্থে নেয়া একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এটিকে আমরা কিছুতেই তাযিরী শাস্তি বলতে পারি না। আরবী (عِصْيَان) ইস্‌য়ান শব্দ থেকে মাসিয়াত শব্দের উৎপত্তি। ইসয়ান অর্থ গোনাহ, নাফরমানী ইত্যাদি। এই শব্দের উৎপত্তিগত অর্থের দিকে চিন্তা করে মাসিয়াতে জড়িত ব্যক্তির বেলায় সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক

---

১ নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৭৩-১৭৪। হাশিয়াতু আবি যিয়া আশশায়খ আলী আশ-সিবরামালিসী আলা শারহিল মিনহাজ। এটি নেহায়াতুল মুহতাজ-এর হাশিয়াতে ছাপা হয়েছে।

২ শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১৭।

www.pathagar.com

অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রকৃত অর্থেই সে গোনাহগার অপরাধী কি-না। ধরুন, যদি লোকটি মুকাল্লাফ-বিশ-শরীয়ত (শরীয়তের নির্দেশ পালনের যোগ্য) না হয় তাহলে কিছুতেই তাকে গোনাহগার বলা যাবে না। যেমন কোন নাবালেগ, সে তো মুকাল্লাফ নয় তাই তার কোন কর্মকে গোনাহ বলার অবকাশ নেই। এমতাবস্থায়ও নাবালেগ কোন গুরুতর অপরাধ করলে তাকে যে শাস্তি দেয়া হয় তা মাসিয়াত হিসেবে নয় জনস্বার্থে তার সংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেয়া হয়।[১] অনুরূপভাবে মুবাহ খেলাধুলায় জড়িত ব্যক্তি মাসিয়াতে লিপ্ত নয়, কেননা যে কাজে সে লিপ্ত তা শরীয়ত পরিপন্থী বলে কোন নির্দেশ নেই, এজন্য মুবাহ খেলাধুলাকে জীবিকার উপায় হিসাবে অবলম্বনকারী ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয় জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাযির হিসেবে নয়।[২]

উপরের আলোচনার পর আমরা বলতে পারি, জনস্বার্থে এমন কাজের ক্ষেত্রেও শাস্তি দেয়া যায় না প্রকৃত পক্ষে যা মাসিয়াতের পর্যায়ে পড়ে না। উল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে যেসব লোক জনস্বার্থ পরিপন্থী কাজে লিপ্ত এবং সমাজের জন্যে ক্ষতিকর কাজে জড়িত, মাসিয়াত বা চিহ্নিত অপরাধ কর্ম না হলেও তাদের শাস্তির আওতায় আনা যায়। যেমন এমন সব লোকদের বন্দি করা যায় যারা মানুষের ইজ্জত সম্ভ্রম জীবন সম্পদে হস্তক্ষেপ করে। এ ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত কিন্তু অভিযোগ প্রমাণের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। অথবা এমন প্রমাণ নেই যার দ্বারা এসব ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় কিন্তু সমাজের ব্যাপক স্বার্থে এ ধরনের লোকদের কয়েদ করা জরুরী।

মাসিয়াত (গোনাহ) সাব্যস্ত হওয়ার পরও শাস্তি রহিত হয়ে যাওয়া

শরীয়তের মূলনীতি হলো, যেসব মাসিয়াত বা গোনাহের সুনির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষিত হয়নি সেগুলোর ক্ষেত্রেই তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হয়। সেই সাথে এমন ধরনের নিষিদ্ধ কাজেও তাযিরী শাস্তি দেয়া যায় যেগুলো মাসিয়াতের পর্যায়ে পড়ে না। এই মূলনীতির পরও কোন কোন ফকীহ একথাও বলেছেন, এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো মাসিয়াতের পর্যায়ভুক্ত হলেও এগুলোর জন্যে শাস্তি দেয়া যায় না, শাস্তি রহিত হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি নিজের কোন

---

১ জনস্বার্থের প্রয়োজনে তাযিরী শাস্তির আলোচনার জন্যে দেখুন 'আত-তাশরীঈল জিনাইল ইসলামী, পৃষ্ঠা-১৪৯।

২ নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৭২।

www.pathagar.com

অঙ্গ কেটে ফেলে অথবা নিজের শরীরে আঘাত করে জখম করে ফেলে অথবা আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ব্যক্তি অবশ্যই গোনাহ কর্ম করেছে যা হারাম বলে বিবেচিত, কিন্তু এসব অপরাধে কেউ শাস্তি দানের কথা বলেন না। এর অর্থ হলো, কোন কোন ক্ষেত্রে কাজটি মাসিয়াত বা গোনাহ বলে স্বীকৃত হলেও এজন্য শাস্তি কার্যকর করা হয় না।[১]

গ্রন্থকার বলেন, আমার মনে হয় উপরের দেয়া উদাহরণের কৃত কর্মের জন্যে সেই ব্যক্তির উপর কিসাস প্রয়োগ কিছুতেই সম্ভব নয় তাযিরী শাস্তিও এজন্য রহিত করে দেয়া হয়েছে, কারণ সে নিজেই তো দৈহিক শাস্তি ভোগ করে ফেলেছে। এরপরও তাকে পুনরায় শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই। তারপরও আমার দৃষ্টিতে এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে তাযিরী শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। কেননা উল্লেখিত ব্যক্তি যদিও তার নিজের উপরই জুলুম করেছে কিন্তু নিজের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা ও আত্মরক্ষা করা প্রত্যেকের জন্যেই ওয়াজিব।

অপরাধ গোনাহর সমার্থক নয়

উপরের দীর্ঘ আলোচনার সার কথা হলো, 'জুরম' বা অপরাধের পরিধি 'মাসিয়াত' বা গোনাহর চেয়ে অনেক ব্যাপক। গোনাহও অপরাধের অন্তর্ভুক্ত সেই সাথে অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজগুলোও অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মুস্তাহাব ত্যাগ করা এবং মাকরূহ কর্ম সম্পাদন করা। সেই সাথে গোনাহর সংগায় পড়ে না এমন মুস্তাহাব ও মাকরূহ কর্মের সংগায় ফেলা যায় না, তবুও জনস্বার্থ এবং সমাজের কল্যাণার্থে এগুলো নিষিদ্ধ এবং এসব করলে তাযিরী শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। তাই এটা বলার সুযোগ নেই জুরম ও মাসিয়াত তথা গোনাহ ও অপরাধ সমার্থক বা প্রতিশব্দ।

যেসব নিষিদ্ধ কাজের জন্যে তাযিরী শাস্তি ওয়াজিব হয় এগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত :

১. যেগুলোর সমগোত্রীয় অপরাধের জন্যে সুনির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে কিন্তু এসব শাস্তি এজন্য প্রয়োগ করা যায় না, কারণ শাস্তি প্রয়োগের শর্তাদি পুরোপুরি অপরাধীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে না।

---

১ আলবাদায়ে ওয়াস সানায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৪।

www.pathagar.com

২. এমন ধরনের জুরম বা অপরাধ যেগুলোর সুনির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে কিন্তু সংশয় বা অন্য কোন কারণে শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না।

৩. এ ধরনের অপরাধ শরীয়ত যেগুলোর জন্যে কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করেনি। এসব ব্যাপারে এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো, অপরাধের ক্ষেত্র এবং অবস্থাকে ভিত্তি করে আমাদের আলোচনা আবর্তিত হবে এবং তাতে অপরাধের প্রকারভেদ নির্ণীত হবে।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী আইনে মানুষের বিরুদ্ধে দৈহিক ও প্রাণঘাতি অপরাধের শাস্তি

মানুষের সত্তার বিরুদ্ধে যে সব অপরাধ হয়ে থাকে ফকীহগণ এসব অপরাধকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত এমন অপরাধ যাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই অপরাধকে মানুষের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ (Crime Aganinst Person) বলা হয়। দ্বিতীয়ত যে অপরাধে মানুষের দেহের ক্ষতি হয় কিন্তু মৃত্যু ঘটে না, এ ধরনের অপরাধকে (Crime Against Body) বলা হয়।

মানবসত্তার বিরুদ্ধে অপরাধ কয়েক প্রকার

১. ইচ্ছাকৃত হত্যা। অর্থাৎ জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে হত্যা করা।

২. ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সামঞ্জস্য রাখে এমন হত্যা : অর্থাৎ যে হত্যার ক্ষেত্রে এমন সংশয় থাকে যে হত্যাকাণ্ডটি ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘটানো হয়েছে।

৩. ভুলবশত হত্যা : যে হত্যাকাণ্ড হত্যার উদ্দেশ্যে নয় ভুলবশত সংঘটিত হয়েছে।

৪. এমন হত্যাকাণ্ড যা ভুলবশত কৃত হত্যার সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

৫. হত্যার কারণ হওয়া।

এসব হত্যাকাণ্ডের বিভাজন ও সংগার ক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। যেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা আমরা সামনে করবো ইনশাআল্লাহ।

আর যেসব অপরাধ মানুষের দেহের বিরুদ্ধে করা হয় এবং তাতে মৃত্যু না ঘটে সেগুলোও কয়েক ভাগে বিভক্ত :

১. যে অপরাধ মানব দেহের নির্দিষ্ট কোন অংগের উপর করা হয়।

২. এমন অপরাধ যাতে মানবদেহের কোন অংগের স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হয়ে যায়।

৩. মাথা ও চেহারার বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ, ফকীহগণ যাকে 'শাজাজ' (Fracture) বলেন।

৪. এমন অপরাধ যা শরীরের বিভিন্ন অংগের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়, যাকে জখম ক্ষত বা আঘাত বলা হয়।

www.pathagar.com

উল্লেখিত অপরাধগুলোর অধিকাংশের জন্যে ইসলামী শরীয়ত সুনির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস। যদি কোন কারণে কিসাস অকার্যকর হয় তাহলে রক্তপণ কিসাসের স্থলাভিষিক্ত হয় যদি না নিহতের উত্তরাধিকারীগণ বিনা প্রতিদানে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়। ক্ষমা করে দিলে হত্যাকারীর উপর দিয়াত ওয়াজিব হয় না। কিসাসের ক্ষেত্রে হত্যাকারী যদি নিহতের উত্তরাধিকারী হয় তাহলে কিসাস কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে হত্যাকারী নিহতের উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে।

ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডে দিয়াত ওয়াজিব হয়। সেই সাথে অন্যান্য শাস্তিও দেয়া যেতে পারে। যেমন উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ এবং রক্তপণ আদায়। অবশ্য রক্তপণ বা কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ভুলবশত হত্যা অথবা ভুলবশত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার শাস্তি হলো জরিমানা বা দিয়াত, কাফফারা এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

হত্যার কারণ হওয়ার অপরাধে শুধু দিয়াতের শাস্তি প্রয়োগ হয়, এতে কাফফারা দিতে হয় না। কোন কোন ফকীহ ভুলবশত হত্যা এবং কারণজনিত অপরাধে একই শাস্তির কথা বলেছেন। যেসব অপরাধে মানব দেহের ক্ষতি হয়, তা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় তবে তাতে কিসাস ওয়াজিব হয়। অবশ্য কিসাস কার্যকর করার সকল শর্তাদি অপরাধীর মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। বিশেষ করে আঘাতকারী ও আঘাতগ্রস্তের ক্ষতিগ্রস্ত অংগের মধ্যে সাদৃশ্য থাকতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অংগের প্রতিশোধ আঘাতকারীর একই অংগের বিনিময়ে নেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোন কারণে যদি কিসাস রহিত হয়ে যায় তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ভিত্তিতে হয় দিয়াত ওয়াজিব হয় নয়তো ক্ষতস্থানের একটা ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হয় অথবা অপরাধীর উপর জরিমানা ধার্য করা যায়।

উপরের আলোচনায় আমরা বুঝতে পারলাম, মানব জীবন ও মানব দেহের বিরুদ্ধে যে অপরাধ ঘটে থাকে তন্মধ্যে অধিকাংশের শাস্তি শরীয়ত আগে থেকে নির্ধারণ করে দিয়েছে। এগুলোর প্রেক্ষিত তাযিরী অপরাধের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা একথাও বুঝতে পারলাম, কতগুলো সুনির্দিষ্ট শর্তের বিদ্যমানতা ছাড়া কিসাস কার্যকর হয় না। শর্ত বিদ্যমান না থাকলে দিয়াত ধার্য করা হয়। এ পর্যায়ে আমরা কিসাসের শর্তাবলি ও অবস্থাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করবো, যেগুলোতে কিসাস কার্যকর করার জন্যে শর্তগুলো

www.pathagar.com

পুরোপুরি বিদ্যমান থাকে। ফলে আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে কিসাসের মোকদ্দমাগুলোতে কিভাবে তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের অবস্থা সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে আমরা সেই বিষয়গুলোও আলোচনায় নিয়ে আসবো যেগুলোতে আহত বা জখমের জন্যে প্রতিদান জরিমানা কিংবা বদলা দিতে হয়। কেননা প্রতিদান কিংবা জরিমানা প্রশাসনকে নয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের দিতে হয়। এ পর্যায়ে এ দিকটারও আলোচনা জরুরী হয়ে পড়ে দিয়াত বা জরিমানা দেয়ার পাশাপাশি তাযিরী শাস্তি দেয়া কি জায়েয না নাজায়েয। আলোচ্যসূচির একটি অংশে থাকবে হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন দিক আর অন্য অংশটিতে থাকবে মানবদেহের বিরুদ্ধে কৃত বিভিন্ন অপরাধের অবস্থা।

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

হত্যার প্রকারভেদ

প্রথম অনুচ্ছেদ

ইচ্ছাকৃত হত্যা

আমরা পূর্বেও বলেছি, ইসলামী আইনে ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি স্বরূপ কিসাস ওয়াজিব। কিন্তু কিসাস ওয়াজিব হওয়ার জন্যে কিসাসের শর্তাদি বিদ্যমান থাকা জরুরী। হত্যাকারীর সাথে সম্পৃক্ত কিসাসের শর্তাদির অন্যতম হলো, হত্যাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে এবং এই হত্যার ইচ্ছার মধ্যে কোন ধরনের সংশয় সন্দেহ ছিল না। সেই সাথে হত্যাকারী স্বজ্ঞানে স্বাধীনভাবে এমন কাণ্ড ঘটাতে সক্ষম এবং কোন ধরনের মাধ্যম বা সহযোগিতা ছাড়া হত্যাকারী নিজেই সরাসরি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

নিহতের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাদি হলো, নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর সন্তানাদি নয় এমন হতে হবে। নিহত ব্যক্তি সর্বদিক থেকে পবিত্র রক্তের অধিকারী তথা তার উপর কোন ধরনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ নেই এবং তার রক্ত হত্যাকারীর রক্তের সমান। এছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, নিহতের উত্তরাধিকারীগণ হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিসাস বাস্তবায়নের দাবীদার হতে হবে। নিহতের উত্তরাধিকারীগণের পক্ষ থেকে কোন বিনিময় নিয়ে অথবা বিনিময় ছাড়াই যদি কিসাস ক্ষমা করে দেয়া হয় তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যায়।[১] এমতাবস্থায় বিচারকের জন্যে কিসাসের নির্দেশ জারী করা জায়েয নয়। উল্লেখিত শর্তাদির কোন একটি যদি বিদ্যমান না থাকে তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যায় তবে রক্তপণ ওয়াজিব হয়। যদি না নিহতের উত্তরাধিকারীগণ রক্তপণ ক্ষমা করে দেয়।

এখন আমরা যেসব অবস্থায় কিসাস প্রয়োগের শর্তাদি বিদ্যমান থাকে না এগুলোর অবস্থা বিস্তারিত আলোচনা করবো। বিষয়গুলো বোঝার জন্য আমরা প্রতিটি অবস্থার উদাহরণ পেশ করবো।

---

১ একথা ঠিক যে, একজন হত্যাকারীর সহযোগীর অবস্থা অপর সহযোগীর শাস্তিতে কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতের ভিত্তি সংশয়। কারণ সংশয় কিসাস কার্যকর করার ক্ষেত্রে সর্বসম্মত একটি প্রতিবন্ধক। (অনুবাদক)

www.pathagar.com

(এক) কিসাসের শর্তাদির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, হত্যাকারী ইচ্ছাকৃত হত্যা করতে হবে এবং এতে কোন ধরনের সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারবে না। যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা না করে থাকে তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। ওয়াজিব হবে দিয়াত। ইচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যে সংশয় সন্দেহ সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থার একটি হলো, হত্যাকাণ্ডে একাধিক অন্তত দু'জন লোকের অংশগ্রহণ থাকা এবং তাদের অন্তত একজন যদি এমন হয় যে, সে একাকী হত্যা করলে কিসাস ওয়াজিব হতো না। যেমন দুই হত্যাকারীর একজন ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে অপরজন ভুলবশত হত্যাকাণ্ডে জড়িত হয়েছে। তন্মধ্যে এমনও হতে পারে একজন মুকাল্লাফ অন্যজন গায়ের মুকাল্লাফ। যেমন একজন বালেগ আর অপরজন নাবালেগ বা পাগল।

এমতাবস্থায় আবু হানিফা র. এর অভিমত দু'জনের কারো উপরেই কিসাস ওয়াজিব হবে না। উভয়ের উপরই দিয়াত ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালিক র. বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে এবং নাবালেগ ও ভুলবশত হত্যাকারীর উপর অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানিফা র. প্রমাণ হিসেবে বলেন, হত্যা এমন কর্ম যার কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া সম্ভব নয়। দু'জন একত্রে হত্যাকাণ্ড ঘটালে যদি একজনের উপর কিসাস ওয়াজিব করা হয় তাহলে এমন সংশয় দেখা দিতে পারে যার উপর কিসাস ওয়াজিব করা হয়েছে প্রকৃত পক্ষে তার আঘাতে মৃত্যু ঘটেনি নিহত হয়েছে অপরজনের আঘাতে যার উপর কিসাস ওয়াজিব করা হয়নি। এ কারণে বিষয়টির মধ্যে একধরনের সংশয় জন্ম নেয়। আর সামান্য সংশয় দেখা গেলে তাতে কিসাস ওয়াজিব হয় না। কেননা রসূলুল্লাহ স. এর ফরমান রয়েছে, 'সংশয়ের অবকাশ থাকলে হুদুদ ও কিসাস রহিত করে দাও।' বস্তুত কিসাস যখন রহিত হয়ে গেল তখন এর বিকল্প দিয়াত সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় মতের ভিত্তি জনস্বার্থ। জনস্বার্থের চাহিদা হলো মানুষের জীবন ও রক্তের নিরাপত্তার ব্যাপারটিতে কঠোরতা অবলম্বন করা। সেই সাথে হত্যাকাণ্ডে দু'জনের সম্পৃক্ততা মানে এরা উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে হত্যাকাণ্ডে জড়িত। অতএব বিচার করার ক্ষেত্রে এ দিকটি সামনে রেখে ভিন্নভিন্ন ভাবে ফয়সালা করতে হবে। একজনের ব্যাপারে যদি কোনকারণে ভিন্ন ফয়সালাও হয় তবে তা অপর জনের শাস্তির ক্ষেত্রে কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না।

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তই বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ যৌথ হত্যাকাণ্ডে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর ক্ষেত্রেই কিসাস সাব্যস্ত হবে। তার সহযোগী

www.pathagar.com

ব্যক্তির অবস্থার কারণে যদি ভিন্ন ফয়সালা হয়ে থাকে তবে তা অপর সহযোগীর বিচারে কোন প্রভাব ফেলবে না। কারণ একজনের ক্ষেত্রে তো কিসাস কার্যকর হওয়ার সকল শর্তাদি বিদ্যমান। মূলকথা হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রধান শর্ত তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।[১]

অথবা এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে, যদি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অমুকের আঘাতেই নিহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে এবং সে হত্যার ইচ্ছাতেই আঘাত করেছিল তাহলে ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে যে সংশয়ের অবকাশ থাকে তা মূলেই দূরীভূত হয়ে যায়। আমি মনে করি এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানীফার মতেও কিসাস প্রয়োগ করা জরুরী।[২]

(দুই) কোন কোন ফকীহ ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হওয়ার জন্যে এ শর্তারোপও করেছেন, হত্যাকাণ্ড হত্যাকারী নিজে সংঘটিত করতে হবে। যদি সে হত্যার কারণ ঘটে তাহলে তার উপর কিসাস কার্যকর হবে না। হত্যার কারণ হওয়ার অর্থ কোন ব্যক্তি যদি হত্যার জন্যে এমন সব আয়োজনের ব্যবস্থা করে যে আয়োজনের ফলেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। হত্যার নির্দেশদাতা এবং যে নির্দেশ পালন করে হত্যাকাণ্ড ঘটায় উভয়েই হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ছাড়া আরো নানা ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এখানে গুরুত্ব অনুযায়ী এক দু'টি অবস্থার আলোচনা করলাম মাত্র এবং এক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের মতভিন্নতাও উপস্থাপন করলাম।

হত্যার হুকুমদাতা এবং হত্যাকাণ্ড সংঘটকের অবস্থা সাধারণত দু'পর্যায়ের হতে পারে। ফকীহগণ এতে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

ক. এক অবস্থা হলো হুকুমদাতা ও হুকুম পালনকারীর মধ্যে বাধ্য করা ও জোর জবরদস্তির মতো কোন অবস্থা না থাকা। আর অপরটি হলো এমন ধরনের কোন বাধ্যকরণের মতো অবস্থা না থাকা মানে হত্যাকারীকে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে বাধ্য না করা।

---

১ বাদায়ে আস-সানায়ে, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৩৫-৩৩৬, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রূশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩২।

২ এটা যদি নিশ্চিত হয়ে যায় যে, হত্যা সহযোগীদের মধ্যে একজনের আঘাতেই আক্রান্ত ব্যক্তি নিহত হয়েছে, তাহলে অন্যান্য সহযোগীদের ক্ষেত্রে সরাসরি হত্যার অভিযোগই থাকে না। তখন তাদেরকে হত্যাকাঙ্ক্ষী, হত্যাকাণ্ডে উৎসাহদাতা সহযোগী এমন অপরাধে অভিযুক্ত করতে হবে। (অনুবাদক)

www.pathagar.com

প্রথম অবস্থায় ইমাম মালিক, শাফেয়ী, ছাওরী, আহমদ র. ও আরো কিছু সংখ্যক ফকীহর অভিমত হলো, যে প্রত্যক্ষ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে কিসাস তার উপর কার্যকর হবে এবং যে হত্যার নির্দেশ ও সঙ্গ দিয়েছে তাদের উপর তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। কিন্তু কোন কোন ফকীহ বলেন, কিসাস মদদদাতা ও হুকুম পালনকারী উভয়ের উপর কার্যকর হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে হুকুমদাতার হুকুম পালনকারীর উপর কর্তৃত্ব রয়েছে অথবা হুকুমদাতা যদি অপর কাউকে শক্তির প্রভাব বা জোর প্রয়োগ করে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে বাধ্য করে থাকে, ফকীহগণ এ ক্ষেত্রে তিন ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কোন কোন ফকীহ বলেন, হত্যার হুকুমদাতাকেই কিসাস স্বরূপ হত্যা করতে হবে এবং হুকুম পালনকারীর উপর তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। এমত ব্যক্ত করেছেন দাউদ জাহেরী, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ র.। ইমাম শাফেয়ী র. এরও উল্লেখিত মতের সমর্থনে একটি অভিমত রয়েছে। অন্য ফকীহগণ বলেন, হুকুমদাতা নয় হুকুমপালনকারীর উপর কিসাস বাস্তবায়ন করা হবে। কেননা হত্যাকাণ্ডটি সরাসরি তার দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। একথার সমর্থনেও ইমাম শাফেয়ীর আরেকটি অভিমত রয়েছে। ইমাম মালিক ও আরো কতিপয় ফকীহ বলেন, হত্যার হুকুমদাতা ও হুকুমপালনকারী উভয়কেই কিসাস স্বরূপ হত্যা করতে হবে।

এই মতভিন্নতার ভিত্তি হলো, যারা হুকুমপালনকারীকে কিসাস থেকে মুক্ত রাখতে চান, তারা নির্ভর করেন ওই দলীলের উপর যে দলীলে বলা হয়েছে, 'একজন আজ্ঞাবহ ব্যক্তি যে ব্যক্তির কোন স্বাধীনতা বা স্বকীয়তা নেই তার মতো।' একথাও তো সর্বজনবিদিত কাউকে আজ্ঞা পালনে বাধ্য করার দ্বারা অনেক দায়িত্ব রহিত করে দেয়।

আর যারা নির্দেশ পালনকারীকে কিসাস স্বরূপ হত্যার পক্ষে মত দিয়েছেন, তাদের দলীল হলো, এ ব্যক্তি একদিক থেকে স্বশাসিত অন্য দিক থেকে আজ্ঞাবহ। যেমন উপর থেকে নিচে নামার সময় একজন মানুষকে বাতাস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে ফেলে দেয়। যারা উভয়কেই কিসাস স্বরূপ হত্যার পক্ষে মতামত দিয়েছেন, তারা হুকুমপালনকারীকে জোর জবরদস্তির জন্যে অসহায় মনে করেন না, সেই সাথে হুকুমদাতাকে সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করার জন্যে নির্দেশদাতা মনে করেন না। আর যারা শুধু নির্দেশদাতাকে হত্যার পক্ষে তারা সরাসরি হত্যাকারীকে নিষ্প্রাণ অস্ত্রের সাথে তুলনা করেন। কেননা হুকুম পালনকারী, হুকুমদাতার হাতের খেলনা

www.pathagar.com

মাত্র। হুকুমদাতা যে হুকুম করে তার পক্ষে সেটি রদ করা সম্ভব হয় না। মালিকী ফকীহগণ তাদের মতের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে বলেন, এ ব্যাপারে তো সবাই একমত যে, কোন ব্যক্তি যদি ক্ষুধার জ্বালায় মরণাপন্ন হয় তবুও অন্য কোন মানুষকে হত্যা করে তার গোশত খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা বৈধ নয়।[১]

যেসব ফকীহ হত্যাকারী ও হুকুমদাতা উভয়কেই কিসাস স্বরূপ হত্যার পক্ষে, তাদের মতটি বর্তমানে প্রচলিত মিসরীয় তাযিরী আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মিসরীয় আইনে অপরাধীর সহযোগিতাকারীর জন্যে সেই শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে সরাসরি অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে যে শাস্তি দেয়া হয়। কোন অপরাধে উৎসাহিত করা, অপরাধের সমর্থন করা এবং সহযোগিতা করা একই ধরনের অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। হত্যার নির্দেশ দেয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত্যাকাণ্ডে উস্কানী দেয়ার সমার্থক। এর ভিত্তিতে আধুনিক আইনের পরিভাষায় হত্যার হুকুমদাতাকে হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীর সাথে যুক্ত মনে করা হয়।[২]

কোন কারণে হত্যাকারী রূপে গণ্য হওয়া

কারো হত্যার কারণ হওয়ার অবস্থা হলো, যেমন কোন ব্যক্তি কারো বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলো– সে হত্যা করেছে। এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর সাক্ষ্যদাতা তার দেয়া সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে বললো, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে হত্যা করানোর জন্যেই সে জেনে বুঝে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল। অথবা কোন বিচারক সন্দেহাতীতভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধ জেনেও তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলো। এরপর বিচারক স্বীকার করলো, দণ্ডিত লোকটিকে নিরপরাধ জেনেও সে জেনে-বুঝে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

এ অবস্থায় ফকীহগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। তাঁদের একদল বলেন, কারণগত হত্যার জন্যে যেমন মিথ্যা সাক্ষ্য অথবা মিথ্যা বিচার অথবা এ ধরনের অপরাধে হত্যার কারণ হলে এমন অপরাধীর উপর কিসাস ওয়াজিব

---

১ বিদায়াতুল মুজতাহিদ এবং নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩১-৩৩২; আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২১; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৩০-৩৩১।

২ দেখুন, আল-আহকামুল আম্মাতু ফি কানুনিন উকুবাত, ড. সাঈদ মুস্তফা সাঈদ, প্রকাশ : ১৩১৭ হি. মোতাবেক ১৯৫২ খৃ. পৃষ্ঠা-২৮৩; আল মাউসুআতুল জিনাইয়াহ, জুনদী আব্দুল মালিক, খণ্ড-১, ধারা-৬৭; জারায়িম ফিল উকুবাত, খণ্ড-১, ধারা-৬২৮-৬৩০।

www.pathagar.com

হবে না। কারণ এরা যদিও হত্যার উপাদান তৈরি করে কিন্তু উপাদান কাউকে নিহত হতে বাধ্য করে না। যেমন কোন ব্যক্তি অন্যকে গর্তে ফেলার জন্যে যদি গর্ত খোঁড়ে তাহলে সেই গর্তে নিপতিত হতে সে লোকদের বাধ্য করে না। তাছাড়া এই অবস্থাগুলোতে কিসাস বাস্তবায়নের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সমতা বজায় রাখাও সম্ভব নয়। কেননা, কিসাস বাস্তবায়ন করলে যে ব্যক্তি হত্যার কারণ হলো, সেতো সরাসরি মৃত্যুদণ্ডে নিহত হবে কিন্তু যে হত্যার কারণে সে অভিযুক্ত হয় সে কিন্তু সরাসরি সেই হত্যায় জড়িত ছিল না। ফকীহদের এ দলটি স্বেচ্ছায় সরাসরি হত্যাকাণ্ড এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার কারণের হত্যাকারীর মধ্যে পার্থক্য করেন। যদিও তারা মনে করেন, উভয় ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ড স্বেচ্ছায় ঘটেছে। পার্থক্য করার ফলে তারা প্রথম অবস্থায় কিসাস সাব্যস্ত করেন কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় কিসাস সাব্যস্ত করেন না।

অপর একটি দল বলেন, কারণগত হত্যাকারী সরাসরি ঘাতক রূপেই গণ্য এবং তার উপরও কিসাস কার্যকর হবে। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ র. এ মত ব্যক্ত করেন। তাদের প্রমাণ হলো, বর্ণিত অবস্থায় সাক্ষী বা বিচারক এমন ব্যবস্থা সম্পন্ন করে যার পরিণতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাণহানির শিকার হয়। তাই তাদের উপরও অনুরূপ কিসাস ওয়াজিব হবে যেরূপ হত্যাকারীর সাথে হত্যা করতে বাধ্যকারীরও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এই ফকীহগণ উদাহরণ স্বরূপ বলেন, কাসিম বিন আব্দুর রহমান সূত্রে বর্ণিত, হযরত আলী রা.-এর দরবারে দুই সাক্ষী এক ব্যক্তির চুরির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাতে হযরত আলী অভিযুক্তের হাত কেটে দেন। এরপর সাক্ষ্যদানকারীরা তাদের দেয়া সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে। হযরত আলী রা. তখন বলেন, "আমি যদি জানতে পারতাম তোমরা জেনে বুঝে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছো, তাহলে আমি তোমাদের হাত কেটে দিতাম।" যেহেতু তারা স্বেচ্ছায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে এর কোন প্রমাণ ছিল না তাই হযরত আলী তাদের উপর হাতের দিয়াত দেয়ার হুকুম জারী করেছিলেন। এই ঘটনা থেকে বুঝা গেল, হযরত আলীর দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে কারো হাত কাটানোর জন্যে যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে সে বরং এমন কাজের ইচ্ছা করলো যার পরিণতি হবে হাত কাটা। সেই পরিণতি যদি বাস্তবে ঘটে যায় তাহলে সেই ব্যক্তির উপরও কিসাস ওয়াজিব হবে। কারণ সে ইচ্ছাকৃতভাবে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির হাত কর্তনের কারণ হয়েছে। এছাড়া এটিও বিবেচ্য বিষয় যে, যেসব অপরাধে কিসাস ওয়াজিব হয় তাদের অধিকাংশের পিছনে কোন

www.pathagar.com

না কোন কারণ থাকে। এখন আমরা যদি প্রত্যক্ষ হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই শুধু কিসাস সীমাবদ্ধ রাখি আর পরোক্ষ হত্যাকারীর উপর কিসাস ধার্য না করি তাহলে ধূর্ত অপরাধীরা সরাসরি হত্যাকাণ্ডে জড়িত না হয়ে পরোক্ষ হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠবে ফলে কিসাসের বিধানটির কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাবে।[১]

সারকথা হলো, ইমাম আবু হানিফা র. ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুঘটক হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব বলে মনে করেন না। যদিও অধিকাংশ ফকীহ এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কিসাস ওয়াজিব বলে মনে করেন। গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের ফকীহদের সাথে আমিও একমত। কারণ যারা হত্যার কারণ ঘটে এদের দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়, তাই তারা সেই অস্ত্রের সাথে তুলনীয় যে অস্ত্রের দ্বারা সাধারণত হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকে। বস্তুত এ ধরনের অস্ত্রের দ্বারা যখন কোন হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় তখন অধিকাংশ ফকীহ কিসাস ওয়াজিব বলে মনে করেন।

নিহত ব্যক্তি যদি হত্যাকারীর অংশ হয়

নিহত ব্যক্তি যদি হত্যাকারীর অংশ হয় তথা হত্যাকারীর সন্তানের পর্যায়ভুক্ত হয়। যেমন পিতা বা পিতার সমতুল্য ব্যক্তি যদি সন্তানকে হত্যা করে। কিংবা হত্যাকারী যদি মা বা মায়ের সমতুল্য হয় তাহলে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম ছাওরী র. এর মতে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কিসাস নেয়া যাবে না। স্বভাবত এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটে না। স্বভাবত মা বাপ সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে থাকে কোন কারণ ছাড়া সন্তানকে কেউ হত্যা করতে পারে না। ফলে এমন হত্যাকাণ্ডে সংশয় দেখা দেয়। আর যে কোন ধরনের সংশয়ে কিসাস রহিত বা মওকুফ হয়ে যায়। যে কোনভাবে কিসাস রহিত হয়ে যাওয়ার সুবিধাটা হত্যাকারীর পক্ষে যায়। উপরন্তু পিতা যেহেতু সন্তানের জন্মগ্রহণের উৎস তাই সন্তান হত্যার কারণে উৎস হত্যার শিকার হবে না। অনুরূপ ফয়সালা মা, দাদা-দাদী, নানা-নানীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এরা সবাই

---

১ বাদায়ে আস্-সানায়ে, আল কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৯; আসনা আল মাতালিব, আবু ইয়াহয়া যাকারিয়া আল আনসারী আশ্ শাফেয়ী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫, প্রথম প্রকাশ : ১৩১৩ হিজরী, মাতবাআ আস্ সাআদাত, মিসর; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৫; তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানযুদ দাকায়েক, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৫; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা- ১২০।

www.pathagar.com

বাপ মায়ের সাথে তুলনীয় তাই সন্তান কিংবা নাতি-নাতনীর হত্যার কারণে তাদের কারো উপর কিসাস সাব্যস্ত হবে না।[১]

নিহতের উত্তরাধিকারীদের কেউ যদি হত্যাকারীর অধস্তন বংশধর হয় তাহলে হত্যাকারীর উপর কিসাস সাব্যস্ত হবে না। কেননা, হত্যাকারীর অধস্তন বংশধরের উপর কিসাস ওয়াজিব হয় না। কারণ কিসাস এমন এক শাস্তি যার কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া সম্ভব নয়। ফলে এধরনের মোকদ্দমায় নিহতের উত্তরাধিকারীগণ দিয়াত প্রাপ্য হবে।[২]

ইমাম মালিক র. বলেন, বাপ কিংবা দাদা যদি পুত্র অথবা নাতিকে তরবারী কিংবা লাঠি দিয়ে হত্যা করে এমতাবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হবে না। কিন্তু বাপ কিংবা দাদা যদি সন্তান বা নাতিকে শুইয়ে গলা কেটে হত্যা করে তাহলে তাদের উপর কিসাস অবধারিত হবে।[৩]

---

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৫; তাবঈনু হাকায়েক, শরহে কানযুদ দাকায়েক, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৫; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, ১২০।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৫।

৩ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, প্রথম প্রকাশ ১২২৯ হি. পৃষ্ঠা-৩৬ ও ৩৩৫; ইবনে রুশদ বলেন, ইমাম মালিক ও জমহুরের মতভিন্নতার কারণ হযরত আমর বিন শুয়ায়েব রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বনী মাসলাজের কাতাদা নামক এক ব্যক্তি তার ছেলেকে তরবারী দিয়ে আঘাত করলে তার রান কেটে যায় এবং ক্ষতস্থান থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ছেলেটি মারা যায়। এ ঘটনায় সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জায়শাম হযরত উমর বিন খাত্তাবের কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। একথা শুনে হযরত উমর রা. নিহতের ভাইকে একশ উট দিয়াত দিতে নির্দেশ দেন। এর মধ্যে ত্রিশটি উট-তিন বছর বয়সী। এ প্রসঙ্গে উমর রসূলুল্লাহ স. এর ফরমান উদ্ধৃত করেন, 'দিয়াতের মধ্য থেকে হত্যাকারী কোন অংশ পাবে না।'

ইমাম মালিক মনে করেন, এই হত্যাকাণ্ডটি ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড ছিল না। কারণ এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে পিতা কি ইচ্ছাকৃতভাবে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছিল না এমন কোন ইচ্ছা ছিল না? জামহুর মনে করেন, সেটি ছিল ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড। কারণ ফকীহদের সর্বসম্মত মতামত হলো, কেউ যদি কাউকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে এবং এই আঘাতে লোকটি মারা যায় তাহলে সেটিকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সাব্যস্ত করা হবে।' ইমাম মালিক বলেন, এমন অবস্থায় যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তা যদি সংশয় বা কোন বিভ্রান্তির কারণে ঘটে থাকে, তাহলে অনাত্মীয় হলে হত্যাকারীর উপর ইচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ আরোপ করা হয় ধারণার প্রাবল্যের কারণে, কেননা অনাত্মীয়ের প্রতি হত্যাকারীর তেমন কোন মমতা না থাকাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় হত্যাকারীর ইচ্ছা কি ছিল তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। পক্ষান্তরে ঘটনা যখন নিজের ছেলের ক্ষেত্রে ঘটে, তখন স্বভাবতই সন্তানের প্রতি পিতার মনে পিতৃস্নেহ

www.pathagar.com

যে নিহত ব্যক্তি পরিপূর্ণ নির্দোষ নয় তাকে হত্যাকারীর শাস্তি

কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা নিহত ব্যক্তি যদি আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নির্দোষ না হয় তাহলে তার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিসাস নেয়া যাবে না। যেমন কোন দেশের মুসলিম নাগরিক কিংবা অমুসলিম নাগরিক কোন বিদ্রোহী কাফের কিংবা ইসলাম ধর্মত্যাগী মুরতাদকে যদি হত্যা করে ফেলে অথবা কোন দেশপ্রেমিক নাগরিক যদি কোন দেশদ্রোহীকে হত্যা করে।[১] যেহেতু এসব নিহত ব্যক্তি নির্দোষ নয় তাই এদের হত্যার বিপরীতে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিসাসের বিধান কার্যকর হবে না। অনুরূপ কোন দেশদ্রোহী ব্যক্তি যদি কোন দেশপ্রেমিক নাগরিককে হত্যা করে তবে বিদ্রোহী নাগরিকের বিরুদ্ধেও কিসাসের বিধান কার্যকর করা যাবে না। কারণ দেশদ্রোহীর দৃষ্টিতে দেশপ্রেমিক নাগরিক নির্দোষ ব্যক্তি নয়। যদিও দেশপ্রেমিকের দেশদ্রোহিতা অযৌক্তিক, তার যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিহীন কিন্তু দেশদ্রোহী যদি প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তার ভিত্তিহীন যুক্তি ও ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ যুক্তির মর্যাদা দিতে হবে।[২]

ইমাম আবু হানিফা র. এবং ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, কোন মুসলিম নাগরিক যদি মুসলিম দেশে আশ্রয় গ্রহণকারী কোন পরদেশী অমুসলিমকে হত্যা করে তাহলে তাতে কিসাস কার্যকর হবে না। কেননা যদিও আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তি নির্দোষ কিন্তু তার নির্দোষ হওয়াটা সীমিত সময়ের জন্য, চির দিনের জন্য তার রক্ত নির্দোষ নয় এবং সে আজীবনের জন্যে নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রাপ্তও নয়, ফলে তার রক্ত মুসলিম রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকের রক্তের মর্যাদা রাখে না, যে একজনের প্রতিদান অপরজনের কাছ থেকে সমপরিমাণ নেয়া হবে। যেহেতু আশ্রয়প্রাপ্ত অমুসলিম লোকটি পুনর্বার অমুসলিম রাষ্ট্রে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা রাখতো, ফলে অমুসলিম দেশে ফিরে যাওয়ার পর তার কুফরী তাকে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করবে-এর সমূহ সম্ভাবনা ছিল,

---

বিদ্যমান, তাছাড়া সন্তানের শিষ্টাচার শিক্ষার দায়িত্বও তার উপর রয়েছে। এ কারণে অনাত্মীয় ব্যক্তির মতো এক্ষেত্রে বাবাকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী সাব্যস্ত করা যাবে না। এই যুক্তিতে ইমাম মালিক এই হত্যাকাণ্ডকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড মনে করেন না। উক্ত কিতাবে জাহেরী মতাবলম্বীদের মতামত উক্ত করে বলা হয়েছে, জাহেরীদের মতে আইনের দাবী হলো, এটিকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সাব্যস্ত করে পিতার উপরও কিসাস প্রয়োগ করা।

১ বাদায়ে আস্‌সানায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৩৬।

২ বাদায়ে আসসানায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৩৬।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় একজন সাময়িক আশ্রয় ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিমের অস্তিত্বের মধ্যে মুসলিম নাগরিকের নিরাপত্তাহীনতার শঙ্কা বিদ্যমান থাকে। এই সংশয় ও সন্দেহের কারণে এ ধরনের ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে কোন মুসলিম নাগরিকের উপর কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেন, এমতাবস্থায় হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিসাস কার্যকর হবে। কেননা অপরাধ সংঘটনের সময় নিহত ব্যক্তি নিরপরাধ ছিল, সে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করছিল। সে যেহেতু নিরাপত্তার অনুমোদন নিয়েই মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিল সেহেতু সে নিরপরাধ।[১] গ্রন্থকার বলেন, আমার কাছে আবু ইউসুফ র.-এর মতামত বেশি যৌক্তিক এবং গ্রহণযোগ্য।

ইমাম মুহাম্মদ র. থেকে বর্ণিত আছে, কোন নিরাপত্তা গ্রহণকারী যদি একজন অপরজনকে হত্যা করে তবে তাদের মধ্যে কিসাস কার্যকর হবে না।[২]

রক্তমূল্যে অসমতা

কিসাস কার্যকরী হওয়ার শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত হলো, নিহত ও হত্যাকারীর রক্ত সমমূল্যের হওয়া অর্থাৎ হত্যাকারী ও নিহতের ব্যক্তি মর্যাদা ও জীবনের মূল্য আইনের দৃষ্টিতে সমপর্যায়ের হওয়া। ফকীহগণ হত্যাকারী ও নিহতের রক্তের অসামঞ্জস্যতার চারটি উপাদান নির্ধারণ করেছেন–

(ক) ইসলাম ও কুফর অর্থাৎ একজন মুসলমান অপরজন কাফের হওয়া;
(খ) স্বাধীন ও পরাধীন তথা একজন আযাদ ও অপরজন গোলাম হওয়া;
(গ) লিংগের তারতম্য, একজন পুরুষ অপর জন নারী হওয়া;
(ঘ) এক পক্ষে একজন বিপরীতে বহুজন হওয়া।

উল্লেখিত চারটি ব্যাপারে যদি হত্যাকারী ও নিহতের মধ্যে কোন গরমিল না থাকে সমতা থাকে তাহলে সর্বসম্মতভাবে কিসাস কার্যকর হবে। কিন্তু উল্লেখিত চারটি উপাদানের কোন একটিতে যদি ব্যতিক্রম পাওয়া যায় তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে কি না এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

---

১ আস-সারাখসী, খণ্ড-২৬, মাতবায় আস্‌সায়াদাত, কায়রো, পৃষ্ঠা-১৩১; আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৩৬; শরহে ফাতহুল কাদীর, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৫৭, প্রথম সংস্করণ, ১৩০৮ হিজরী, মাতবায়া আমীরিয়া, বোলাক, মিসর; শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০২-১০৫।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৩৬।

www.pathagar.com

১. কোন মুসলিম যদি কোন অমুসলিমকে হত্যা করে তবে কোন কোন ফকীহর দৃষ্টিতে এমতাবস্থায় কিসাস আইনে হত্যাকারী মুসলিমকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। এ মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম শাফেয়ী, দাউদ জাহেরী, ইমাম ছাওরী, ইমাম আহমদ র.। অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, এমতাবস্থায় হত্যাকারী মুসলিমকে কিসাসের আইনে হত্যা করা হবে তথা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। ইমাম আবু হানিফা র. ও তাঁর অনুসারী সহযোগীরা এবং ইবনে আবু লায়লা এ মতের ধারক।

ইমাম মালিক এবং লাইছ ইবনে সাদ র. বলেন, মুসলিম হত্যাকারীকে অমুসলিম নাগরিক হত্যার জন্যে হত্যা করা হবে না, যদি না মুসলিম নাগরিক অমুসলিম ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যা করে থাকে। তাদের কাছে নির্মমতার অর্থ হলো, শুইয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করে হত্যা করা এবং যদি হত্যাকারীরা অমুসলিমের ধন-সম্পদ কব্জা করার জন্যে হত্যা করে থাকে।

যারা কিসাসের আইনে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দানের বিরুদ্ধে তারা হযরত আলী রা.-এর রেওয়ায়েত থেকে দলীল গ্রহণ করেন, যেখানে বলা হয়েছে, 'কোন কাফেরের বিপরীতে মুমিনকে হত্যা করা হবে না।' এই হাদীসটি আমর ইবনে শুআইবও তার পিতা ও দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা র. ও তাঁর সহমত পোষণকারীগণ একটি ঘটনাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেখানে রসূলুল্লাহ স. নিজে একজন অমুসলিম যিম্মীকে হত্যার বিপরীতে একজন মুসলমানকে কিসাসস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তা কার্যকর করেন। সেই সাথে রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'আমার ক্ষেত্রে খুবই সমীচীন আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা রক্ষা করা'। এই হাদীসটি হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত। এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, কোন মুসলিমকে কাফেরের বিপরীতে হত্যা করা যাবে না বলে রসূলুল্লাহ স.-এর কথার মধ্যে যদিও কাফের শব্দটি অনির্দিষ্ট ও ব্যাপক অর্থবোধক, উল্লেখিত দ্বিতীয়টি দ্বারা পূর্বের ব্যাপকার্থক কাফের শব্দটিকে 'হরবী' কাফের তথা মুসলিম বৈরী কাফের অর্থে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ফলে চুক্তিবদ্ধ যিম্মি কাফের যে মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয়প্রাপ্ত সে এই নির্দেশের আওতামুক্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া আবু হানিফা র. প্রমাণ স্বরূপ বলেন, কোন আশ্রয়প্রাপ্ত

www.pathagar.com

অমুসলিম তথা যিম্মির সম্পদ যদি কোন মুসলিম চুরি করে তাহলে এই চুরির অপরাধে মুসলিমের হাত কাটার প্রশ্নে সকল ফকীহ একমত। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। বস্তুত কিসাসের দাবি হলো, কোন যিম্মির সম্পদ যদি মুসলমানের সম্পদের মর্যাদা পায় তবে তার জীবন ও মুসলমানের জীবনের মতো মর্যাদা পাওয়াটাই যৌক্তিক।

গ্রন্থকার বলেন, এক্ষেত্রে আমার কাছে ইমাম আবু হানিফা র. ও তাঁর সমমনাদের অবস্থানই সঠিক মনে হয়। কারণ যিম্মির জীবন সম্পদের যদি সুরক্ষায়ই নিশ্চিত না হবে তবে আশ্রয় চুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া যিম্মিরা দারুল ইসলাম তথা মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক। নাগরিক হওয়ার সুবাদে তারাও সেই সুবিধাদি পাবে।

২. কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে হত্যা করে তবে কোন কোন ফকীহর মত হলো, নারীর বিপরীতে পুরুষ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে না। এই মতটি জমহুরে ফুকাহর মতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জমহুর বলেন, কোন নারী কর্তৃক কোন পুরুষ নিহত হলে যেভাবে নারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় অনুরূপ পুরুষকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। জমহুর বলেন, নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মানুষ হিসেবে নারী আর পুরুষ সমান এবং একই মর্যাদা সম্মান ও নিরাপত্তার অধিকারী।

৩. কয়েকজন মিলিতভাবে যদি একজনকে হত্যা করে দাউদ ও জাহেরী মতাবলম্বীদের মতে একজনের মৃত্যুর বিপরীতে কয়েকজনকে হত্যা করা যাবে না; কেননা কুরআনুল কারীমে 'জীবনের মোকাবেলায় জীবন' বলা হয়েছে। জমহুরে ফুকাহা এই মতকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা বলেন, বহুজন কর্তৃক একজন নিহত হলেও একজনের বিপরীতে বহুজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। হযরত উমর রা. এ মতের পক্ষে ছিলেন। সুনাআ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তিনি উক্তি করেছিলেন, 'এই হত্যাকাণ্ডে যদি সুনাআ'র সব অধিবাসীও জড়িত থাকতো তাহলে ওই একজনের মোকাবেলায় আমি সুনাআ গোত্রের সবাইকে হত্যা করতাম।' একজনের হত্যাকাণ্ডে জড়িত বহুজনকে হত্যার বিষয়টি আইনও দাবী করে। কেননা ইসলামী শরীয়ত অন্যায় হত্যাকাণ্ড রোধ করার জন্যেই কিসাসের বিধান করেছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন, 'হে বিবেকবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরা, কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন।' একজনের হত্যাকাণ্ডে জড়িত একাধিক হত্যাকারীকে যদি

www.pathagar.com

কিসাসের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়, অথবা কিসাস রহিত করে দেয়া হয় তাহলে অপরাধীরা সংঘবদ্ধভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে কিসাস থেকে রেহাই পেয়ে যাবে, ফলে শরীয়ত প্রণেতা যে লক্ষ্যে কিসাসের বিধান দিয়েছেন সেই উদ্দেশ্যই অকার্যকর হয়ে যাবে।[১]

গ্রন্থকার বলেন, আমার দৃষ্টিতে জমহুরে ফুকাহার অভিমত বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ হত্যাকারী যখন একাধিক থাকে, তখন যাচাই করলে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের মধ্যে হত্যাকাঙ্ক্ষা পাওয়া যায় এবং সবার সম্মিলিত ইচ্ছার কারণেই নিহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। এমতাবস্থায় পৃথকভাবে প্রত্যেকের মধ্যে কিসাস প্রয়োগের শর্ত বিদ্যমান থাকে, ফলে স্বতন্ত্রভাবে বিচার্যের ক্ষেত্রে তার সাথে আরো সহযোগী ছিল এই কারণে ক্ষমা করা যাবে না। কারণ একাধিক লোকের সংশ্লিষ্টতা অপরাধ সংঘটনকে আরো শক্তি যোগায়, অপরাধ কর্ম সহজ হয়, ফলে এ ধরনের ঘটনায় এমন কঠোর শাস্তি দরকার যে শাস্তি হত্যাকাণ্ডের মতো সংঘবদ্ধ অপরাধ করা থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারে।

রক্তপণের ক্ষমা

কিসাসের দাবি করা নিহতের উত্তরাধিকারীদের হক। ফলে রক্ত মূল্য ক্ষমা করে দেয়ার ক্ষমতাও তাদেরই। তারা ইচ্ছা করলে রক্তপণ নিয়ে ক্ষমা করতে পারে নয়তো রক্তপণ ছাড়াও ক্ষমা করতে পারে। সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত, নিহতের উত্তরাধিকারীরা যদি হত্যাকারীর কিসাস ক্ষমা করে দেয় তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এ প্রেক্ষিতে বলেন,

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ○

'হত্যাকারীর সাথে যদি তার ভাই কোন ধরনের ক্ষমা প্রদর্শনে সম্মত হয় তবে যথাযথ বিধি অনুসরণ করা এবং সততার সাথে রক্তপণ আদায় করা উচিত।'

(সূরা আল-বাকারা : আয়াত ১৭৮)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে কিসাস ওয়াজিব যদি না নিহতের উত্তরাধিকারীগণ তা ক্ষমা করে দেয়।'

---

[১] হত্যাকারী ও নিহতের রক্তে সমতা, এর শর্তাবলি, প্রতিটি শর্তের বিশদ বর্ণনা ও বিস্তারিত প্রমাণ এবং এ সম্পর্কে ফকীহগণের মতামত জানার জন্যে দেখুন, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৩-৩৩৫, আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১৯-২২০।

www.pathagar.com

নিহতের উত্তরাধিকারীগণ যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে বিচারক হত্যাকারীর উপর কিসাস প্রয়োগ করতে পারেন না। কেননা ক্ষমা অবশ্যম্ভাবীরূপে কিসাস রহিত করে দেয়; এক্ষেত্রে রক্তপণের বিনিময়ে ক্ষমা করুক বা রক্তপণ ছাড়াই ক্ষমা করুক তা কিসাস মওকুফের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলে না।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয়, নিহতের উত্তরাধিকারীগণ যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে হত্যাকারীকে কি কোন ধরনের শাস্তি ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হবে, না শাস্তি দেয়া হবে?

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যা

ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের কোন অস্তিত্ব আদৌ আছে না নেই এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এমন হত্যাকাণ্ড যা ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড ও ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের মাঝামাঝি এটাকে বলা হয় ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ড। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ছাড়াও আরো অনেক ফকীহ এ ধরনের হত্যার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত উমর, আলী, উসমান, যায়েদ ইবনে সাবিত এবং আবু মূসা আশআরী রা. ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের অস্তিত্বের পক্ষে। এ ব্যাপারে কোন সাহাবী তাদের বিরোধিতা করেননি। ইমাম মালিক র. সম্পর্কে বলা হয়, তিনি এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অবশ্য পিতা কর্তৃক সন্তান নিহতের ব্যাপারটিতে তিনি ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের অস্তিত্বের সমর্থক, এর সংগার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, লোহার ধারালো অস্ত্র ছাড়া লোহার বড় লাঠি, আগুন অথবা এধরনের কোন কিছু দিয়ে যে হত্যাকাণ্ড ঘটে এটিই ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সদৃশ। তাঁর দৃষ্টিতে এমন জিনিস যা শরীরে বিদ্ধ হয় না এবং শরীর কাটে না কিন্তু সাধারণত এসব জিনিসের আঘাতে মানুষ মারা যায় তাই ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, যে সব জিনিসের দ্বারা সাধারণত হত্যাকাণ্ড ঘটে না; যদি এসব জিনিসের আঘাতে মৃত্যু ঘটে তাহলে সেটিকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সদৃশ বলা হয়। ভিন্নভাবে বলা যায়, হত্যাকাণ্ডে এমন জিনিস ব্যবহার করেছে যেগুলো দিয়ে সাধারণত হত্যাকাণ্ড ঘটে না তাহলে সেটিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ বলা হয়।

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, আঘাত ইচ্ছাকৃত হলেও হত্যাকাণ্ডটি ভুলবশত হয়ে গেছে এমন হত্যাকে ইচ্ছাকৃত সদৃশ হত্যাকাণ্ড বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে নিহতকে হত্যাকারীর মারধোর করার ইচ্ছা ছিল হত্যার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু ভুলক্রমে মৃত্যু ঘটে গেছে। ইমাম শাফেয়ী র.-এর দৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত হত্যা সেটিকে বলা হবে যাতে কর্মের পরিণতি ও ইচ্ছা উভয়টিতে কর্তার একই আকাঙ্ক্ষা থাকে। আর ভুল হত্যাকাণ্ড সেটিকে বলা হয় যাতে কর্ম ও পরিণতি উভয়টির কোনটিতেই হত্যার ইচ্ছা না থাকে।

www.pathagar.com

দৃশ্যত তাই বোঝা যায়, হত্যাকাণ্ডে যে ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এর ভিত্তিতেই হবে ফয়সালা। সেই সাথে যে পরিস্থিতিতে মৃত্যু ঘটেছে এর উপরও ফয়সালা নির্ভর করবে।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রের উপর ভিত্তি করে ফয়সালা হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী র. হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীর ইচ্ছার ভিত্তিতে ফয়সালা হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি হত্যাকাণ্ডের পর্যায় নির্ধারণও হত্যাকারীর নিয়তের ভিত্তিতে হবে বলে মনে করেন।

এতো গেলো সংগার ব্যাপারে মতভিন্নতা। যেসব দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে ফকীহগণ হত্যার এই পর্যায় নির্ধারণ করেছেন এখন সেগুলোর আলোচনা করা যায়। যারা হত্যার এই প্রকারভেদ অস্বীকার করেন, তাদের দলীল হলো, হয় হত্যাকারীর হত্যার ইচ্ছা ছিল নয়তো ছিল না। যদি হত্যার ইচ্ছায় আঘাত করে থাকে তাহলে সেটি ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড আর যদি ইচ্ছা না করে থাকে তাহলে সেটি ভুলবশত হত্যাকাণ্ড। এই দু'টির মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের আদৌ কোন অবকাশ নেই। যারা এটা স্বীকার করেন, তাদের কথা হলো, হত্যাকারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয়টি একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। একজন বিচারক বাহ্যিক বিষয়াবলি পর্যালোচনা করে বিচার করেন। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন অস্ত্র ব্যবহার করে যে অস্ত্র দ্বারা সাধারণত হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে হত্যার ইচ্ছায়ই সে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছে। ফলে তাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা হবে। কিন্তু কেউ যদি এমন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে যা দ্বারা সাধাণত মৃত্যু ঘটে না, তাহলে বিষয়টি ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলক্রমে হত্যার মাঝামাঝি পর্যায়ভুক্ত হবে। সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাতের আগে হুমকি ধমকী দিয়ে থাকে তবে সেটি ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ। যদি বিবেচনা করা হয় এভাবে যে, সে যে অস্ত্র ব্যবহার করেছে তা দিয়ে সাধারণত হত্যাকাণ্ড ঘটে না তবে সেটি ভুল হত্যাসদৃশ হবে। তখন এর ব্যাখ্যা হবে হত্যার ইচ্ছা তার ছিল না কিন্তু তার ইচ্ছা না থাকার পরও মৃত্যু ঘটে গেছে। এ মতের সমর্থনে একটি হাদীসও পাওয়া যায়।

হাদীসে বলা হয়েছে, 'খবরদার, ভুলবশত হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সদৃশ। ভুল হত্যার দিয়াত খুবই কঠিন। অর্থাৎ দিয়াত হিসেবে একশ এমন উটনী দিতে হবে যেগুলোর পেটে বাচ্চা আছে।' কিন্তু হাদীস বিশারদদের দৃষ্টিতে এই হাদীসটি মুযতারাব এবং সনদের দিক থেকেও মজবুত নয়। এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে ইবনে আব্দুল বার আলোচনা করেছেন, যদিও আবু দাউদ ও অন্যরা এটি সংকলন করেছেন।[১]

ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যার উদাহরণ

উপরের আলোচনার পর বলা যায়, যারা ভুলবশত হত্যাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশের সমর্থক তাদের দৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ড সেটি; যাতে হত্যাকারী এমন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিল যার দ্বারা সাধারণত মৃত্যু ঘটে না। যেমন হাত দ্বারা অথবা ছোট কোন ডাণ্ডা অথবা চাবুক দিয়ে আঘাত করেছিল কিন্তু অব্যাহত ভাবে আঘাত করেনি এবং একটি বা দুটি আঘাত করেছিল। এমন আঘাতে যদি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তাহলে এটিকে আকস্মিক মৃত্যু কিংবা ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যাকাণ্ড বলা হয়।[২]

পা দিয়ে যদি লাগাতার আঘাত করতে থাকে এমতাবস্থায় যদি মার খাওয়া ব্যক্তি মারা যায় তবে এটিকেও ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হত্যা বলা হবে।[৩] ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে, যেসব অস্ত্র ধারালো নয় এবং যেগুলো মানুষের শরীরে বিদ্ধ হয় না, এমন অস্ত্রের আঘাতে মারা গেলে এ মৃত্যুকে ইচ্ছাকৃত সদৃশ হত্যাকাণ্ড বলা হবে। যেমন বড় কোন লাঠি, পাথর কিংবা ডাণ্ডা। অথবা ধারালো অস্ত্রের পিঠের দিক দিয়ে আঘাত করা।[৪] ধারালো অস্ত্রের পিঠের দিক

---

১ বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩২-৩৩৩; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২১; তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০০-১০১।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৩। তিনি লিখেছেন, প্রথমত ফকীহগণ যে ব্যাপারে একমত তা হলো– ছোট ধরনের কোন লোহার ডাণ্ডা, পাথর অথবা চাবুক দিয়ে যদি আঘাত করে যেগুলোর আঘাতে সাধারণত মৃত্যু ঘটে না। অবশ্য প্রহার যদি এক বা দু'বার করে থাকে, অব্যাহত প্রহার না করে থাকে। তিনি ২৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, ইচ্ছাকৃত এক বা দু'বার প্রহারে যদি হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। কেননা এ ধরনের দু'একটি প্রহারে হত্যার ইচ্ছা থাকে না। আদব ও শিষ্টাচার শেখানোর ইচ্ছাই থাকে। ফলে এতে সংশয় দেখা দেয়। বস্তুত সংশয় দেখা দিলে কিসাস রহিত হয়ে যায়।

৩ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৩৩। তিনি লিখেছেন, ছোট ধরনের চাবুক দিয়েও যদি এক নাগাড়ে পেটাতে থাকে আর তাতে মৃত্যু ঘটে যায় তবে সকল ফকীহদের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এটি ইচ্ছাকৃত সদৃশ ভুল হত্যাকাণ্ড বলে সাব্যস্ত হবে।

৪ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৩। তিনি লিখেছেন, এক্ষেত্রে হত্যাকারীর হত্যার সংকল্প ছিল, তাই সে এমন অস্ত্র ব্যবহার করেছে যা দ্বারা সাধারণত হত্যাকাণ্ড ঘটে। অস্ত্রটি

www.pathagar.com

দিয়ে আঘাতে মৃত্যু হলে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী র.-এর দৃষ্টিতে সেটি ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে।[১]

ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের পরিণতি

যারা হত্যার প্রকারকে স্বীকার করেন না, তাদের দৃষ্টিতে আলোচিত সবগুলোই ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড, তাই সবগুলোতেই কিসাস ওয়াজিব। আর যারা হত্যার এই প্রকারের পক্ষে তাদের দৃষ্টিতে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কঠিন দিয়াত (Hard Blood Money) ওয়াজিব।[২] সেই সাথে হত্যাকারী নিহতের মীরাস থেকেও বঞ্চিত হবে।[৩] অবশ্য এ ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কাফফারাও দেয়া আবশ্যিক কি-না।[৪] তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কিসাস ওয়াজিব হবে না।[১]

শুধুই ক্ষত সৃষ্টিকারী কিংবা থেতলে দেয়ার মতো নয়। যেমন হাতুড়ী, বড় পাথর বা বড় ধরনের ডাণ্ডা। ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে এটিও ইচ্ছাকৃত ভুল হত্যাকাণ্ড সদৃশ।

১ শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০৯।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৫১; তাবঈনুল হাকায়েক, শারহুল কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০১। তিনি লিখেছেন, এতে গোনাহ ও কাফফারা রয়েছে কিন্তু কিসাস নেই তবে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩২-৩৩৩; আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২১; মুগাল্লাযা দিয়াত তথা পূর্ণ দিয়াতের ব্যাখ্যায় আল মাওয়ারদী লিখেছেন, সোনা রুপার মধ্যে দিয়াতে মুগাল্লাযার অর্থ হলো, এর দিয়াতের পরিমাণ ৩৩% বৃদ্ধি করা। দিয়াত যদি উট দিয়ে করা হয় তাহলে তাতে তিন বছর বয়সী উট ৩০টি, চার বছর বয়সী হবে ৩০টি এবং ৫০টি উট দিতে হবে পাঁচ বছর বয়সী যেগুলো গর্ভধারণ করেছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, কঠোর দিয়াত শুধু উটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সোনা রুপার ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রযোজ্য হয় না। বরং ইচ্ছাকৃত, ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশের দিয়াতও ভুল হত্যাকাণ্ডের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ এক হাজার দিনার অথবা দশ হাজার দিরহাম দিয়াত হিসেবে দিতে হবে। দিয়াতের এই অংক তখনকার সময়ের হিসেব অনুযায়ী। বর্তমানের প্রেক্ষিতে এই অংক ও পরিমাণ পরিবর্তিত হবে। বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৬।

৩ তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০৩, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৫১।

৪ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৫১; শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০৩। তিনি লিখেন, এই ধরনের হত্যাকাণ্ডে কাফফারা ওয়াজিব। কেননা এটিও প্রকারান্তরে

www.pathagar.com

আধুনিক আইনের সাথে শরয়ী আইনের পার্থক্য

আমরা আগেই বলেছি, ইমাম শাফেয়ী র. এর দৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সেটিই যাতে হত্যাকারীর নিহতকে আঘাতের ইচ্ছা ছিল বটে কিন্তু হত্যার কোন ইচ্ছা ছিল না। ইমাম যাইলাঈ র. কানযুদ্দাকায়েক এর ভাষ্যগ্রন্থে বলেন, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে যে আঘাতের দ্বারা মৃত্যু ঘটে সেই কর্মটি করার ইচ্ছা থাকে বটে কিন্তু হত্যা করার ইচ্ছা থাকে না। এই হত্যাকাণ্ডটি আধুনিক আইনের সেসব ধারার অনুরূপ যেসব ধারাতে এ ধরনের আঘাতের অপরাধের কথা বলা হয়েছে, যে আঘাতে হত্যার ইচ্ছা না থাকলেও মৃত্যুর কারণ ঘটে মিসরীয় আইনে এটি দণ্ডবিধির ২৩৬ দফা হিসেবে চিহ্নিত।[২]

ভুল হত্যাকাণ্ড। ফলে এটিও ভুল হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন ফকীহ বলেন, আবু হানিফা র.-এর দৃষ্টিতে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কাফফারা ওয়াজিব নয়।

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৪। তিনি লিখেন, একটি প্রহার বা দু'টি প্রহারে যদি মৃত্যু হয় তাহলে হত্যার ইচ্ছা থাকলেও কিসাস ওয়াজিব হবে না। কেননা এক বা দু'বার প্রহারে সাধারণত মৃত্যু ঘটে না। এ ধরনের প্রহারে সাধারণত আদব শিক্ষা দেয়াই উদ্দেশ্য থাকে। ফলে এতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ দেখা দেয়। আল-কাসানী আরো লিখেছেন, আমাদের অনেক সঙ্গীর মতামত হলো, হালকা অস্ত্র দিয়ে একাধারে প্রহার করলেও কিসাস ওয়াজিব হবে না। আস-সারাখসী, খণ্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১২২-১২৪। তিনি লিখেন, কেউ যদি বড় পাথর দিয়ে অথবা মোটা কাঠ দিয়ে কাউকে হত্যা করে তবে ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী র.-এর মতে কিসাস ওয়াজিব হবে।

২ মিসরীয় আইনের তাযিরী দফাটির ভাষা এরূপ, ' কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আহত করে কিংবা প্রহার করে অথবা কাউকে ক্ষতিকর কোন জিনিস দেয় কিন্তু এতে তার ক্ষতি করার ইচ্ছা ছিল না তবুও মৃত্যু ঘটে গেল এমতাবস্থায় অপরাধীকে তিন বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেয়া যাবে। উল্লেখিত শব্দগুলো দ্বারা বোঝা যায়; হত্যার উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু কাজটি সে ইচ্ছাকৃত ভাবেই করেছিল যার পরিণতিতে মৃত্যু ঘটে গেল।

www.pathagar.com

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ভুল হত্যাকাণ্ড

কোন কোন সময় লোকজন কোন বৈধ কাজে লিপ্ত থাকে কিন্তু জরুরী সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে অসতর্কতাবশত লোকজনের মৃত্যু ঘটে যদিও এতে কাউকে হত্যা করার আদৌ কোন ইচ্ছা থাকে না। এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে ভুল হত্যাকাণ্ড বলে।[১] ভুল হত্যাকাণ্ড তিন প্রকার। যথা–

১. **কর্মেভুল :** যেমন কোন ব্যক্তি পাখি মারার জন্যে বন্দুক চালাল, কিন্তু লক্ষভ্রষ্ট হয়ে গুলীতে কোন লোক নিহত হলো। এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে অপরাধী কাজের মধ্যেই ভুল করে। ফলে এটিকে কর্মে ভুল বলে অভিহিত করা হয়।[২]

২. **সংকল্পে ভুল :** যেমন ভুলবশত কোন মানুষকেই শিকার মনে করে গুলী চালিয়ে দিল অথবা কোন মুসলমান নাগরিককে শত্রুপক্ষের লোক মনে করে ভুলবশত হত্যা করে ফেললো। এমতাবস্থায় অপরাধীর ভুল কাজে হয়নি। কারণ সে যাকে মারতে চেয়েছিল সে তাকেই আঘাত করেছে কিন্তু তার ধারণা ও আন্দাজের মধ্যে ভুল হয়েছে। ফলে এটিকে সংকল্পে ভুল বলে অভিহিত করা হয়।[৩]

---

১ শরহে কান্য, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০১। এতে তিনি লিখেছেন, এই হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যার অপরাধে অপরাধী নয় বরং সে অসর্তকতা ও অবহেলার অপরাধে অপরাধী। কেননা বৈধ ও হালাল কাজ অপরের কোন ক্ষতি না হওয়ার শর্তে করা যায়। তদুপরি যদি কারো কোন ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে বোঝা যাবে অভিযুক্ত ব্যক্তি অসতর্কতার অপরাধে অপরাধী। আল-কাসানী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৫২। তিনি লিখেছেন, সতর্কতা ও সাবধানতার প্রচেষ্টা দ্বারা ভুল হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২০; আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৫৭।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৪। শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০১। এতে তিনি লিখেন– সংকল্পে ভুলের অর্থ হলো, কোন মানুষকে শিকার মনে করে কিংবা কোন মুসলমানকে শত্রু মনে করে তীর নিক্ষেপ বা গুলী করা। এতে তার কাজে কোন ভুল হয়নি। কেননা সে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে কিন্তু ভুল হয়েছে সংকল্পে। কারণ একজন মুসলমানকে শত্রু মনে করেছে অথবা একজন মানুষকে শিকার মনে করেছে।

৩ শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০১। এতে তিনি লিখেছেন, ইচ্ছা ও কর্ম উভয়টিতেই সে ভুল করেছে। যেমন, কোন মানুষকে শিকার মনে করে তীর ছুঁড়েছে, তীরবিদ্ধ করেছে।

www.pathagar.com

৩. **সংকল্প ও কর্মে ভুল :** উপরে উল্লেখিত দুটি ভুলের সমন্বয়ে তৃতীয় যে ভুলটি হয় তা হলো সংকল্প ও কর্ম উভয়টিতেই ভুল। যেমন শিকারী কাউকে হত্যা করার জন্যে গুলী চালাল। কিন্তু গুলী গিয়ে লাগল অপর কোন ব্যক্তির গায়ে, এমতাবস্থায় কর্ম ও সংকল্প উভয়টিতেই ভুল হয়েছে। কেননা সে একজন মানুষকে লক্ষ্য করে গুলী চালিয়েছে এটি সংকল্পের ভুল, সেই সাথে যাকে লক্ষ্য করে গুলী চালাল গুলী তাকে বিদ্ধ না করে আঘাত হানলো অন্য কোন ব্যক্তিকে, এটি কর্মের ভুল। এ প্রকারের ভুলের মূল ভিত্তি হলো মানুষ একই সাথে অঙ্গ ও বিবেকের দ্বারা কাজ করে, তাই এই দুটির মধ্যে বা কোন একটির মধ্যে ভুল করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।[১]

ভুল হত্যার বিধান

ভুল হত্যায় কিসাস ওয়াজিব হয় না, কারণ এটি ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নয়।[২] কিন্তু (Blood Money) রক্তপণ ও কাফফারা (money expiation) ওয়াজিব।[৩] সেই সাথে হত্যাকারী নিহতের মীরাস ও অসীয়ত থেকেও বঞ্চিত হয়।[৪]

---

১ শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০১।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৫২। শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০১। এতে ইমাম যাইলাঈ লিখেছেন, তাতে কাফফারা ও দিয়াত উভয়টি ওয়াজিব হবে। দিয়াত দিতে হবে মৃতের বংশধর, উত্তরাধিকারী ও খান্দানকে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'একজন মুমিন গোলাম আযাদ করা এবং নিহতের পরিবারকে পূর্ণ দিয়াত দেয়া।' হযরত উমর রা. তিন বছর এই বিধান কার্যকর রাখেন তাতে কোন সাহাবী ভিন্নমত পোষণ করেননি। ফলে এতে সর্বসম্মত ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে। আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২০০। আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৫৭-২৫৮।

৩ আস-সারাখসী, খণ্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৮২। তিনি লিখেন, কাফফারা এক দিক থেকে ইবাদত আবার অন্যদিক থেকে জরিমানা। মুবাহ ও হারামের মাঝামাঝি এর কারণগত অবস্থান। নিরেট মুবাহর উদাহরণ হলো, বৈধভাবে কাউকে হত্যা করলে সেটি কাফফারার কারণ হয় না। অনুরূপ নিরেট হারামের ক্ষেত্রে কাফফারা শুধু ভুল হত্যার বেলায় হয়ে থাকে। কেননা, ভুল হত্যার মূল কর্মটি হালাল থাকে। ভুলবশত কর্মটির পরিণতি যেখানে পতিত হয় সেটি থাকে হারাম।

৪ উল্লেখ্য, ১৯৪৩ সালে জারী করা মিসরের উত্তরাধিকার আইনের ধারা ৭৭-এ ইমাম মালিক র. এর মতামতকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ভুল হত্যাকাণ্ডের বিচারে হত্যাকারীকে নিহতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। অনুরূপ ১৯৪৬ সালে জারীকৃত মিসরীয় মীরাসী আইনের ধারা ৭১ এ ইমাম মালিক র. এর মতামত অনুসরণ করে ভুল হত্যাকারী অপরাধীর ক্ষেত্রে ওসীয়ত করা সঠিক মনে করা হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত হত্যা

ভুল হত্যার সংগায় আমরা বলেছি যে, অপরাধী সেক্ষেত্রে যে কাজটি করতে চায় সেই কাজ বা সংকল্পে সে ভুল করে। এই ভুলের কারণে তার দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় কিন্তু এ ক্ষেত্রে অপরাধীর মধ্যে কর্মের ইচ্ছা পাওয়া যায় বটে কিন্তু তার ইচ্ছার মধ্যে হত্যার কোন সংকল্প আদৌ থাকে না, তবুও তার কর্মের দ্বারা অপরাধ ঘটে যায়। এ ক্ষেত্রে যদি অপরাধ কর্ম ও কৃত অপরাধের মধ্যে একটা কারণগত যোগসূত্র (Relation of cause and effect) বিদ্যমান থাকে তাহলে এটি ভুল হত্যাকাণ্ডের সমতুল্য হত্যাকাণ্ড বলে বিবেচিত হবে।[১] এ ধরনের হত্যাকাণ্ড সব দিক বিবেচনায় ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা এটিও কোন ধরনের ইচ্ছা ও সংকল্প ছাড়াই সংঘটিত হয়েছে।[২] যেমন এক লোক ঘুমন্ত অবস্থায় পার্শ্ব বদল করল আর কেউ তার শরীরে চাপা পড়ে মারা গেল।[৩] অথবা কেউ ছাদের উপর থেকে পড়তে গিয়ে নিচে অবস্থানরত কারও উপরে পড়ায় তার মৃত্যু হল।[৪] অথবা একলোক মাথায় করে বোঝা বহন করছিল, বোঝা কারো উপরে পড়ে মারা গেল। অথবা পতিত বোঝায় হোঁচট খেয়ে কেউ মারা গেল। বোঝা নিয়ে রাস্তায় চলাচল করা যদিও বৈধ কিন্তু রাস্তায় নামার আগেই অন্যদের ক্ষতি-দুর্ভোগ না হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন লক্ষ্য স্থির করা কিংবা শিকারের জন্যে তীর ছোঁড়ার আগেই এর দ্বারা যাতে কারো ক্ষতি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।[৫]

এ ধরনের হত্যাকাণ্ডও ভুল হত্যার পর্যায়ভুক্ত, কারণ এ হত্যাকারী যে বোঝা বহন করছিল সেই বোঝা পতিত হয়ে কিংবা তাতে হোঁচট খেয়েই লোকটি

---

১ আল কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭১। এতে তিনি লিখেছেন, কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি পার্শ্ব পরিবর্তন করতে গিয়ে যদি চাপা দিয়ে কাউকে মেরে ফেলে। এই হত্যাকাণ্ড ভুল হত্যার পর্যায়ে পড়ে। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন কাজের সংকল্প ছিল না। যেহেতু কর্মটি তার দ্বারাই সাধিত হয়েছে এজন্য এটিকে ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭১। তিনি লিখেছেন, এই প্রকার হত্যা সবদিক থেকেই ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত। যদিও হত্যাকাণ্ডটি সরাসরি ঘটে থাকে।

৩ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭১।

৪ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭১।

৫ শরহে যাইলাঈ আলা মাতানিল কানয, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪৬।

www.pathagar.com

মারা গেছে। ফলে হত্যাকারীর কর্ম এবং নিহতের মৃত্যুর মধ্যে একটা কারণগত যোগসূত্র সৃষ্টি হয়েছে।[১] গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যুর ব্যাপারটিও এই প্রকার হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। গাড়ি চালানো অবস্থায় যদি তাতে চাপা পড়ে কেউ মারা যায়। কেননা গাড়িটি একটি যন্ত্র, যার নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল আরোহী বা চালকের উপর, যাতে হোঁচট খেয়ে কিংবা চাপা পড়ে লোকটি মারা গেছে। এর ফলে অভিযুক্তের কর্ম এবং লোকটির মৃত্যুর মধ্যে একটা যোগসূত্র সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি পূর্ণ সতর্ক থাকতো তাহলে হয়তো সে এই হত্যাকাণ্ড রোধ করতে পারতো।[২]

যে হত্যাকাণ্ড ভুল হত্যাকাণ্ডের স্থলাভিষিক্ত তাও যে কোনদিক বিবেচনায় ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত। এর বিধানও ভুল হত্যাকাণ্ডের বিধান তথা অপরাধীকে এই হত্যার অপরাধে দিয়াত ও কাফফারা দিতে হবে এবং নিহতের উত্তরাধিকার ও অসীয়ত থেকে হত্যাকারী বঞ্চিত হবে।[৩] ভুল হত্যার কারণে দিয়াত ওয়াজিব,[৪] আর হত্যাকারী ও হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কারণগত যোগসূত্র থাকায় হত্যাকারী নিহতের মীরাস ও অসীয়ত থেকে বঞ্চিত হবে।[৫]

---

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭১। তিনি লিখেছেন, মনে করুন, কেউ তরবারী, ইট অথবা কোন কাঠ বহন করে জনপথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর সেটি কারো উপর পড়ে গিয়ে কেউ মারা গেল। এতে ভুল হত্যার উপাদান বিদ্যমান; কেননা এক্ষেত্রে বহনকারীর হাতিয়ার অথবা পণ্য চাপা পড়েই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭২। তিনি লিখেছেন, কোন আরোহী জনপথ ধরে যাচ্ছিল। তার সওয়ারী এক ব্যক্তিকে পিষ্ট করল। যেহেতু সওয়ারী আরোহীর নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত তাই আইনের দৃষ্টিতে তার কর্মের কারণেই লোকটির মৃত্যু ঘটেছে। শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪৯।

৩ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭১। তিনি লিখেছেন, এটি সর্বদিক থেকেই ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত। তাই এতে ভুল হত্যার শাস্তি কাফফারা ও দিয়াত উভয়টি অপরাধীর উপর ওয়াজিব হবে এবং নিহতের উত্তরাধিকার থেকে হত্যাকারী বঞ্চিত হবে। শরহে কানয্ ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬ পৃষ্ঠা-১০১। তবে মিসরীয় আইনে উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সেই সাথে ওসীয়ত সম্পর্কিত ১৯৪৭ সালে জারীকৃত ৭১ নম্বর ধারায় ভুল হত্যার স্থলাভিষিক্ত হত্যাকারীর ক্ষেত্রে নিহতের ওসীয়ত কার্যকর করার অবকাশ রয়েছে। উল্লেখিত ধারায় ইমাম মালিক র. এর মতামত অনুসরণ করা হয়েছে।

৪ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭১। তিনি লিখেছেন, এ হত্যায় ভুল হওয়ার কারণে দিয়াত ওয়াজিব সেই সাথে এর মধ্যে ইচ্ছা ও সংকল্প পাওয়া যায়নি।

৫ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭১। তিনি লিখেছেন, অপরাধী মীরাস ও ওসীয়ত থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কারণ হলো, হত্যাকাণ্ডটি সরাসরি সংঘটিত হয়েছে। চাপা পড়ার কারণে লোকটির মৃত্যু ঘটেছে।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কারণগত হত্যাকাণ্ড[১]

কারণগত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যে কর্মটি সম্পাদিত হয় সেটি বৈধ হয় কিন্তু বৈধতার সীমা লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে সেখানে অপরাধের অনুপ্রবেশ ঘটে। যদিও এ ক্ষেত্রে হত্যা করার কোন সংকল্পই হত্যাকারীর ছিল না তবুও তার কাজটি হত্যাকাণ্ডের পরিণতি লাভ করে। এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কর্ম ও হত্যার মধ্যে কোন ধরনের যোগসূত্র থাকে না। হানাফীগণ এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে 'কারণগত হত্যা' বলে অভিহিত করেন। কারণ একদিকে এটি ভুল হত্যার সংগায় পড়ে অপরদিকে এটি ভুল হত্যার পর্যায়ে পড়ে না। যদি অন্য দৃষ্টিতে দেখা হয় যে, হত্যাকারীর মনে কর্মের এই পরিণতির কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না যা বৈধ কর্মটি সীমা লঙ্ঘন করার কারণে সৃষ্টি হলো। এতে মনে হয় ঘটনাটি ভুল হত্যাকাণ্ড কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখলে ভুল হত্যা আর এই হত্যার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্য হলো, ভুল হত্যাকাণ্ডে সাধারণত কর্মের পরিণতিতে কর্তা অপরাধী বিবেচিত হয় কিন্তু কারণগত হত্যাকাণ্ডে কর্মের পরিণতি নয় এ ক্ষেত্রে কর্তার আয়োজিত কারণে সে অপরাধী বিবেচিত হয়।[২]

শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণ হত্যার এ প্রকারটিকে ভুল হত্যারই একটি ধরন মনে করেন। তারা এটিকে ভুল হত্যাকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা এক্ষেত্রে হত্যাকারী বৈধ কর্মের সীমা লঙ্ঘন করে নিহতের মৃত্যুর কারণ ঘটায় যদিও তার মধ্যে হত্যার কোন ইচ্ছায়ই ছিল না।[৩] আর এটিই ভুল হত্যাকাণ্ডের মর্মকথা।

হাইওয়ে তথা মহাসড়কে কেউ কোন জিনিস নিয়ে আসার কারণে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটে সেগুলো কারণগত হত্যার অন্তর্ভুক্ত। যেমন কেউ যদি কোন সড়ক বা পথে গর্ত খুঁড়ে রাখে, আর সেই গর্তে পড়ে কেউ মারা যায়। অথবা

---

১ ইচ্ছাকৃত হত্যার সংগায় আমরা হত্যার উপকরণ সরবরাহের বিষয়টি আলোচনা করেছি। এর বিধান ও এ ব্যাপারে ফকীহদের মতভিন্নতা জানার জন্য দেখুন, 'কতলে আ'মাদ, মাসিক তরজুমানুল কুরআন, জুন ১৯৬৮ ইং পৃষ্ঠা-৪৩।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭১। এতে তিনি লিখেছেন, এটি এমন পর্যায়ের হত্যাকাণ্ড যা ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়েও পড়ে। কারণ এতে হত্যার উপকরণ সরবরাহের ব্যাপার রয়েছে।

৩ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২০, আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৫২-২৫৮।

www.pathagar.com

মহাসড়কে কেউ কোন পাথর বা গাছ রেখে দিল, কোন লোক সেটিতে হোঁচট খেলো আর সেই হোঁচট তার মৃত্যুর কারণ হলো। উল্লেখিত দুটি অবস্থায়ই সেই ব্যক্তির জন্যে নাজায়েয। কারণ সড়ক বা মহাসড়কে এমন কোন জিনিস রাখা যার দ্বারা গণমানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা মোটেও জায়েয নয়। অতএব দুর্ঘটনায় যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটে সবগুলোই কারণগত হত্যাকাণ্ড। কেননা সড়কে গর্ত খুঁড়ার কিংবা পাথর বা গাছ রাখার মতো নাজায়েয কাজের জন্যই সে কারণগত হত্যাকাণ্ডের অপরাধী সাব্যস্ত হবে।[১]

যেমন, কেউ যদি তার ঘরের সীমানা তার সীমা থেকে বেশি বাড়িয়ে ফেলে আর অতিরিক্ত জায়গাটিতে হোঁচট খেয়ে কোন লোক মারা যায়, এক্ষেত্রেও অপরাধী তার সীমা লঙ্ঘন করে অবৈধ কাজ করেছে। কোন বৈধ কারণ ছাড়াই সে জনসাধারণের ব্যবহার্য সড়ককে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। এর ফলে তাকে কারণগত অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে।[২]

কোন লোক যদি সড়ক পথে কোন জানোয়ার তাড়িয়ে নিতে থাকে আর তার তাড়িয়ে দেয়া জন্তু যদি কাউকে পিষে ফেলে আর পিষ্ট লোকটি মারা যায় তবে এটিও কারণগত হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ তার হাঁকানো জানোয়ারের কারণেই তো হত্যাকাণ্ড ঘটেছে যদিও লোকটি সরাসরি হত্যাকাণ্ড

---

১ আস-সারাখসী, খণ্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৬ ও ১৪; শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, পৃষ্ঠা-১০১ ও ১০২; আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭৪; তিনি লিখেছেন, মনে করুন, বহুল ব্যবহৃত জনপথে কেউ কুয়া খনন করলো, আর তাতে কোন লোক পড়ে মারা গেল। যদিও পড়ে গিয়ে মৃত্যু হওয়াটাই এতে মূল কারণ তবুও খননকারীকে এই মৃত্যুতে দিয়াত দিতে হবে। কেননা, কুয়া খনন করাই ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ ঘটেছে। পৃষ্ঠা-২৭৮ তে তিনি লিখেছেন, সেই ব্যক্তি পথে পাথর, কাঠ কিংবা কোন আসবাবপত্র রাখল অথবা সে নিজেই রাস্তার মধ্যে বসে পড়ল। ফলে এসব জিনিসের সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে কেউ মারা গেল। এমতাবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়াত দিতে হবে। তবে তাকে কাফফারা দিতে হবে না এবং উত্তরাধিকার ও ওসীয়ত থেকেও সে বঞ্চিত হবে না। কেননা সে সরাসরি হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি। আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২০। আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৫৭।

২ আস-সারাখসী, খণ্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৫১। তিনি লিখেছেন, কেউ যদি জনপথে পায়খানা তৈরি করে অথবা কোন ড্রেন খনন করে, অথবা দেয়ালের জন্য গর্ত তৈরি করে। এসবের মধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়ে কেউ যদি মারা যায়, তাহলে এসব জিনিসের স্থাপনাকারীর উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। কেননা এসব স্থাপনার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি তার বৈধ ক্ষমতা লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে জনপথের মধ্যে এসব বাধা তৈরি করেছে। আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭৮; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২০; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৫৭।

www.pathagar.com

ঘটায়নি।[১] (অবশ্য এই অবস্থাটা সড়ক পথে কোন জন্তুর উপর আরোহণকারীর দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা এই অবস্থায় সওয়ারীটাকে আরোহণকারীর হাতের অস্ত্র মনে করা হয়।)

এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের অবস্থা এমনও হতে পারে যে, কোন লোক সড়ক পথে মালবাহী জানোয়ার নিয়ে যাচ্ছিল। মালবাহী জানোয়ারের উপর থেকে কিছু পড়ে গিয়ে কোন পথিক মারা গেল।[২]

ঠিক অনুরূপ বিধান হবে কেউ যদি মহাসড়কে কোন জানোয়ার ছেড়ে দেয় আর সেই জন্তু কাউকে মেরে ফেলে তবে সেও কারণগত হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।[৩] কেউ যদি জনপথের উপর কোন জানোয়ার বেঁধে রাখে এবং সেই জানোয়ারের আঘাতে কোন লোকের মৃত্যু ঘটে এক্ষেত্রেও একই বিধান হবে।[৪] কারণ বর্ণিত সব কয়টি অবস্থায় অপরাধী কোন ধরনের

---

১ আল-কাসানী খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭২। তিনি লিখেছেন, হত্যাকারী জন্তুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অথবা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় হলে সে কারণগত হত্যাকারী সাব্যস্ত হবে। ২৮০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, এক ব্যক্তি জনপথ দিয়ে একটি জন্তু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অথব টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় উক্ত জন্তু কাউকে পায়ে পিষ্ট করে ফেলল অথবা কাউকে গুতো দিল অথবা কাউকে আঘাত করল তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর এ দায় বর্তাবে। কারণ জনপথে অবাধে চলাচলের অধিকার সকল মানুষের রয়েছে। চলাচলের ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা ও নিরাপত্তা ও অন্যের কষ্টদায়ক কর্ম ও তৎপরতা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব সেসব থেকে মুক্ত থাকা সবার জন্যে জরুরী। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকা তার আওতা বহির্ভূত ছিল না। ইচ্ছা করলেই সে এসব কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারতো।

২ আস-সারাখসী, খণ্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১৮৯। তিনি লিখেছেন, জিন, লাগাম এবং এ ধরনের কোন জিনিস কোন ভারবাহী জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে জন্তু পরিচালনাকারী ব্যক্তির কাঁধে এর দায় বর্তাবে। কেননা এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধকরা তার পক্ষে সম্ভব ছিল।

৩ আস-সারাখসী, খণ্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১৯। তিনি লিখেছেন, কোন ব্যক্তি তার জন্তুকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে এবং সেই জন্তু এক ব্যক্তিকে সামনে পেয়ে আহত করেছে। এতে জন্তুর মালিক এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী হবে। অনুরূপ জন্তুর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনাকারীর কাঁধে আহত করার দায় বর্তাবে, কারণ সেই তো জন্তুকে পরিচালনা করছিল কিন্তু তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

৪ আস-সারাখসী, খণ্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১৯০। এতে তিনি লিখেছেন, কেউ জনপথের উপর কোন জন্তুকে দাঁড় করলো। জন্তুটি হাত পা বা লেজ দিয়ে কাউকে আহত করল, অথবা কাউকে কামড়ে দিল। অথবা তার মুখের বিষ্ঠা, লালা কিংবা ঘাম মাটিতে পড়ল তাতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোন পথিক মারা গেল, তাহলে এই হত্যার জরিমানা জন্তুর

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ছাড়াই জনপথে জন্তুকে ছেড়ে দিয়ে অবৈধ কাজ করেছে। আর এই নাজায়েয কাজের কারণে সাধারণ পথিক আহত হয়েছে। আহত হওয়ার ফলে মৃত্যু হয়েছে। যেহেতু এই হত্যা জন্তুর মালিকের সরবরাহকৃত উপাদানের কারণে সংঘটিত হয়েছে, সরাসরি মালিক হত্যাকাণ্ডে জড়িত নয়; এজন্য এ ধরনের হত্যাকে কারণগত হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করা হয়।

কারণগত হত্যাকাণ্ড ও ভুল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

যে সকল ফকীহ কারণগত হত্যাকাণ্ডকে ভুল হত্যাকাণ্ড থেকে ভিন্ন করে এটিকে হত্যার একটি প্রকার মনে করেন, তাদের অভিমত হলো, এক্ষেত্রে হত্যাকারী সরাসরি হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি। তবে হত্যার কারণ অবশ্যই হয়েছে। এর বিপরীতে ভুল হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীর কর্মই সরাসরি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। অনুরূপ ভুলহত্যা সদৃশ হত্যাকাণ্ডেও হত্যাকারীর কর্মই সরাসরি হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং সেটিই হত্যার কারণ ঘটায়। অনুরূপ ভুল হত্যার পর্যায়ভুক্ত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেও হত্যাকারীর কর্ম সরাসরি হত্যার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে পার্শ্ব বদল করতে গিয়ে কারো উপরে পড়ে গেল। এমতাবস্থায় চাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারী মূলত পতিত ব্যক্তির শরীরের চাপের কারণেই মারা গেছে। অথবা কারো যানবাহনের চাপায় পড়ে কেউ মারা গেল। এমতাবস্থায় চালক বাহনেই সওয়ার থাকে এবং সেই বাহন চালায়। এমতাবস্থায় সাধারণত বলা হয়, চালকের কর্মের কারণেই লোকটি নিহত হয়েছে। মূল অপরাধীর কর্ম আর নিহতের মৃত্যুর মধ্যে তৃতীয় অন্য কোন কর্মের দখল নেই। কিন্তু কারণগত হত্যার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে অপরাধীর কর্মের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সরাসরি কোন সম্পর্ক থাকে না। এতে অন্য কোন জিনিসের সম্পৃক্ততা থাকে। যেমন কুয়া খননের কর্মটি জমিনের সাথে সম্পৃক্ত। কোন ধরনের স্থাপত্য কর্মে সীমা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কর্মটি স্থাপত্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, উল্লেখিত অবস্থায় জমিনের কোন গঠনগত কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনা কিংবা স্থাপত্য কর্মে সীমা লঙ্ঘনের কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দায় সরাসরি অপরাধীর কর্মের উপর বর্তায় না। এক্ষেত্রে অপরাধী আসলে হত্যার কারণ বা অনুঘটক হয় মাত্র। যারা এ মত ব্যক্ত

মালিকের উপর বর্তাবে। কেননা লোকটির মৃত্যুর কারণ হওয়ার জন্যে সে তার বৈধতার সীমা লঙ্ঘন করেছিল। কেননা জনপথের উপর কোন জীব-জন্তুকে দাঁড় করিয়ে রাখা নিষিদ্ধ। অবশ্য তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না, কারণ সরাসরি নিজ হাতে সে হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি।

www.pathagar.com

করেন, তাদের কথা হলো, উল্লেখিত অবস্থায় অপরাধীর কর্ম এবং কর্মের কারণে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক অন্য জিনিসের সংশ্লিষ্টতার ফলে হয়ে থাকে।[১] ভুল হত্যাকাণ্ড আর ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এ পার্থক্যের কারণে এই পার্থক্য নির্ণয়কারী ফকীহগণ বলেন, ভুল হত্যার পর্যায়ভুক্ত হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারী প্রকৃতপক্ষে হন্তারক নয়। হত্যার কারণ বা উপকরণ সরবরাহের কারণে সে হত্যাকারী হয়ে যায় না। কেননা, হত্যার উপকরণ বিদ্যমান থাকার কারণে হত্যাকাণ্ড ঘটার পূর্ব পর্যন্ত আমরা নিহতকে মৃত বলতে পারি না। উপরোক্ত কথার সমর্থনে বলা যায়, মনে করুন– কুয়া খননকারী কিংবা সীমা লঙ্ঘন করে স্থাপনা নির্মাণকারী মারা গেল। এরপর কুয়া কিংবা স্থাপনায় আঘাত পেয়ে কেউ মারা গেল, তাহলে আগেই মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে আমরা কি হত্যাকারী বলবো?[২]

যারা হত্যার এই পার্থক্য স্বীকার করেন না, বরং এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে ভুল হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, তাদের মত হলো, উল্লেখিত অবস্থায়ও যেহেতু অপরাধী তার বৈধ সীমা লঙ্ঘন করে অর্থাৎ হত্যার ইচ্ছা না থাকলেও এমন ভুলকর্ম করে বসে যার পরিণতিতে হত্যাকাণ্ড ঘটে। ফলে এই হত্যাকাণ্ডকে ভুল হত্যা বলেই অভিহিত করা হবে। ভুল হত্যাকাণ্ডের যে পরিণতি ঘটে এতেও একই পরিণতি ঘটবে।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

শেষোক্ত মতটি আধুনিক মিসরীয় তাযিরী আইনের অনুরূপ। মিসরীয় তাযিরী আইনের ২৩৮ ধারায় বলা হয়েছে, কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে ভুলবশত হত্যা করে কিংবা হত্যার কারণ হয়ে বসে। এক্ষেত্রে 'অথবা' শব্দটি হানাফীগণ যেগুলোকে কারণগত হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন সবগুলো অবস্থাতেই বোঝায়। অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন হত্যাকাণ্ডের কারণ হওয়াটা ভুল হত্যারই অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে মিসরের সবগুলো আদালতের রায়েই রয়েছে

---

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭২; শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫৯। আস-সারাখসী, খণ্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১৪। তিনি লিখেছেন, ভুল হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তির কর্মটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু কুয়া খননকারীর কর্ম যুক্ত হয় জমিনের সাথে। এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তি তাতে পড়ে গিয়ে মারা যায়। এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুর কারণ হয়।

২ আস-সারাখসী, খণ্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৬।

www.pathagar.com

ঐকমত্য। ভুল হত্যা যেভাবে সরাসরি অপরাধীর কর্মের পরিণতি হয় অনুরূপ সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমেও তা হতে পারে।

উপরে উল্লেখিত মিসরীয় আইনের যে ধারার কথা বলা হয়েছে, তাতে নিম্নোক্ত অবস্থাগুলোর উল্লেখ রয়েছে– 'যেমন- বেপরোয়া, অসতর্কতা, অবহেলা, ত্রুটি, অমনোযোগিতা, অসচেতনতা, অনিরাপত্তা এবং আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার কারণে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।'

আসলে বর্ণিত গোটা বাক্য একটি মর্মার্থকেই বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছে মাত্র। অর্থাৎ অপরাধীর কর্মের মধ্যে এমন কোন ত্রুটি থাকা যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয় ক্ষতিকর; ফলে সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কর্মটিকেই ফকীহগণ কর্মে কিংবা সংকল্পে ভুল বলে অভিহিত করেছেন। অথবা বলেন, ' কোন কর্ম করার ক্ষেত্রে বৈধ সীমা এভাবে লঙ্ঘন করা যায় ফলে হত্যাকাণ্ডের কারণ ঘটে। উপরের বিশদ আলোচনা থেকে এ জিনিসটাই প্রতিভাত হলো, ভুল হত্যা ও কারণগত হত্যার মধ্যে ফকীহগণের দৃষ্টিতে দুটি জিনিসের মিশ্রণ রয়েছে। এক. কর্মে ভুল, দুই. উগ্রতা বা সীমা লঙ্ঘন। সেই সাথে হত্যার ইচ্ছা থেকে কর্মটি মুক্ত থাকা।[১]

গ্রন্থকার বলেন, হানাফীদের মতের ব্যাপারে যারা ভিন্নমত পোষণ করেন, আমি তাদের সাথে একমত পোষণ করি। আমার দৃষ্টিতে কারণগত হত্যাকাণ্ডও ভুল হত্যা। কেননা ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড ছাড়া অনিচ্ছাকৃতভাবে যতো ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সেগুলোতে অপরাধীর কর্মে কোন না কোন ভুল অবশ্যই থাকে। সেই সাথে তার মধ্যে হত্যার সংকল্পও থাকে না।

কারণগত হত্যাকাণ্ডের বিধান

যেসব ফকীহ কারণগত হত্যাকাণ্ডকে হত্যাকাণ্ড মনে করেন, তারা বলেন, এক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হলো, তার দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করতে হবে। কেননা সেই তো হত্যার কারণ ঘটিয়েছে এবং কর্মে সে বৈধতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। তবে এক্ষেত্রে অপরাধীর উপর কাফফারা ওয়াজিব নয়, সেই সাথে সে নিহতের উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে না। কেননা এক্ষেত্রে অপরাধীর কর্ম ও পরিণতি তথা হত্যার মধ্যে সরাসরি কোন যোগসূত্র নেই।

---

[১] আল-আহকামুল আম্মাতু ফি কানুনিল উকুবাত, ড. সাঈদ মুস্তফা সাঈদ, প্রকাশ : ১৩৭১ হিঃ মোতাবেক ১৯৫২ খৃ., পৃষ্ঠা-৩৯৪।

www.pathagar.com

আর যেসব ফকীহ কারণগত হত্যাকাণ্ডকে ভুল হত্যার একটি প্রকার মনে করেন, তাদের দৃষ্টিতে ভুল হত্যার যে বিধান এটিরও সেই বিধান।[১]

[১] শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০১-১০২। এতে তিনি লিখেন, কারণগত হত্যার শাস্তি হলো, হত্যাকারীর উপর দিয়াত ওয়াজিব কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব নয়। দিয়াত ওয়াজিব হওয়ার কারণ তারাই এই দুর্ঘটনার উপলক্ষ হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘনের মতো কর্ম করেছে। যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তি সরাসরি হত্যাকাণ্ডে জড়িত নয় এজন্য তার উপর কাফফারা ওয়াজিব নয়। তিনি আরো লিখেছেন, প্রায় সব হত্যার শাস্তির ক্ষেত্রে হত্যাকারী নিহতের মীরাস থেকে বঞ্চিত হয় কিন্তু কারণগত হত্যাকাণ্ড এর ব্যতিক্রম। ইমাম শাফেয়ী র. এতে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি এতেও ভুল হত্যাকাণ্ডের শাস্তি নির্ধারণ করেন। আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২০; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৫৭-২৫৮; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৩৮ ও তৎপরবর্তী। প্রকাশ : ১৩৪৮ হিঃ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের দৈহিক ক্ষতিসাধনের বিধান

ইতঃপূর্বে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত অপরাধের আলোচনা করেছি। এখন আলোচনা করবো যেসব অপরাধে হত্যাকাণ্ড না ঘটে। ফকীহদের দৃষ্টিতে হত্যাকাণ্ডের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ চার প্রকার :

১. শরীরের কোন অঙ্গকে কেটে ফেলা কিংবা যা এর পর্যায়ভুক্ত;
২. কোন অঙ্গের বাহ্যিক আকৃতি বহাল থাকলেও তার কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া;
৩. মাথায় জখম করা (Skull Fracture);
৪. আহত করা।

উল্লেখিত চার প্রকারের মধ্যে দু'প্রকারের অপরাধ প্রকৃতপক্ষে একই প্রকৃতির সেহেতু এ দুটিকে আমরা একই সাথে আলোচনা করবো আর বাকি দু'টির আলোচনা হবে ভিন্ন ভিন্ন। কেননা কোন অঙ্গ কেটে ফেলে দেয়া আর সেটির কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার মধ্যে তাৎপর্যগত তেমন কোন পার্থক্য নেই।

উল্লেখ্য, ইচ্ছাকৃত অপরাধের বর্ণনায় আমরা সেইসব অবস্থার কথাই বেশি উল্লেখ করেছি যেগুলোতে কিসাস ওয়াজিব হয় না। এসব ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের অপরাধে যেমন শাস্তি হয় তাই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমরা যেসব অপরাধে কিসাস ওয়াজিব হয় না, অথবা যে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে ভুলবশত, সেগুলো একই সাথে আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি।

তবে বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের যেসব অপরাধে কিসাস কার্যকর হয় সেগুলোর শর্তাদির বিস্তারিত আলোচনা করা জরুরী মনে করছি। কারণ এই শর্তগুলো এ ধরনের সকল অপরাধের ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকা জরুরী।

হত্যাকাণ্ডের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে কিসাস কার্যকর হওয়ার শর্তাদি

হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে কিসাস কার্যকর হওয়ার ব্যাপারটিও সেইসব শর্তাদির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে যে সব শর্তাদি হত্যাকাণ্ডের কিসাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এজন্য অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরী। অপরাধীকে ততটুকুই শাস্তি দিতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত

www.pathagar.com

হয়েছে। এজন্য হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে যেসব শর্তাদি বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক, হত্যাকাণ্ডের নিম্নপর্যায়ের অপরাধেও কিসাস কার্যকর করার ক্ষেত্রে সেসব শর্তাদি বিদ্যমান থাকতে হবে। যেমন অপরাধীকে প্রাপ্ত বয়স্ক, সজ্ঞান, স্বাধীন এবং ইচ্ছাকৃত অপরাধ কর্ম সম্পাদনকারী হতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সার্বিকভাবে নিরপরাধ হতে হবে। সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধীর সন্তান হলে কিসাস কার্যকর হবে না। অপরাধ ও ক্ষতির মধ্যে কোন প্রকারের বাধা বিপত্তি থাকবে না। এসব শর্তের ব্যাপারে আমরা এর আগে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১]

হত্যার অপরাধে কিসাস কার্যকর হয় মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পর। ফলে সেই কিসাস কার্যকর করার দ্বারা অপরাধীর কোন প্রকার ক্ষতি হওয়ার সুযোগ নেই অথবা দণ্ড প্রয়োগে সীমালঙ্ঘনেরও অবকাশ নেই, কিন্তু হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের ক্ষয়ক্ষতিতে কিসাস কার্যকর করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ এক্ষেত্রে শুধু নির্দিষ্ট একটি অঙ্গ কর্তন করা কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষত করার অবকাশ থাকে। অপরাধীকে হত্যার উদ্দেশ্য থাকে না। মানুষের শরীর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্মিলিত একটি রূপ। নির্দিষ্ট কোন একটি অঙ্গে কিসাস কার্যকর করতে গিয়ে অন্য অঙ্গের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীর মৃত্যুও হতে পারে অথচ এক্ষেত্রে অপরাধীর মৃত্যু কখনোই কাম্য নয়। বস্তুত এ ধরনের কিসাসের ক্ষেত্রে জরুরী হলো, অপরাধীকে যতটুকু প্রাপ্য এর বেশি শাস্তি না দেয়া। এটা নিশ্চিত করতে হবে কিসাস বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যেনো অপরাধীর উপর জুলুম না করা হয়। এমনটিও নিশ্চিত করতে হবে, যে অপরাধ সে করেনি, এমন শাস্তি তাকে দেয়া হয়নি। তাছাড়া এ বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে অপরাধীকে শাস্তি দিতে গিয়ে যেন উল্টো কিসাসযোগ্য অপরাধের উদ্ভব না ঘটে যায়। এজন্য হত্যার চেয়ে

---

[১] বাদায়ে আস-সানায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯৭। তাতে লেখা হয়েছে, তন্মধ্যে এমন শর্তও রয়েছে যা মানুষের জীবনহানি ও এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধকেও অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন অপরাধীকে অবশ্যই সজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন এবং নিজের উদ্যোগে অপরাধ সংঘটনকারী হওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সার্বিকভাবে নিরপরাধ ও শাস্তির উর্ধ্বে থাকা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধীর সন্তান কিংবা ক্রয়কৃত গোলাম বা দাসী না হওয়া এবং সরাসরি অপরাধ সংঘটিত হওয়া। বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৯; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২১; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৬০; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪১৬।

www.pathagar.com

নিম্নপর্যায়ের কিসাসের ক্ষেত্রে ফকীহগণ কয়েকটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। এসব শর্তের মধ্যে প্রধান শর্ত হলো, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সাযুজ্য থাকতে হবে অর্থাৎ অপরাধীর দ্বারা যতটুকু ক্ষতি হয়েছে ঠিক ততটুকু শাস্তিই অপরাধীকে দেয়ার অবকাশ থাকতে হবে।

১. অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সাযুজ্য ও সামঞ্জস্য থাকার অর্থ হলো, অপরাধ সংঘটনের দ্বারা যতটুকু ক্ষতি হয়েছে শাস্তি প্রয়োগের দ্বারা ঠিক ততটুকুই ক্ষতি করা হবে। কারণ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থান ও কার্যকারিতা ভিন্ন ভিন্ন। তাই নাকের পরিবর্তে কখনো চোখ কিসাস নেয়া যাবে না। ঠিক ডানের অঙ্গের পরিবর্তে বামের অঙ্গের কিসাস নেয়া যাবে না। তদ্রূপ উপরের দাঁতের বদলে উপরের দাঁতই কিসাস স্বরূপ ভাঙতে হবে নীচের দাঁত ভাঙা যাবে না।

২. পূর্ণ সাযুজ্য বা সামঞ্জস্য থাকার অর্থ হলো, অপরাধীকে তার অপরাধের বিপরীতে পরিপূর্ণ ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হওয়া। এমনটি তখনই সম্ভব যখন কোন অঙ্গকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্তন করা হবে। উপরে বর্ণিত দুটি শর্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হলে কোন ধরনের জুলুম বা সীমা লঙ্ঘনের অবকাশ থাকবে না। সেই সাথে মহান আল্লাহর নির্দেশের পূর্ণ বাস্তবায়নও সম্ভব হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তাদের জন্যে বিধান দিয়েছি প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম।' ক্ষতি ও শাস্তি প্রয়োগের মধ্যে যদি সাযুজ্য না থাকে, অথবা অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী পূর্ণ শাস্তি প্রয়োগের সুযোগ না থাকে, তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যায়।[১] এ ব্যাপারে সামনে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

---

[১] আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯৭। তাতে লেখা হয়েছে, যেসব অঙ্গের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং যে অঙ্গ অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উভয়টির কার্যকারিতা ও উপকারিতার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরী এবং উভয়ের মূল্য সমপর্যায়ের হতে হবে। কেননা হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে শাস্তি ও অপরাধের মধ্যে সমতা থাকা আবশ্যিক। সামঞ্জস্য না থাকলে কিসাস অকার্যকর হয়ে যাবে। উপরে উল্লেখিত সমতা বিদ্যমান থাকার পক্ষে ফকীহগণ আকলী ও নকলী উভয়বিদ দলীল উপস্থাপন করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা : 'জীবনের বদলে জীবন, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং আঘাতের বদলে আঘাতে কিসাস প্রযোজ্য।' (সূরা আল-মায়িদা : ৪৫) অন্য আয়াতে

www.pathagar.com

কিসাসের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে কিন্তু কিসাস প্রয়োগের জরুরী শর্তগুলোর ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। যেমন কেউ বলেন, জিহ্বা কাটার অপরাধে কিসাস প্রয়োগ হবে। আবার কেউ বলেন, জিহ্বা কাটার অপরাধে কিসাস প্রয়োগ করা হবে না। জিহ্বা কাটার অপরাধে কিসাস প্রয়োগের সমর্থকদের যুক্তি হলো, যেসব অঙ্গের জোড়া আছে এবং জোড়ায় কেটে ফেললে তাতে দেহের অন্য কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না জিহ্বাও অনুরূপ। জিহ্বার একটি মজবুত গোড়া আছে যা জোড়ার মতোই। তাই অপরাধী যে পরিমাণ জিহ্বা কেটেছে তার উপর ঠিক এই পরিমাণ জিহ্বা কাটার কিসাস প্রয়োগ করা যাবে। যারা জিহ্বা কর্তনের অপরাধে কিসাসের বিপক্ষে তাদের যুক্তি হলো, জিহ্বা একটি সংকোচন ও সম্প্রসারণশীল অঙ্গ ফলে অপরাধী যতটুকু জিহ্বা কেটেছে ঠিক ততটুকু জিহ্বা কর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করা অসম্ভব।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, উল্লেখিত বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত, যে ক্ষেত্রে পূর্ণ কিসাস নেয়ার অবকাশ আছে তাতে কিসাস প্রয়োগ হবে। এই শর্তের আবশ্যকতা নিয়ে তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, জিহ্বার মধ্যে এই শর্ত বিদ্যমান কি-না এ ব্যাপারে। অন্যান্য যেসব অঙ্গের কিসাসের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে সেগুলোও অনুরূপ।

একটি অঙ্গ কর্তনের অপরাধে কি একাধিক অপরাধীর অঙ্গ কর্তন করা যাবে?

হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের নির্দিষ্ট অপরাধের অপরাধী যদি একাধিক হয় তাহলে সবার উপরই কি কিসাসের শাস্তি প্রযোজ্য হবে? এ ব্যাপারে

বলা হয়েছে, 'তোমরা যদি শাস্তি দাও, তাহলে তদ্রূপ শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের আঘাত করা হয়েছে।' বস্তুত হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে, তা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সাথে তুলনীয়। তাই এ ধরনের অপরাধে সমতা বজায় রাখা আবশ্যিক আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে যেমন সমতা বজায় রাখতে হয়। আল-কাসানী এ প্রসঙ্গে পূর্ণসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আল-কাসানী বলেন, 'এসব ক্ষেত্রে অপরাধের কিসাস কার্যকর করার জন্যে অপরাধের সমতুল্য শাস্তি প্রয়োগের অবকাশ থাকতে হবে। কারণ অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি প্রয়োগের অবকাশ না থাকলে কিসাস বাস্তবায়নের সুযোগই থাকবে না। বস্তুত তখন কিসাসের প্রায়োগিক আবশ্যিকতা থাকবে না। দেখুন, তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানযুদ দাকায়েক, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১১; নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৮; কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৩ এবং এরপর।

www.pathagar.com

ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। কোন কোন ফকীহ এক্ষেত্রে হত্যা ও হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

জাহেরী মতাবলম্বীগণ বলেন, একটি হাত কর্তনের অপরাধে অপরাধী একাধিক হলে তাদের সবার হাতকাটা যাবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক র. বলেন, একটি হাত কর্তনের অপরাধে একাধিক হাত কর্তন করা যাবে। তাদের মতে, একটি প্রাণ নাশের অপরাধে একাধিক অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়। কিন্তু হানাফী ফকীহগণ, হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ ও হত্যার দণ্ডের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। হানাফীগণ বলেন, একটি প্রাণ নাশের অপরাধে কিসাস স্বরূপ একাধিক অপরাধী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেও হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে একটি হাত কর্তনের অপরাধে জড়িত একাধিক অপরাধীর হাত কর্তন করা যাবে না।

যারা হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের কিসাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরাধী একাধিক হলে কিসাস প্রয়োগের বিপক্ষে তাদের দলীল হলো :

১. হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে কিসাস প্রয়োগের জন্য অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সাযুজ্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। অথচ এক হাতের মোকাবেলায় একাধিক হাত কর্তনের মধ্যে কোন সাযুজ্য নেই। কেননা দুই বা ততোধিক হাতের সাথে এক হাতের কোন সামঞ্জস্য হতে পারে না। এটাও তো মনে করা যেতে পারে উভয় অপরাধী হাতের একই অংশ কর্তন করেছে। কারণ একটি হাতকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। কিন্তু হত্যার বিষয়টি এর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা শরীর থেকে প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়াকে কোন ভাগে বিভক্ত করা যায় না। এমতাবস্থায় হাতের কোন অংশ কাটার অপরাধে কারো গোটা হাত কেটে ফেলা সাদৃশ্যের পরিপন্থী। অথচ কিসাসের মধ্যে সাদৃশ্য হওয়া কিংবা সামঞ্জস্য থাকা শরীয়তের দৃষ্টিতে শর্ত। এ মর্মে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, "আমি তাদের জন্য বিধান দিয়েছি, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে জখম কিসাস হিসেবে সমানসমান প্রতিদানের।"

২. হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধকে হত্যার মতো গুরুতর অপরাধের সাথে তুলনা করা যাবে না। কেননা কাউকে হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী ও নিহতের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সমতা ধর্তব্য নয়। কেননা

www.pathagar.com

হত্যাকাণ্ডের অপরাধে সুস্থ মানুষের বিপরীতে সুস্থ মানুষকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

৩. হত্যাকাণ্ডের মতো অপরাধে সাধারণত একাধিক অপরাধী জড়িত থাকে কিন্তু হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধে অপরাধীর সংখ্যা সাধারণত কমই থাকে। বস্তুত এই দুই অবস্থার মধ্যে ভিন্নতা আবশ্যিক ব্যাপার।

৪. যারা হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধের কিসাসে অপরাধী একাধিক হওয়ার ক্ষেত্রে একের বিপরীতে একাধিক অঙ্গ কর্তনের পক্ষে তাদের দলীল হলো :

ক. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর কাছে দু'জন লোক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরির সাক্ষ্য দিল। দু'জনের সাক্ষ্য পেয়ে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির হাত কর্তনের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সাক্ষ্যদাতা দু'জন তাঁকে জানালো, আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলাম, আসলে এই ব্যক্তি চোর নয়, চোর অন্য ব্যক্তি। তখন হযরত আলী রা. দ্বিতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেয়া তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিয়ে প্রথম ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাদের উপর জরিমানা আরোপ করেন এবং বলেন, 'আমি যদি জানতাম, তোমরা জেনে বুঝে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছো, তাহলে আমি তোমাদের উভয়ের হাত কর্তনের নির্দেশ দিতাম।' উপরের উক্তি থেকে বুঝা যায়, হযরত আলী রা. একটি হাত কর্তনের বিপরীতে একাধিক হাত কর্তনের সমর্থক ছিলেন।

খ. কিসাসযোগ্য অপরাধ দু'প্রকার। এক. হত্যা, দুই. হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ। হত্যাকাণ্ডের কিসাস প্রয়োগে যদি একটি প্রাণের বিপরীতে একাধিক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায় তাহলে হত্যাকাণ্ডের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধের কিসাসেও এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কৃত অপরাধে একাধিক ব্যক্তির উপর দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে।[১] গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে হত্যার অপরাধ ও হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে একই উপাদান যুক্ত। তাই উভয় ক্ষেত্রে একজন

---

[১] বাদায়ে আস-সানায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭৭-২৯৯; বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৯; আল-কিসাস ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়া, ড. আহমদ মুহাম্মদ ইবরাহীম, পৃষ্ঠা-২৫২ ও তৎপরবর্তী।

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিপরীতে জড়িত একাধিক অপরাধীকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রথমত এই মতের পক্ষাবলম্বনকারীদের দলীল রয়েছে। দ্বিতীয়ত জীবনের বিপরীতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পদের মতো নয়। বস্তুত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির সাথে তুলনীয় হতে পারে না। কেননা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শরীরের অংশ। এছাড়া এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সম্পদের সাথে তুলনা করলে অপরাধী একের অধিক হলে তারা শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কেননা একাধিক অপরাধী হলে সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে কঠোর শাস্তিকে লঘু শাস্তিতে রূপান্তরের অবকাশ সৃষ্টি হবে। হত্যাকাণ্ডের অপরাধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনটি হয়ে থাকে।

এই বেঁচে যাওয়ার ব্যাপারটি ঘটবে তখন যখন অপরাধী একাধিক হয়, আলাদাভাবে প্রত্যেকের অপরাধকে চিহ্নিত করার সুযোগ না থাকে এবং তাদের প্রত্যেকেই একবার একই সাথে একই অপরাধে সংশ্লিষ্ট থাকে। যদি এমন জটিলতা না থাকে, প্রত্যেকের অপরাধকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে প্রত্যেকের অপরাধের মাত্রা অনুপাতে শাস্তি দেয়া হবে।

www.pathagar.com

প্রথম অনুচ্ছেদ

কোন অঙ্গহানি ঘটানো কিংবা বিকলাঙ্গ করার শাস্তি

যেসব অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ কাটা পড়ে অথবা কোন অঙ্গ সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যায় এবং কার্যকারিতার বিলোপ ঘটে এসব অপরাধ দুই প্রকার :

(এক) কখনো অপরাধ ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়;

(দুই) কখনো ভুলবশত এমনটি ঘটে যায়।

হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে ইচ্ছাসদৃশ বা ইচ্ছাকৃত অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে কোন পর্যায় আছে কিনা এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। এ ব্যাপারে ফকীহদের মতভিন্নতা আগে আলোচনা করে পরে অঙ্গহানি কিংবা অঙ্গ বিকলের অপরাধে কিসাস প্রয়োগের শর্তাদির বর্ণনা করাটাই হবে সমীচীন। যেসব শর্ত কিসাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকা জরুরী এবং যেসব শর্তের অবর্তমানে কিসাস বাতিল হয়ে যায় এগুলো আলোচনার পর সেইসব অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করবো; যেসব অপরাধ অনিচ্ছাকৃত ভুলে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে করলেও তাতে কিসাস কার্যকর হয় না।

উল্লেখিত অপরাধে ইচ্ছাকৃত অপরাধের সাদৃশ্যপূর্ণ কোন পর্যায় আছে না নেই[১]

যেসব অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গহানি ঘটে কিংবা কোন অঙ্গের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাতে ইচ্ছাকৃত অপরাধের সাথে

---

১ আধুনিক আইনের পরিভাষায় কোন অঙ্গ কেটে ফেলা কিংবা কোন অঙ্গের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলাকে (Permanent infirmity) স্থায়ী ক্ষতি হিসেবে গণ্য করা হয়। মিসরীয় দণ্ডবিধির ২৪০ নম্বর ধারায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ ধরনের অপরাধের দণ্ডনির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন অন্যায়ভাবে কারো কোন অঙ্গ কেটে ফেলা, কারো শরীর থেকে কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা কিংবা কোন অঙ্গের উপকারিতা ও কর্মক্ষমতা বিনষ্ট করে ফেলা, কারো দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয়া কিংবা কোন একটি চোখ তুলে ফেলা ইত্যাকার অপরাধগুলো ইসলামী আইনে অন্যায়ভাবে কারো অঙ্গ কেটে ফেলা কিংবা অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্ট করে দেয়ার অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখিত ধারায় এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে জখম

www.pathagar.com

সাদৃশ্যপূর্ণ কোন পর্যায় আছে কি নেই, এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। একপক্ষ বলেন, ইচ্ছাকৃত অপরাধের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে, আর একপক্ষ বলেন নেই।

অন্যায়ভাবে আহত হওয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যদি কোন অঙ্গ কেটে ফেলতে হয় অথবা তাদের অবয়ব ঠিক থাকলেও এর কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এমন সংক্ষুব্ধ অবস্থায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যে, এ ধরনের সংক্ষুব্ধ আঘাতে সাধারণত ক্ষত সৃষ্টি হয়ে থাকে। অপরাধী যদি এক্ষেত্রে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করে থাকে তাহলে এই অপরাধ সকল ফকীহের মতেই ইচ্ছাকৃত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

মতভিন্নতা মূলত এমন অপরাধের ক্ষেত্রে যাতে এমন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে যা সাধারণত ক্ষত সৃষ্টি করে না। যেমন থাপ্পড় কিংবা চাবুকের আঘাত। অথবা বিষয়টি যদি এমন হয় অপরাধীর সাথে ঠাট্টাচ্ছলে, অথবা খেলাচ্ছলে কিংবা শিক্ষামূলক শাস্তি দিতে গিয়ে এমনটি ঘটে গেছে। যেমন, এক লোক কাউকে থাপ্পড় মারল আর তাতে লোকটির চোখ ফেটে গেল।

জমহুরে ফুকাহার অভিমত হলো, উল্লেখিত অবস্থায় কৃত অপরাধ ইচ্ছাকৃত অপরাধ সদৃশ বলে গণ্য হবে। এবং কিসাস কার্যকর হবে না। কিসাসের পরিবর্তে এমন অপরাধে কঠোর দিয়াত (hard blood money) সাব্যস্ত হবে। ইরাকী ফকীহগণ ইমাম মালিক র. এর এমন অভিমত সংকলন করেছেন। তবে এমন অপরাধের বেলায় ইমাম মালিক র. এর বহুল আলোচিত মত হলো, উল্লেখিত অপরাধ যদি পিতা কর্তৃক পুত্রের বিরুদ্ধে ঘটে থাকে তাহলে তাকে ইচ্ছাকৃত সদৃশ বলা হবে। তবে অন্যদের ক্ষেত্রে তা ইচ্ছাকৃত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

করে, অথবা এমনভাবে আঘাত করে কারো কোন অঙ্গ কেটে ফেলে বা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, অথবা আঘাতের কারণে কোন অঙ্গের উপকারিতা ও কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা আঘাতের কারণে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা কোন একটি বা উভয় চোখ বেরিয়ে আসে অথবা আঘাতের কারণে আহত ব্যক্তির শরীরে এমন কোন ত্রুটি বা ক্ষতি সাধিত হয় যা কখনো পূরণ হবার নয়, তাহলে এমন অপরাধীকে (৩) তিন বছর থেকে (৫) পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। কিন্তু অপরাধী যদি এই অপরাধ ঘটানোর জন্যে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, অথবা সুযোগের অপেক্ষায় থেকে থাকে তবে তাকে তিন বছর থেকে দশ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা র. ইমাম আবু ইউসুফ র. এবং ইমাম মুহাম্মদ র. এর মত হলো, হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে ইচ্ছাকৃত সদৃশ বলে কোন অপরাধের পর্যায় নেই। শুধু হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেই এমন পর্যায় হতে পারে।[১]

যেসব ইচ্ছাকৃত অপরাধে কিসাস হয় না

উপরে আমরা আলোচনা করেছি, হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের ইচ্ছাকৃত অপরাধে কিসাস ওয়াজিব হয়। তদ্রূপ অপরাধী যদি ইচ্ছাকৃত এমন কর্ম করে যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ কেটে যায় কিংবা কোন অঙ্গের অবয়ব বহাল থাকলেও এর কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে অপরাধীর বিরুদ্ধে কিসাস কার্যকর হবে এবং অপরাধীকে অতটুকু ক্ষতি করা যাবে তার আঘাতে যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

উল্লেখিত বিধানটি যথার্থ তবে এক্ষেত্রে কিসাস কার্যকরী করার জন্যে কিছু শর্ত রয়েছে। কিসাস বাস্তবায়নে এসব শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরী। এসব শর্তাদির কোন একটি শর্ত না পাওয়া গেলে কিসাস কার্যকর হবে না। শর্তগুলোর মধ্যে প্রধানতম শর্ত হলো, অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অঙ্গের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা এবং অপরাধীর আঘাতে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে অপরাধীরও ততটুকু ক্ষতি করার অবকাশ থাকা। উল্লেখিত দু'টি শর্ত ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণসহ বিশদ বর্ণনার অবকাশ রাখে। যাতে কোন কোন অবস্থায় এসব শর্ত পাওয়া যায় না এবং কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে উল্লেখিত অপরাধের কিসাস অকার্যকর সাব্যস্ত হয় তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

---

[১] ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪০/৩৪১; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা. খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪২৯। উল্লেখিত কিতাবসমূহে থাপ্পড়ের আঘাতে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। কাযী আয়ায বলেন, থাপ্পড়ের আঘাতে যদি চোখের সিংহভাগ নষ্ট না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কিসাস সাব্যস্ত হবে না। থাপ্পড়ের আঘাতে যদি চোখের সিংহভাগ বিনষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে এটি ইচ্ছাসদৃশ অপরাধের সাথে তুলনীয় হবে এবং কিসাসের দণ্ড সাব্যস্ত হবে না। ইমাম শাফেয়ী র. উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন। কেননা সাধারণত এমন আঘাতে এ ধরনের ক্ষতি হয় না। তাই তাতে কিসাস কার্যকর হবে না। কিন্তু ফকীহ আবু বকর বলেন, এ ধরনের সব ঘটনাতেই কিসাস কার্যকর হবে। কেননা কুরআনুল কারীমে চোখের বদলে চোখ, শাস্তির বিধানটি অনির্দিষ্ট। বস্তুত থাপ্পড়ের আঘাতে যদি চোখ বেরিয়ে আসে তাহলে সেটি হবে জখমের অন্তর্ভুক্ত। জখমে কিসাস কার্যকরী করার জন্যে অঙ্গহানি ঘটা আবশ্যিক নয়।

www.pathagar.com

সাদৃশ্য না থাকা

হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে অপরাধীর উপর শাস্তিস্বরূপ কিসাস বাস্তবায়নে উভয়ের অঙ্গের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা প্রধান শর্ত। সাদৃশ্য না থাকলে কিসাস কার্যকরী হবে না। যেমন অপরাধী যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ কেটে ফেলে অথবা অপরাধীর আঘাতে কোন অঙ্গের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি এমন হয় যে অপরাধীর দেহে সেই অঙ্গটি নেই। ধরুন, কোন অন্যায় আঘাতের কারণে কারো হাত কাটতে হয়েছে বা কাটা পড়েছে, এমতাবস্থায় যদি অপরাধীর দেহের বাম হাত পূর্ব থেকেই কর্তিত থাকে। বিচারক অপরাধীর ডান হাত কর্তনের নির্দেশ দিতে পারবেন না। কেননা বাম হাত ডান হাতের সাথে কোনই সাদৃশ্য রাখে না। অবস্থানগত দিক থেকেও বাম হাত ডান হাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় এবং কার্যকারিতা ও উপকার বিবেচনায়ও বাম হাতের সাথে ডান হাতের সমকক্ষতা নেই। এক্ষেত্রেও যদি কিসাসের বিধান কার্যকর করা হয়, তা হবে অপরাধীর উপর একটা মারাত্মক জুলুম। তদ্রূপ যেসব ক্ষেত্রে এ ধরনের সাদৃশ্য না পাওয়া যাবে সেসব ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকরী হবে না। অনুরূপ সেই ক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকরী হবে না অপরাধীর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্তের যে অঙ্গ বিনষ্ট হয়েছে বা কাটা পড়েছে যদি অপরাধীর দেহে সেই অঙ্গ মোটেই না থাকে।

একই বিধান হবে অপরাধ যদি এমন কোন অতিরিক্ত অঙ্গের উপর ঘটে যা সৃষ্টিগতভাবেই শরীরে অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য। যেমন ষষ্ঠ আঙ্গুল। তাতেও কিসাস কার্যকরী হবে না। কেননা একটি অতিরিক্ত অঙ্গ মূল অঙ্গের সমকক্ষ হতে পারে না। এর বিপরীতে অপরাধী যদি মূল আঙ্গুল কেটে থাকে এর শাস্তি স্বরূপ অতিরিক্ত আঙ্গুল কাটলে হবে না, মূল আঙ্গুলই কাটতে হবে। বস্তুত একটি অতিরিক্ত অঙ্গের কিসাস স্বরূপ একটি অতিরিক্ত অঙ্গ তখনই কাটা হবে যখন উভয় অতিরিক্ত অঙ্গের অবস্থান ও গঠনের মধ্যে পূর্ণমাত্রার সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। কোন দিক থেকে যদি এই অতিরিক্ত উভয় অঙ্গের মধ্যে সমতা ও সাদৃশ্য না থাকে তাহলে কিসাস কার্যকরী হবে না।

অপরাধী এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি আপসে এ ব্যাপারে সমঝোতা করে নেয় যে, কর্তিত অঙ্গের কিসাস স্বরূপ এমন কোন অঙ্গ কাটা হবে কর্তিত অঙ্গের সাথে যার অবস্থান অবয়ব ও উপকারিতা কোন দিক থেকেই সামঞ্জস্য নেই। তাহলে তাদের এই আপসরফা বা সমঝোতা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এসব অপরাধ এমন যেগুলো ক্ষতিগ্রস্তের সম্মতি কিংবা সমঝোতাকে গ্রাহ্য করে না। কারণ কোন মানুষের এই অধিকার নেই যে, সে

www.pathagar.com

ইচ্ছা করলেই আত্মহত্যা করে ফেলবে। অথবা নিজের কোন অঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কাজেই কেউ যদি অনুমতি দেয় তাতে অন্য কেউ তার শরীরের কোন অংশের ক্ষতি করার বৈধতা পেয়ে যায় না। এসব অপরাধ আল্লাহর অধিকারের বিরুদ্ধাচরণমূলক অপরাধ। কেননা মহান আল্লাহ মানুষের জীবনকে খুবই সম্মানিত করেছেন এবং এর নিরাপত্তাকে আবশ্যিক করেছেন। বস্তুত হক্কুল্লাহর ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানই কার্যকরী হবে।

পূর্ব থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের যদি কার্যকারিতা বিনষ্ট থেকে থাকে কিংবা অনুভূতিহীন হয়ে থাকে তাহলে এর পরিবর্তে কোন সুস্থ অঙ্গ কর্তন করা যাবে না। যেসব অঙ্গে সাদৃশ্য না থাকে সেসব অঙ্গের ব্যাপারে একই বিধান। যেমন ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের আঙুল যদি অসম্পূর্ণ থেকে থাকে তবে সেই হাতের বিপরীতে সুস্থ স্বাভাবিক আঙ্গুল সম্পন্ন হাত কর্তন করা যাবে না।[১]

---

[১] বিস্তারিত অবগতির জন্য দেখুন, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯৭ এবং পরবর্তী; তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানযু দাকায়েক, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১১; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪১; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২১; কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮০; তাতে বলা হয়েছে, উভয় অঙ্গের অভিন্ন নাম ও অবস্থান হতে হবে। সেই সাথে পরিপূর্ণতা ও সুস্থতার দিক থেকেও উভয় অঙ্গের মধ্যে সমতা থাকতে হবে। এতে লেখক এ দুটিকে স্বতন্ত্র দুটি শর্তরূপে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন নয় প্রকৃতপক্ষে এই দুটি একই শর্তের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ ও কিসাস প্রয়োগের অঙ্গের মধ্যে দুভাবে সমতা বিধান করতে হবে। আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৩৮। এতে লেখা হয়েছে, অধিকাংশ ফকীহর অভিমত, ডানের অঙ্গের কিসাস স্বরূপ বামের অঙ্গ এবং বামপাশের অঙ্গের বিপরীতে ডান পাশের অঙ্গে কিসাস কার্যকরী হবে না। এ ব্যাপারে ইমাম মালিক র. ইমাম শাফেয়ী র. আবু হানিফা র. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. সবাই অভিন্ন মত পোষণ করেন। কেননা এসব অঙ্গের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র পরিচয় ও নাম রয়েছে। তাই একটির কিসাস অপর পাশের অঙ্গে প্রয়োগ করা যাবে না। হাতের বদলে যেমন পা কাটা যাবে না। তারা আরো বলেন, ইবনে সিরীন ও শুরাইক র. বলেন, ডানের বদলে বাম এবং বামের বদলে ডান পাশের অঙ্গে কিসাস কার্যকর করা যাবে। কারণ গঠন ও উপকারিতার দিক থেকে ডান বাম একই ধরনের হয়ে থাকে। তারা আরো লিখেছেন, জমহুরের মতামত হলো, অনুভূতি রহিত হয়ে যাওয়া এবং নিষ্ক্রিয় অঙ্গের বিপরীতে সুস্থ সঠিক অঙ্গ কাটা যাবে না। কিন্তু ইমাম দাউদ জাহেরী র. সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হলেও কিসাস কার্যকর করাকে ওয়াজিব মনে করেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিকলাঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় হাতকেও হাতই বলা হয়। তাই কানের সাথে তুলনা করে অচল হাতের বদলে সুস্থ হাত কাটা যাবে। ফকীহ ইবনে কুদামা র., দাউদ জাহেরী র. এ মতের বিরোধিতা করে বলেন, অচল অঙ্গ মানব দেহের সৌন্দর্য বর্ধন ছাড়া আর কোন উপকারে আসে না। যেমন একটি হাতকে বাঁকানো মোড়ানো যায় না। এমন

www.pathagar.com

যে ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়

আর যদি জোড়ায় না কাটে এবং কর্তিত অংশ যদি সেই পরিমাণ না হয় যা দ্বারা অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় এক্ষেত্রেও অপরাধীর উপর কিসাস কার্যকরী হবে না। কেননা কিসাসের ক্ষেত্রে অপরাধী যতটুকু ক্ষতি করেছে ঠিক তার ততটুকু ক্ষতি করার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে কোন অঙ্গ জোড়ায় কর্তিত হওয়া কিংবা এমন জায়গায় কর্তিত হওয়া আবশ্যক যেখানে সাধারণত কাটার প্রচলন রয়েছে। কারণ এমন কিছু অঙ্গ আছে, অপরাধের বিপরীতে অপরাধীর যদি ঠিক ততটুকু অঙ্গ কাটা হয় তাহলে যতটুকু ক্ষতি সে করেছে ঠিক ততটুকু ক্ষতি করা সম্ভব নাও হতে পারে। যেমন নাকের হাড় (Nasal Bone) হাতের তালু, হাতের নিম্নাংশ, (Lower Arm) অর্ধেক পা, হাতের উর্ধ্বাংশ (Upper Arm) অথবা নিতম্ব। এগুলোতে কিসাস নেই। নবী কারীম স. এর সময় এক ব্যক্তি তরবারী দিয়ে অপর একজনের হাতে আঘাত করলে জোড়া থেকে দূরে হাত কেটে যায়। রসূলুল্লাহ স. তার কাছ থেকে দিয়াত আদায় করেন। ক্ষতিগ্রস্ত লোকটি বারবার বলছিল সে এই অপরাধের কিসাস নিতে চায়। কিন্তু রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, দিয়াত নাও, তাতেই তোমাকে আল্লাহ তাআলা বরকত দেবেন'। এক্ষেত্রে একথা মনে রাখতে হবে, এ ধরনের ঘটনায় কিসাস কার্যকর করলে তাতে যথাযথভাবে শাস্তি প্রয়োগ অত্যন্ত কঠিন বরং তা জুলুমের পর্যায়ে চলে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি। হ্যাঁ, যদি কিসাস কার্যকর করার সুযোগ থাকে এবং ক্ষতিগ্রস্তের অঙ্গের হুবহু অংশ কাটা সম্ভব হয় তাহলে কিসাস কার্যকরী হবে।[১]

হাতের বিপরীতে একটি সুস্থ হাত কাটা যাবে না। দাউদ জাহেরী র. এর বক্তব্য কিয়াস নির্ভর। অথচ তার অবস্থা এই যে কিয়াসকে তিনি স্বীকারই করেন না। দু'টি চোখ যদি সুস্থতা এবং দৃষ্টিশক্তির দিক থেকে ভিন্ন ধরনের হয় এমতাবস্থায় কিসাস কার্যকর হয় না। অথচ চোখের বদলে চোখ অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। বস্তুত যে অঙ্গের ব্যাপারে কোন প্রামাণ্য দলিলই নেই, তাতে কোন সংশয় ছাড়াই কিসাস অকার্যকর হবে।

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০৮। কাসানী তাতে লিখেছেন, অপরাধী যদি নাকের হাড় কেটে ফেলে তাতে কোন কিসাস সাব্যস্ত হবে না। কেননা হাড়ের ক্ষেত্রে কোন কিসাস শরীয়ত নির্ধারণ করেনি, পৃষ্ঠা-২৯৮। একটি বাহুতে পেশী, কনুই এবং কাঁধের জোড়া থাকে অদ্রূপ পায়ে গোড়ালী, হাঁটুর জোড়া থাকে। জোড়া ছাড়া যদি অন্য কোন জায়গায় এসব অঙ্গ কাটে তবে কিসাস সাব্যস্ত হবে না।
কাশ-শাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৪। আরো দেখতে পারেন, আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১২৩, প্রকাশক : আস-সাআদাত, মিসর,

www.pathagar.com

প্রশ্ন হতে পারে, পরিপূর্ণ কিসাস যদি কার্যকর করা না যায়, তবে যতটুকু অঙ্গে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব অর্থাৎ তার চেয়ে কম পরিমাণ অঙ্গে কি কিসাস কার্যকরী করা যাবে? যেমন কারো আঘাতে যদি নাকের হাড় এবং নাকের উপরের গোশত কেটে যায় তাহলে শুধু নাকের উর্ধাংশের গোশতের বিনিময়ে কি কিসাস নেয়া যাবে? অথবা হাতের উর্ধাংশ কেটে গেলে কনুই পর্যন্ত কেটে কি কিসাস নেয়া যাবে? ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর কতিপয় অনুসারী এভাবে কিসাস কার্যকরী করার পক্ষে। কারণ এ ক্ষেত্রে কিসাসের দাবিদার পূর্ণ কিসাস কার্যকর করতে পারবে না।

অতএব তার প্রাপ্যের চেয়ে কিছুটা ঘাটতিতেই তাকে সম্মত হতে হবে। তাঁদের দৃষ্টিতে চেহারা ও মাথার আঘাতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান কার্যকর হবে। যেমন 'হাশিমার' ক্ষেত্রে মুজিহা প্রয়োগে কিসাস কার্যকর করা হয়। অর্থাৎ অপরাধীর আঘাতে যদি মাথার হাড় ফেটে গিয়ে থাকে তাহলে কিসাস স্বরূপ তাকে শুধু এতটুকু আঘাত করতে পারবে যাতে শুধু গোশত দূরীভূত হয়ে হাড় গোচরীভূত হয়।[১]

এরপরও যতটুকু থাকবে এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধীর কাছ থেকে অনির্দিষ্ট (Unprescribed Damages) জরিমানার হকদার হবে। কারণ অবশিষ্ট ক্ষতির কিসাস নেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, অবশিষ্টাংশের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোন জরিমানা পাওয়ার হকদার হবে না।

১৩০১ হিজরী; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭১। মাওয়াহিবুল জালীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪২/২৪৮ প্রথম প্রকাশ : ১৩২৯ হিজরী, মাতবা আসসাআদাত, মিসর। ইমাম মালিক র. এর অভিমত হলো, অপরাধী যদি নাকের হাড় ও উপরের অংশ কেটে ফেলে তবে তাতে কিসাস দিতে হবে। এমতাবস্থায় অপরাধীর নাকের হাড়সহ অগ্রভাগ কেটে ফেলতে হবে। কারণ হাড়সহ নাক কাটা সম্ভব। ইমাম মালিক র. এর মতে, নাকের হাড় যদি কাটা হয় তবে তাতেও কিসাস কার্যকর হবে। তার মতে, অর্ধবাহুতেও কিসাস কার্যকরী হবে। যদি তা সঠিকভাবে কাটা সম্ভব হয়। বুকের হাড়, ঘাড়, উরু, পিঠের হাড় ইত্যাদি যেহেতু সঠিকভাবে কাটা কঠিন তাই তাতে কিসাস কার্যকরী হবে না।

১ ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় চেহারা ও মাথার আঘাতকে 'শাজাজ' বলা হয়। শাজাজ এগারো ধরনের। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে। এগারো ধরনের শাজাজ এর মধ্যে 'হাশিমা' বলা হয় এমন আঘাতকে যাতে মাথার হাড় ভেঙে যাবার পরও হাড় যথাস্থানে বহাল থাকে এবং 'মুজিহা' বলে এমন মাথার আঘাতকে, যে আঘাতে গোশত এতোটাই উঠে যায় যার ফলে মাথার হাড় পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু তাতে মাথার হাড়ে কোন আঘাত লাগে না।

www.pathagar.com

কারণ তাকে যদি এই অধিকার দেয়া হয় তাহলে একই অঙ্গে দুই ধরনের শাস্তি তথা কিসাস ও জরিমানা ধার্যের ঘটনা ঘটবে যা গ্রহণযোগ্য নয়।[১]

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে উপরোল্লেখিত মতামত বেশি গ্রহণযোগ্য। কেননা কিসাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কিসাস প্রয়োগের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যতটুকু ক্ষতি হয়েছে শাস্তি এর চেয়ে বেশি হতে পারবে না। এ শর্ত মেনে নিয়েও যদি পরিপূর্ণ কিসাস প্রয়োগ করা না যায় তবে আংশিক প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। এমতাবস্থায় যদি বলা হয়, কিসাস তাতে রহিত হয়ে যাবে, তবে অপরাধীদেরকে আইনের আওতায় ছাড় দেয়ার পথ উন্মুক্ত করা হবে। তখন অপরাধীরা এভাবে মানুষের ক্ষতি করবে যাতে কিসাস প্রয়োগ না করা যায়।

মেরুদণ্ডের হাড় যদি কোন অন্যায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে মেরুদণ্ড বেঁকে যায়,তাতে কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা এক্ষেত্রে হুবহু কিসাস প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও যদি শাস্তি প্রয়োগ করা হয়, অপরাধী যতটুকু ক্ষতি করেছে তার উপর ঠিক ততটুকুই শাস্তি প্রয়োগ করা হবে এ নিশ্চয়তা দেয়া যাবে না।[২]

কোন অন্যায় আঘাতে যদি চোখের পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইমাম মালিক র. ও ইমাম আবু হানিফা র. এবং আমাদের মতে তাতে কিসাস কার্যকরী হবে না। কারণ চোখের পাতায় শাস্তি প্রয়োগের সময় নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সীমিত

---

১ নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১। তাতে লেখা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির এই অধিকার আছে, তার অঙ্গ যে স্থানে কাটা পড়েছে, সে অপরাধীর অঙ্গ ঠিক সেই স্থানের নিকটবর্তী জোড়ায় কাটার দাবি করবে। এক্ষেত্রে শর্ত হলো, যদি এমতাবস্থায় অপরাধীর পুরো অঙ্গ কেটে পূর্ণ কিসাস বাস্তবায়ন সম্ভব না হয় তখন আংশিকভাবেও কিসাস বাস্তবায়ন করার অবকাশ আছে। যে অংশে কিসাস কার্যকর করার অবকাশ নেই, সেই অংশের জন্যে জরিমানা প্রাপ্তির অধিকার আছে। আল-মুহাযযাব, শিরাজী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯২/১৯৩ মাতবাআ আল-বাবী আল-হালবী, কায়রো, ১৩৩৩ হিজরী; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪১৬; আশশারহুল কাবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪২৯।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১১। তাতে লিখা হয়েছে, কারো অন্যায় আঘাতে যদি কারো কোমর বেঁকে যায় বা সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে অথবা কোন হাড় ভেঙে ভেতরের ক্যালসিয়াম বা মগজ বেরিয়ে পড়ে এমতাবস্থায় কোন কিসাস কার্যকর করার সুযোগ নেই। এই অপরাধে অপরাধীর উপর জরিমানা আরোপ করতে হবে।

www.pathagar.com

রাখা সম্ভব হবে না। তাতে অপরাধের অনুরূপ শাস্তি দেয়া অসম্ভব। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী র. ইমাম আহমদ ও অন্য ফকীহগণ বলেন, চোখের পাতা ও অনুরূপ আঘাতের ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকরী হবে। কেননা এটিও ক্ষত বা জখম। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'জখমসমূহের ক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকরী হবে'। এটি একটি বিধিবদ্ধ আইন। যেহেতু চোখের পাতার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে, সেক্ষেত্রে এটি জোড়ার সাথে তুলনীয়।[১] অতএব এটিতে কিসাস কার্যকর করতে হবে।

অণ্ডকোষের কিসাসের ক্ষেত্রেও ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। অনেকেই অণ্ডকোষের কিসাস প্রয়োগের বিপক্ষে। কারণ অণ্ডকোষের কোন সীমা নেই যেখানে কিসাসকে সীমাবদ্ধ করা যায়। এ মতামত ইমাম আবু হানিফা র. এর। ইমাম শাফেয়ী র. ও ইমাম হাম্বল র. এর মতাবলম্বী কোন কোন ফকীহ বলেন, অণ্ডকোষে কিসাস প্রয়োগ সম্ভব। তাদের দলীল সেই আয়াত ' জখমের বদলে জখম'। তারা বলেন, অণ্ডকোষের একটা সীমারেখা আছে, সেখানে গিয়ে কিসাসকে রোধ করা যায়। তাই কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন ছাড়াই এক্ষেত্রে কিসাস প্রয়োগ করা সম্ভব। তদ্রূপ কারো যদি একটি অণ্ডকোষ কেউ অন্যায় আঘাতে কেটে ফেলে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যদি মতামত দেন, অপর অণ্ডকোষের কোন ক্ষতি সাধন ছাড়াই অপরাধীর একটি অণ্ডকোষ কেটে ফেলা সম্ভব তাহলে কিসাস কার্যকর হবে।[২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি দেয়া হবে কিনা এ ব্যাপারে দু'পক্ষের মধ্যে কোন মতভিন্নতা নেই। মতভিন্নতা মূলত কোন অঙ্গে কিসাস বাস্তবায়ন করার শর্ত পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে।

---

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০৮। তাতে লেখা হয়েছে, চোখের পাপড়ীর ক্ষয়ক্ষতির কোন কিসাস ধার্য হবে না। কারণ তাতে অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি কার্যকর করা সম্ভব নয়। সূত্র মাওয়াহিবুল জলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪৭; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৩৩; নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০; আল-মুহাযযাব, আশ-শিরাজী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯১।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১১। অণ্ডকোষ কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর বিপরীতে কিসাস ধার্য হবে না। কারণ এর কোন নির্ধারিত সীমা বা গোড়া নেই যেখানে গিয়ে শাস্তিকে থামিয়ে দেয়া যাবে। তাই অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বিধান সম্ভব হবে না। আল-মুগনী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪২৬; কাশশাফুল কিনা আন-মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৮; নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০. ৩১।

www.pathagar.com

কারো আঘাতে যদি কোন লোকের চোখ বেরিয়ে আসে অথবা চোখ দেবে যায় অথবা চোখের তারা নষ্ট হয়ে যায়, এক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকরী হবে কি হবে না, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। এক পক্ষের মত হলো, এ ধরনের অপরাধে কিসাসের বিধান কার্যকর নয়। কারণ নির্দিষ্ট সীমারেখার ভেতরে এসব আঘাতের কিসাস কার্যকর করা অসম্ভব। কেননা চোখ বের করে ফেলা কিংবা চোখ (Sink Down) দাবিয়ে দেয়ার মধ্যে শাস্তিকে সীমিত রাখার ব্যাপারটি ঝুঁকিপূর্ণ। শাস্তিতে যদি অপরাধীর অপরাধের পরিমাণ সীমিত না রাখা যায় তবে আর শাস্তি ও অপরাধের মধ্যে সমতা থাকে না।

পক্ষান্তরে অপর পক্ষের মত হলো, এতেও কিসাস কার্যকর হবে। কেননা এটিও এক প্রকার জখম। সব ধরনের জখমের মধ্যেই কিসাস কার্যকর হবে। তাঁরা বলেন, চোখ বের হয়ে আসারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। ফলে এটিও জোড়া বিশিষ্ট অঙ্গের সাথে তুলনীয়। তাই অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা পাওয়া যায়। যেহেতু সামঞ্জস্য রয়েছে তাই সব নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে শাস্তি প্রয়োগ করাও সম্ভব।[১]

জিহ্বা ও যৌনাঙ্গ কর্তনের ক্ষেত্রেও একই মতপার্থক্য বিরাজমান। ফকীহদের একটি অংশের মত হলো, জিহ্বা ও যৌনাঙ্গ কর্তনের অপরাধে কিসাস বাস্তবায়ন অসম্ভব। কেননা এই অঙ্গ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হয়। ইমাম আবু হানিফা র. এ মত ব্যক্ত করেন। ইমাম শাফেয়ী ও অন্য ফকীহগণ বলেন, এগুলোতেও কিসাস ওয়াজিব। কেননা এসব অঙ্গেরও একটা শেষ সীমা আছে। যেখানে গিয়ে শাস্তি রুখে দেয়া যায়। এই সীমা জোড়ার সমতুল্য বিবেচিত হবে এবং অপরাধীর উপর কোন প্রকার জুলুম ছাড়াই কিসাস

---

[১] আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০৮। তাতে বলা হয়েছে, যদি কারো আঘাতে চোখ দেবে যায় তবে কিসাস নেই। কারণ অপরাধীকে অনুরূপ আঘাত করলে তার চোখ নাও দাবতে পারে। তখন তা ক্ষতিগ্রস্তের দাবী পূরণ বলে গণ্য হবে না। সূত্র আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪২৮। এতে বলা হয়েছে, অপরাধী যদি তার আঙুল দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তের চোখ বের করে ফেলে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে তা জায়েয হবে না সেও তার আঙুল দিয়ে অপরাধীর চোখ তুলে ফেলবে। কেননা এতে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা সম্ভব হবে না। সূত্র, মাওয়াহিবুল জলীল, পৃষ্ঠা-২৪৮/২৪৮; কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৫; নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০। এতে গ্রন্থকার বলেন, চোখ উপড়ে ফেলার অপরাধে কিসাস ওয়াজিব; কারণ চোখের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, যে সীমাটা জোড়ার মতো।

www.pathagar.com

কার্যকরী করা সম্ভব হবে। বস্তুত তাদের দৃষ্টিতে এগুলোও এক প্রকার জখম। আর যে কোন জখমে কিসাস কার্যকর করা ওয়াজিব।

এ পর্যন্ত আমরা মানব দেহের কোন অঙ্গ অন্যায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা কাটা পড়ার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যদি কারো অন্যায় আঘাতে অঙ্গ দৃশ্যত যথাস্থানে বহাল থাকে কিন্তু অঙ্গের উপকারিতা ও কার্যক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু হানিফা র. ও অন্যদের মতে এক্ষেত্রে কিসাস প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। কেননা অপরাধীর অপরাধের পরিমাণ করে তদনুযায়ী শাস্তি প্রয়োগ করা অসম্ভব। হ্যাঁ, যদি কোন অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতির সমপরিমাণ শাস্তি দেয়া সম্ভব হয় তবে কিসাস কার্যকর হবে।

যেমন কেউ কাউকে প্রহার করলো। তাতে প্রহৃত লোকটির জ্ঞান লোপ পেল, অথবা বাকরুদ্ধ হয়ে গেল কিংবা শ্রবণ বা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলল, অথবা ঘ্রাণ শক্তি এবং স্বাদ অনুভব শক্তির মধ্যে ত্রুটি দেখে দিল। উল্লেখিত সবগুলো অবস্থার মধ্যেই অঙ্গ তার যথাস্থানে বহাল রয়েছে বটে কিন্তু কার্যকারিতা ও উপকারিতা বিনষ্ট হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে শাস্তি স্বরূপ অপরাধীকে অনুরূপ প্রহার করলে অঙ্গের কার্যকারিতা রহিত হবে এবং অঙ্গ দৃশ্যত ঠিক থাকবে তা নিশ্চিত করা আদৌ সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকর রাখা হবে জুলুম ও সীমালঙ্ঘন। বস্তুত কিসাস প্রয়োগে হ্রাসবৃদ্ধি শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ এবং আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য পরিপন্থি। হযরত উমর রা. একটি মোকাদ্দমায় চার প্রকার (Damages) দিয়াতের নির্দেশ দেন। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রহার করলে তার জ্ঞান বোধ, বাক শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং যৌনশক্তি লোপ পায়। উমর রা. অপরাধীদের বিরুদ্ধে চার প্রকার দিয়াতের নির্দেশ জারী করেন। এক্ষেত্রে যদি কিসাস কার্যকরী হতো তাহলে হযরত উমর রা. দিয়াতের হুকুম দিতেন না।[১]

---

[১] আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০৯। এতে লেখা হয়েছে, মাথার আঘাতে যদি জ্ঞান, বুদ্ধি, বাকশক্তি, স্বাদ, অনুভূতি, ঘ্রাণ শক্তি, যৌন শক্তি লোপ পায় তাতে কোন কিসাস হবে না। কারণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় অপরাধীকে এমন আঘাত করা যে আঘাতে অপরাধীর এসব ইন্দ্রিয়শক্তি লোপ পাবে। বস্তুত এক্ষেত্রে অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি প্রয়োগ অসম্ভব। একই কিতাবের ৩০৯ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, ইসলামী শরীয়তে বাকশক্তি শ্রবণশক্তি এবং যৌনশক্তি বিনষ্ট হওয়ার অপরাধে জরিমানাই শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। আরো বিস্তারিত দেখা যেতে পারে পৃষ্ঠা-৩১১ ও ৩১২ তে।

www.pathagar.com

উল্লেখিত আশংকা বা ঝুঁকি থাকার পরও যদি পরিপূর্ণ কিসাস নেয়ার মতো অবস্থা থাকে তবে কিসাস কার্যকর করা ওয়াজিব। যেমন এক লোক অপর একজনকে প্রহার করার কারণে তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেল। যদি এমন ওষুধ বা চিকিৎসা থাকে যা ব্যবহার করলে অপরাধীর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে কিসাস প্রয়োগ করতে হবে।[১] দৃষ্টিশক্তিতে কিসাস কার্যকরী করার প্রমাণ হযরত উসমান রা. এর সময়ের ঘটনা। এক গ্রামীণ লোক একটি দুধেল উটনী নিয়ে শহরে আসে। হযরত উসমান রা. এর এক গোলাম গ্রামীণ লোকটির সাথে কেনাবেচার আলোচনা করল। কথাবার্তার এক পর্যায়ে গোলাম ও গ্রামীণ লোকটির মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। গোলাম লোকটিকে থাপ্পড় মারলে তার একটি চোখ বেরিয়ে পড়ল। হযরত উসমান লোকটিকে বললেন, 'তুমি যদি সম্মত হও তাহলে আমি তোমাকে দ্বিগুণ দিয়াত দেবো, তবে কিসাস মাফ করে দিতে হবে।' কিন্তু লোকটি কিসাস মাফ করতে অস্বীকৃতি জানাল। উসমান রা. উভয়কে হযরত আলী রা. এর কাছে সোপর্দ করলেন। হযরত আলী রা. একটি সীসার পাত আনালেন। সেটিকে আগুনে গরম করলেন। অপরাধীর চোখে তূলা লেপ্টে দিলেন। এরপর উত্তপ্ত সীসাদণ্ডকে চিমটা দিয়ে ধরে অপরাধীর চোখের কাছে নেয়ার পর তার চোখের পুতুল গলে গেল।

তাছাড়া চোখে কর্পুর দিলেও চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে চোখের কোটর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। বর্তমানে চোখের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করার বহু আধুনিক প্রযুক্তি আবিস্কৃত হয়েছে। অবশ্য একটি চোখে কিসাস প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি উভয় চোখের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তবে কিসাস কার্যকর করা যাবে না।[২]

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, অপরাধী যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমন আঘাত করে যাতে চোখের হাড় দেখা যায়। এর ফলে চোখের মনি বহাল থাকলেও আহত

---

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০৭। ক্ষতিগ্রস্তের যদি উভয় চোখ নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, এমতাবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ র. সূত্রে 'নাওয়াদের' কিতাবের লেখক বর্ণনা করেন, এ ধরনের অপরাধে কিসাস ওয়াজিব। বস্তুত দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট ইওয়ার অপরাধেও কিসাস ওয়াজিব। সূত্র তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আলকানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১১। তাতে লেখা হয়েছে, চোখের দৃষ্টিশক্তি যদি নষ্ট হয়ে যায় আর চোখ যথাস্থানে বহাল থাকে, তবে তাতে কিসাস কার্যকরী হবে।

২ আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪২৮ ও তৎপরবর্তী।

www.pathagar.com

লোকটির দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায়ও কিসাস ওয়াজিব হবে এবং অপরাধীকে তদ্রূপ জখম করতে হবে। কিসাস প্রয়োগে যদি অপরাধীর চোখের মনি বহাল থাকে এবং দৃষ্টিশক্তিও অক্ষুণ্ন থাকে তবে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি বিলোপ করতে হবে। আর যদি দৃষ্টিশক্তি শাস্তি প্রয়োগের দ্বারাই বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো উদ্দেশ্য অর্জন হয়েই গেল। কিসাস প্রয়োগে যদি অপরাধীর চোখের মনি অক্ষুণ্ন রাখা না যায় তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু অপরাধীর উপর জরিমানা ধার্য হবে। কারো আঘাতেও যদি দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায় তাতেও একই বিধান কার্যকর হবে।

কারো আঘাতে যদি শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায় তাতেও কিসাস ওয়াজিব হবে। কারণ শ্রবণশক্তিরও একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে। স্বাদ, ঘ্রাণ ও বাকশক্তিও কারো আঘাতে বিনষ্ট হয়ে গেলে কিসাস কার্যকর হবে। এটিই বিশুদ্ধ মতামত। উপরে দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হওয়ার বর্ণনায় যেসব দলীল প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে এক্ষেত্রে সেগুলোই দলীল। মূলত এসব অঙ্গ নির্দিষ্ট জায়গা নিয়ে গঠিত। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অন্য অঙ্গের ক্ষতি সাধন ছাড়াই এগুলোকে নিষ্ক্রীয় ও বেকার করতে সক্ষম। অবশ্য ফকীহদের একটি অংশ মনে করেন, এসব অঙ্গের ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর হবে না।[১]

উল্লেখিত বিষয়গুলোতে হাম্বলী ও শাফেয়ী ফকীহগণ একই অভিমত ব্যক্ত করেন। অবশ্য হাম্বলী মতাবলম্বীগণ থাপ্পড়ের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা বলেন, কারো থাপ্পড়ের আঘাতে যদি কারো কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায় তবে অভিযুক্তকে একটি অনুরূপ থাপ্পড় দেয়া হবে। তাতে যদি তার সেই অঙ্গ বিনষ্ট না হয় তাহলে অন্যকোন প্রক্রিয়ায় অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্ট করা হবে। তারপরও যদি অপরাধীর সংশ্লিষ্ট অঙ্গ বিনষ্ট করা সম্ভব না হয় তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে হাম্বলী মতানুসারী অন্য একটি দলের মতামত হলো, শুধু থাপ্পড় মারাতে কোন কিসাস হয় না, কিসাস মূলত থাপ্পড়ের পরিণতিতে ক্ষতিগ্রস্তের যে অঙ্গহানি ঘটেছে প্রয়োজনে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করে অভিযুক্তের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ অকার্যকর করে ফেলতে হবে।[২]

---

[১] নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২।

[২] কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৯/৩৮০; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪২৮।

www.pathagar.com

কোন অন্যায় আঘাতে কারো অঙ্গের অবয়ব অক্ষুণ্ন থাকাবস্থায় এর উপকারিতা ও কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. একমত পোষণ করেন।[১]

যদি কারো অন্যায় আঘাতে কোন অঙ্গ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে না থাকে। অঙ্গের কার্যকারিতা বা অবয়ব কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; যেমন কারো অন্যায় আঘাতে আহত ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়ে থাকে, অথবা আহত ব্যক্তির কানে উচ্চ শব্দ বাজে, তবে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। কারণ এই অপরাধে ক্ষতিগ্রস্তের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, অপরাধীর অঙ্গে ঠিক ততটুকু ক্ষতিসাধন করা অসম্ভব ব্যাপার। এমনটি করতে গেলে অপরাধীর অঙ্গের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল ঝুঁকি থাকে, অথবা আহতের ক্ষতির চেয়ে অপরাধীর ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যা কিসাস আইনের পরিপন্থী। কেননা অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বিধান না করা হলে তা জুলুম হিসেবে বিবেচিত হবে।[২]

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, কারো অন্যায় হস্তক্ষেপ কিংবা আঘাতে যদি কারো কোন অঙ্গহানি ঘটে কিংবা অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় তাতে কিসাস ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত। অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বিধান করার ব্যাপারেও সবাই একমত। কিন্তু শাস্তি প্রয়োগের শর্তাদির সমন্বয় ও শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা যায়। শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকেই কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউ কিছুটা নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যদি কারো কোন অংগ কেটে যায় অথবা কোন অংগের কার্যকারিতা ও উপকারিতা রহিত হয়ে যায় কিন্তু এর বিচারের প্রশ্নে কিসাস কার্যকরী হওয়ার জন্যে যেসব শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরি এক্ষেত্রে সেসব শর্তাদির কোন একটির যদি ঘাটতি থাকে, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়[৩] কিংবা এই অপরাধমূলক কাণ্ডটি সম্পূর্ণ ভুলবশত

---

১ হাশিয়া আদ-দাসুকী আলা শারহিদ দারুবিয়া, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৬, মাতবা আযহার, ১৩০১ হিজরী; মাওয়াহিবুল জালিল শারহি মুখতাসার আল-খালীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৮।

২ বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪১।

৩ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০৫। তাতে লেখা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত বক্তি তার উপর কৃত অপরাধের প্রতিশোধ স্বরূপ শুধু অপরাধীর অংগ কর্তনের অধিকারীই নয়,

www.pathagar.com

ঘটে থাকে তাহলে উল্লেখিত সব অবস্থাতেই কিসাস কার্যকর হবে না, দিয়াত ওয়াজিব হবে। কারণ এগুলো এমন অপরাধের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে যেগুলোতে কিসাস কার্যকর হয় না। এ ধরনের অপরাধ ইচ্ছাকৃত হোক আর অনিচ্ছাকৃত হোক তার শাস্তির ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়ে না। উল্লেখিত উভয়বিধ অপরাধের ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানা সাব্যস্ত হবে। এটিই জমহুরে ফুকাহার অভিমত।[১]

উল্লেখিত অপরাধে কখনো পূর্ণ দিয়াত সাব্যস্ত হয়, কখনো অর্ধেক দিয়াত আবার কখনো অনির্দিষ্ট (Unprescribed) জরিমানা ধার্য করা হয়।

পূর্ণ দিয়াতের ক্ষেত্র

যদি কোন অংগের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় তখন পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হয়। এটি দুই ধরনের হতে পারে :

১. কর্তিত অংগের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া;

২. অংগ তার অবস্থানে বহাল থাকাবস্থায় কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া।

উভয় অবস্থাতেই অংগের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায়।[২] এমতাবস্থায় কর্তিত অংগটি যদি মানবদেহে মাত্র একটি থাকে তবে পূর্ণ দিয়াত সাব্যস্ত হবে। একাধিক অংগ থাকলেও যদি অংগটি সম্পূর্ণ কাটা পড়ে কিংবা এর কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় তবে পূর্ণ দিয়াত সাব্যস্ত হবে। যেমন, হাড়সহ সম্পূর্ণ নাক যদি কেটে যায় অথবা জিহ্বা কিংবা প্রজনন অংগ

কিসাস নেয়া না নেয়া এবং অংগ নির্বাচনের অধিকারও তার রয়েছে। অবশ্য সবচেয়ে ভালো দিক হলো প্রতিশোধ না নিয়ে অপরাধীকে মাফ করে দেয়া। কারণ ক্ষমার চেয়ে মহোত্তম আর কিছু নেই। আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২১।

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২১২। তাতে লেখা হয়েছে, দিয়াত বা জরিমানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যে অপরাধ ভুলবশত হয়েছে একই অপরাধ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটতো তাহলে অপরাধীর উপর কিসাস ওয়াজিব হতো। যেসব অপরাধ ইচ্ছাকৃত ঘটলেও কিসাস কার্যকর হয় না, সেগুলো ইচ্ছাকৃত হোক আর ভুলবশত হোক তাতে কোন হেরফের ঘটে না। আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মারওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২১, আরো দেখুন– ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪০৩।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০১। তাতে বলা হয়েছে, দিয়াত সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, কোন অংগের কার্যকারিতা ও উপকারিতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়া। এটা দু'ভাবেই হতে পারে। অংগটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিংবা অংগ যথাস্থানে বহাল থাকলেও তার কার্যকারিতার বিলুপ্তি ঘটা।

www.pathagar.com

কাটা পড়ে। এসব অঙ্গ শরীরে একাধিক থাকে না। এসব অংগের কোন একটি কাটা পড়লে জীবনের জন্যেই সেই ব্যক্তির অংগহানি ঘটে। কখনো সে এসবের উপকারিতা ভোগ করতে পারে না। ফলে এসব অপরাধে পূর্ণ দিয়াত সাব্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. এর একটি হাদীসও বর্ণিত আছে।

যদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে কোন অংগের শুধু উপকারিতা ও কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়, অংগ যথাস্থানে বহাল থাকে, যেমন ঘ্রাণশক্তি কিংবা স্বাদ অনুভব শক্তি রহিত হয়ে যায় সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্তের বোধ জ্ঞান শক্তিও লোপ পায় তাহলে উল্লেখিত প্রত্যেকটির বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন দিয়াত বা জরিমানা ধার্য হবে। কেননা, কোন অংগের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতেই দিয়াত ধার্য হয়ে থাকে। হযরত উমর রা. এর শাসনামলে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির পায়ে আঘাত করে। এই আঘাতের কারণে আক্রান্ত লোকটির বাকশক্তি দৃষ্টিশক্তি এবং বোধ ও জ্ঞান সবই লোপ পায়; সেই সাথে তার কার্যশক্তিও রহিত হয়ে যায়। এই মোকদ্দমায় হযরত উমর রা. চারটি জরিমানা ধার্য করেছিলেন। কেননা এসব অংগের কার্যকারিতা ও উপকারিতা সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গিয়েছিল।[১]

কারো অন্যায় আঘাতে যদি আহত ব্যক্তির এমন কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায় যে অঙ্গ মানবদেহে একাধিক থাকে। যেমন চোখ, কান, হাত পা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে নবী কারীম স. থেকে বর্ণিত আছে, এ ধরনের দুটি অংগের বিপরীতে পূর্ণ দিয়াত জরুরি।[২]

কারোর অন্যায় আঘাতে যদি ক্ষতিগ্রস্তের কোন অংগের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত অংগ দৃশ্যত বহাল থাকে। যেমন চোখ দৃশ্যত বহাল থাকে কিন্তু চোখের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, অনুরূপ দৃশ্যত কান ঠিকই রয়েছে কিন্তু শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, এমতাবস্থায়ও অপরাধীকে পূর্ণ দিয়াত পরিশোধ করতে হবে। কেননা এসব অংগের উপকারিতা সম্পূর্ণই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই অঙ্গ দৃশ্যত বহাল থাকা না থাকা

---

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১১, ৩১২; তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৯; হাশিয়া আদ-দাসুকী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৬।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১১; তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৯; আল আহকামুস-সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১১/২১২।

www.pathagar.com

কোন গুরুত্ব বহন করে না।[১] উপরে হযরত উমর রা. এর যে ফয়সালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে দৃশ্যত অঙ্গ ঠিক থাকলেও কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এজন্যই হযরত উমর রা. পূর্ণ দিয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমন কোন অঙ্গ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানব দেহে যে অঙ্গ দুয়ের বেশি থাকে এবং অন্যায় আঘাতে সবগুলোরই কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, এমতাবস্থায়ও পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হবে। যেমন কারো অন্যায় আঘাতে যদি চোখের পাতার কোন প্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা চোখের পাতার কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তাতে পাপড়ী গজানো বন্ধ হয়ে যায় অথবা চোখের সম্পূর্ণ পাতাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক ব্যক্তির চারটি চোখের পাতার সবগুলোই যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। অথবা চোখের পাতা বহাল থাকলেও যদি এগুলোর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় তবুও পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হবে।[২]

উপরে আমরা যেসব ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হয় এ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এছাড়া এমন অবস্থা হতে পারে যাতে দিয়াতের অংশ বিশেষ সাব্যস্ত হয়, আবার কখনো এমন অবস্থাও হতে পারে যাতে নির্ধারিত দিয়াতের চেয়ে বেশি ধার্য করা হয়।

যে অবস্থায় দিয়াতের অংশ বিশেষ নির্ধারণ করা হয়

মানবদেহে যেসব অঙ্গ দুটি থাকে তন্মধ্যে একটি যদি কারো অন্যায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথবা তার কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় যেমন, হাত, কান, চোখ বা ঠোঁটের একটি নষ্ট হয়ে যায়।[৩] উদাহরণত বলা যায়, অপরাধী কাউকে আঘাত করল, তাতে আহত ব্যক্তির উল্লেখিত অঙ্গগুলোর কোন একটি নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু কোন যৌক্তিক কারণে অপরাধীর উপর কিসাস সাব্যস্ত হলো না, কিংবা আঘাতটি ছিল নিতান্তই ভুলক্রমে। এমতাবস্থায় অপরাধীর উপর অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব হবে।[৪] অন্যায় আঘাতে অঙ্গটি কেটে

---

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১১; হাশিয়া আদ-দাসুকী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৬।

২ প্রাগুক্ত।

৩ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৪; তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৯; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়াদী, পৃষ্ঠা-২১১, ২২২।

৪ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২২।

www.pathagar.com

গিয়ে থাকুক বা এর কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে থাকুক।[১] কারণ রসূলুল্লাহ স. এক পত্রে আমর ইবনে হাযমকে এমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাতে এও বলেন, মানবদেহে যে অঙ্গ দুটি থাকে তন্মধ্যে যদি একটি কারো আঘাতে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, কিংবা দৃশ্যত অঙ্গ ঠিক থাকলেও এর কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এই অঙ্গের অর্ধেক কার্যকারিতার বিলুপ্তি ঘটেছে।

আবার কখনো এক-চতুর্থাংশ দিয়াতও ওয়াজিব হয়। মানবদেহে যদি কোন অঙ্গ চারটি থাকে আর তন্মধ্যে কোন একটি কারো অন্যায় আঘাতে নষ্ট হয়ে যায় কিংবা কার্যকারিতা লোপ পায়। যেমন কারো আঘাতে চোখের একটি পাতার কোণা নষ্ট হয়ে গেল, তাতে চোখের পাপড়ী গজানো বন্ধ হয়ে গেল। অথবা চোখের পাতার কোন ক্ষতি হলো না, শুধু পাপড়ী কেটে গেল, অথবা চোখের পাতাও ক্ষতিগ্রস্ত হলো, এমতাবস্থায় এক তৃতীয়াংশ দিয়াত ওয়াজিব হবে।[২]

এছাড়া এমন অবস্থাও হয় যাতে এক-দশমাংশ দিয়াত ওয়াজিব হয়। যেমন কারো অন্যায় আঘাতে যদি কারো হাত পায়ের আঙুলের কোন একটি কেটে যায়, তাতে নির্ধারিত দিয়াতের এক-দশমাংশ ওয়াজিব হবে। কেননা রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, "প্রতিটি আঙুলের বিপরীতে দশটি উট জরিমানা দিতে হবে"।[৩]

কখনো আবার জরিমানা বা দিয়াতের পরিমাণ আরো কম হয়। যেমন এক দাঁতের জরিমানা নির্ধারিত পূর্ণ জরিমানার বিশ ভাগের এক ভাগ। দাঁতের ক্ষেত্রে সব দাঁতের জরিমানাই সমান। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস রয়েছে।[৪]

---

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৪। তাতে বলা হয়েছে, অঙ্গ যদি সম্পূর্ণ কেটে যায় কিংবা অঙ্গ যথাস্থানে বহাল থাকলেও এর কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় এমন উভয় অবস্থায় বিধান একই। অর্থাৎ পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১১-৩১৪; তাবঈনুল হাকায়েক, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৯।

৩ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৪; তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৯।

৪ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৪; তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১২৯/১৩১।

www.pathagar.com

অনুরূপ যে আঙুলে দু'টি জয়েন্ট বা গিরা রয়েছে তন্মধ্যে যদি একটি কারো অন্যায় আঘাতে কেটে যায় তাতেও বিশ ভাগের এক ভাগ দিয়াত ওয়াজিব হবে। কেননা, পূর্ণ একটা আঙুলে এক দশমাংশ ওয়াজিব হয়ে থাকে। তাই একটি আঙুলের একটি জোড়ার ক্ষতির বিপরীতে পূর্ণ আঙুলের অর্ধেক সাব্যস্ত হবে। তদ্রূপ যে আঙুলের তিনটি জোড়া বা গিরা আছে, তন্মধ্যে যদি একটি কারো অন্যায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এর কার্যকারিতার বিলুপ্তি ঘটে তবে একটি পূর্ণ আঙুলের জরিমানার এক-তৃতীয়াংশ সাব্যস্ত হবে।[১]

বর্ধিত দিয়াত

যেসব ক্ষেত্রে নির্ধারিত দিয়াতের চেয়ে অতিরিক্ত জরিমানা ধার্য করা হয় এর উদাহরণ : কারো অন্যায় আঘাতে যদি কোন লোকের সবগুলো দাঁত পড়ে যায় এবং কোন কারণে যদি এক্ষেত্রে কিসাস রহিত হয়ে যায়; অথবা অবস্থা যদি এমন হয় যে, এমন কোন আঘাতে দাঁত ভেঙে যায় যে আঘাতটি সম্পূর্ণ ভুলবশত ঘটে থাকে, এমতাবস্থায় পূর্ণ দিয়াতের সাথে আরো তিন-পঞ্চমাংশ $\frac{৩}{৫}$ অতিরিক্ত জরিমানা দিতে হবে।[২] কেননা সাধারণত প্রত্যেক লোকের বত্রিশটি দাঁত থাকে। প্রতিটি দাঁতের জরিমানা বা দিয়াত $\frac{১}{২০}$ বিশ ভাগের একাংশ তাই (৩২) বত্রিশ দাঁতের জরিমানা $\frac{৩}{৫}$ তিন-পঞ্চমাংশ হয়। এক্ষেত্রে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না, কোন অপরাধজনিত কারণে কোন অঙ্গ বিনষ্ট হোক অথবা এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাক উভয় অবস্থাতে একই বিধান কার্যকর হবে।[৩]

---

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৪; তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১২৯/১৩১।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৫। তাতে বর্ণিত হয়েছে, অপরাধী কাউকে প্রহার করল, তাতে সেই ব্যক্তির সকল দাঁত পড়ে গেল। এতে পূর্ণ দিয়াতের সাথে আরো $\frac{৩}{৫}$ তিন পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত দিয়াত দিতে হবে। কেননা সাধারণত দাঁত ৩২টি থাকে।

৩ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৪।

www.pathagar.com

অতিরিক্ত দিয়াত

কোন ঘটনায় যদি কিসাস, দিয়াত কিংবা নির্দিষ্ট কোন জরিমানা (Prescribed Damages) না থাকে তাহলে অনির্দিষ্ট জরিমানা (Unprescribed Damages) ওয়াজিব হবে। যাতে অপরাধমূলক আঘাতে ক্ষয় ক্ষতি বিনা ভর্তুকিতে থেকে না যায়। এবং এ ধরনের অপরাধ কর্ম ঘটানোর পরও অপরাধী বিনা শাস্তিতে আরো অপরাধপ্রবণ না হয়ে ওঠে।[১] অনির্দিষ্ট জরিমানাকে ন্যায়সঙ্গত (Proper Damages) জরিমানা অথবা ন্যায়বিচার (Judicial Decision) বলা হয়। শরীয়তে যদি কোন ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শাস্তি কিংবা আর্থিক জরিমানার বিধান না থাকে সে ক্ষেত্রে বিচারক এ ধরনের ফয়সালা দিতে পারেন।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে কিসের ভিত্তিতে বিচারক জরিমানা নির্ধারণ করবেন? ইমাম তাহাবী র. বলেন, এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে একজন সুস্থ সবল গোলামের সাথে তুলনা করে তার দিয়াত নির্ধারণ করবেন। অতঃপর সেই ধারণাকৃত গোলামটিকে আহত বিবেচনা করে তার জরিমানা নির্ধারণ করবেন। এরপর এই দুটির মধ্যে পর্যালোচনা করে ব্যবধান নির্ণয় করা হবে। এই ব্যবধানটি হবে নিম্নতম দিয়াতের পরিমাণ। ইসলামী আইনের ভাষায় এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'আলহুকুমাহ' অথবা 'হুকমুল আদল' আদালতের ন্যায়সঙ্গত জরিমানা।

ইমাম কারখী র. বলেন, যেসব অপরাধে কোন নির্দিষ্ট জরিমানা বা শাস্তি নেই, সেগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাছাকাছি এমন অপরাধের সাথে তুলনা করতে হবে যেগুলোর জরিমানা নির্দিষ্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে দু'জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ক্ষতিগ্রস্তের জখম ও জীবনের কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করবেন। বিচারক অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামতের ভিত্তিতে রায় দিবেন। ইমাম কারখী বলেন, বর্ণিত প্রথমোক্ত মতের ভিত্তিতে ফয়সালা করলে এ বিষয়টি সামনে আসে যে, মাথার খুলী বা মাথার যে কোন ছোট্ট আঘাতেও মোটা অংকের জরিমানা সাব্যস্ত হবে এবং মাথার বিপরীতে শরীরের অন্যান্য জায়গায় বড়

---

১ আদ-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২৩। তাতে বর্ণিত হয়েছে, নিয়ম হলো, হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের যেসব অপরাধে কিসাস ও সুনির্দিষ্ট জরিমানার বিধান নেই, তাতে ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করতে হবে। কারণ আইনের মূলসূত্র হলো, নিরপরাধ একজন মজলুম বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত এবং অপরাধীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার অপরাধ কর্মের জন্যে উপযুক্ত শাস্তি ও নিশ্চিত করা জরুরি। যাতে সে অপরাধ কর্মে উৎসাহিত না হয়।

www.pathagar.com

ক্ষতের ক্ষেত্রেও কম জরিমানা ধার্য হবে। যেমন কোন গোলামের আঘাতে যদি গোশতের নিচের ও হাড়ের উপরের আবরণ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে এর জরিমানা হবে বিশ ভাগের এক ভাগের বেশি। গোলামের সাথে তুলনা করে যদি কোন আযাদ লোকের জরিমানা নির্ধারণ করা হয়, তাহলে একই ধরনের আঘাতের জরিমানা বেশি হবে অথচ এটা জায়েয নয়। পূর্বোল্লিখিত মতামতের দলীল হলো সেই উক্তি 'আযাদ ও গোলামের জরিমানার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই'।[১]

যেসব ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত জরিমানা অথবা অনির্দিষ্ট জরিমানা ধার্য হয় এমন অপরাধের উদাহরণ হলো– কেউ যদি কারো কোন অঙ্গ জোড়ার মাঝামাঝি স্থানে কেটে ফেলে এমতাবস্থায় জমহুরের মতে কিসাস প্রয়োগ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন জরিমানার বিধানও নেই। তাই এতে অনির্দিষ্ট জরিমানা সাব্যস্ত হবে।[২]

শরীরের কোন হাড় যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাতেও কোন কিসাস প্রয়োগ সম্ভব নয় এবং তাতে নির্দিষ্ট জরিমানা নেই। এক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত অবস্থার মতো অনির্দিষ্ট জরিমানা সাব্যস্ত হবে। এটিই জমহুরের অভিমত। কেননা, উল্লেখিত অবস্থায় ক্ষতির সমপরিমাণ কিসাস প্রয়োগ অসম্ভব। সেই সাথে যেসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জরিমানার বিধান নেই, সেসব ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট জরিমানার বিধান কার্যকর হবে।[৩]

---

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২৪-৩২৫; তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আলকানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৩; আশ-শারহুল কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬৩৭; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৬২। তাতে তিনি লিখেছেন, অনির্দিষ্ট জরিমানা হলো, বিচারক তার সুবিবেচনা প্রসূত রায় দেবেন। বিচারক বিষয়টি একটি নিখুঁত গোলামের সাথে তুলনা করবেন ত্রুটিপূর্ণ গোলামের বিপরীতে এর মূল্য কি হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় তুলনা করার পর দুটির মধ্যে মূল্যের যে পার্থক্য হবে সেটিই হবে উল্লেখিত ক্ষতির জরিমানা। আত-তাজ ওয়াল ইকলী, আল মুখতাসার আল খলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৫৮। এই কিতাবটি মাওয়াহিবুল জলীল এর হাশিয়াতে ছাপা হয়েছে।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০২। তাতে লেখা হয়েছে, যদি অর্ধেক কেটে ফেলে থাকে তবে তাতে কিসাস সাব্যস্ত হবে না। কারণ জোড়ার অর্ধেকে কাটা পড়লে এর বিপরীতে পূর্ণ জোড়ার কিসাস নেয়া যাবে না। এমতাবস্থায় তাতে ন্যায়সঙ্গত জরিমানা সাব্যস্ত হবে, কারণ তাতে জরিমানা নির্দিষ্ট নেই।

৩ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২৩। সাধারণত যে কোন হাড় ভেঙে গেলে তাতে অনির্দিষ্ট জরিমানা সাব্যস্ত হয়। এক্ষেত্রে দাঁতের বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা, কোন

www.pathagar.com

শরীরের অতিরিক্ত অঙ্গের বিচারের ক্ষেত্রেও অনির্দিষ্ট জরিমানা সাব্যস্ত হবে। যেমন অতিরিক্ত আঙুল। এতে যেমন কোন কিসাস নেই তদ্রূপ নির্দিষ্ট জরিমানার বিধানও নেই। কেননা অতিরিক্ত আঙুলের দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না এবং তা মানবদেহের কোন সৌন্দর্যও বর্ধন করে না। অবশ্য অতিরিক্ত হলেও তা মানবদেহের একটি অংশ। বস্তুত মানবদেহ ও মানব জীবনের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা ওয়াজিব। যদিও এর দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না কিংবা সৌন্দর্য বর্ধন করে না। অবশ্য অতিরিক্ত অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মানুষ কষ্ট পায় এবং তাতে জখম হলে দৃষ্টিকটু লাগে। তাই মানব দেহের যে কোন অংশই ক্ষতিগ্রস্ত হোক না কেন তাতে জরিমানা অবশ্যই সাব্যস্ত হবে।[১]

অনুরূপভাবে যে অঙ্গ তার সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে অক্ষম সেগুলোর ক্ষয়ক্ষতিতেও কিসাস ওয়াজিব হয় না এবং তাতে নির্দিষ্ট কোন জরিমানার বিধানও নেই। যেমন বোবা মানুষের জিহ্বা।[২] যে চোখের দৃষ্টিশক্তি নেই।[৩] অকার্যকর হাত বা পা।[৪] প্রজনন ক্ষমতা রহিতকৃত পুরুষের এবং পুরুষত্বহীন ব্যক্তির বংশদণ্ড।[৫]

এগুলোতে কিসাস নেই। কারণ অকার্যকর এসব অঙ্গের আর কোন অঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই বিধায় শরীয়তের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন জরিমানার বিধান নেই। তবুও যেহেতু এসব অঙ্গ মানবদেহের অংশ এবং

হাড়ের সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব নয়। বস্তুত শরীয়ত এক্ষেত্রে কোন জরিমানা নির্দিষ্ট করে দেয়নি।

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২৩। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৪। আস-সারাখসী, খণ্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১৬৬/১৬৭। আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৬২।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২৩। বোবার জিহ্বা কর্তনে ন্যায়সঙ্গত জরিমানা দিতে হবে। আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৬২।

৩ প্রাগুক্ত।

৪ প্রাগুক্ত। তাতে আরো লেখা হয়েছে, অচল হাত পা কর্তনের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত জরিমানা ধার্য করতে হবে।

৫ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২৩। তাতে বলা হয়েছে, প্রজনন ক্ষমতা রহিতকৃত পুরুষ ও যৌন সঙ্গমে অক্ষম পুরুষের প্রজনন লিঙ্গ কর্তনের অপরাধেও নির্দিষ্ট জরিমানার বিধান নেই। তাতেও বিচারক বিচার বিশ্লেষণ করে ন্যায়সঙ্গত জরিমানা নির্ধারণ করবেন। যেহেতু এই অঙ্গের দ্বারা সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, এজন্যে এর বাহ্যিক অবয়বের তেমন কোন তাৎপর্যগত মূল্য নেই।

www.pathagar.com

শরীয়তের দৃষ্টিতে মানবদেহ অত্যন্ত সম্মানিত ও অর্থবহ (Guaranteed) বস্তু। যদিও এগুলোর অর্থবহ কার্যকারিতা নেই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঠিকই কষ্ট পায় এবং তার দৈহিক সৌন্দর্য এবং গঠনেও কিছুটা বিকৃতি গোচরীভূত হয় ফলে এগুলোর ক্ষতি সাধনের অনির্দিষ্ট জরিমানা সাব্যস্ত হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমের প্রকারভেদ এবং এর বিধান

শাজাজ (شجاج) : মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমকে বলে শাজাজ। শাজাজের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, শাজাজ্ মাথা ও মুখমণ্ডলের ঐ অংশকে বলা হয় যে অংশে হাড় রয়েছে। এসব জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হওয়াকে বলে শাজাজ। যেমন মাথা ও গালের উপরের অংশ যে স্থানে (Malar Bone) হাড় রয়েছে। অথবা চিবুক বা কানপট্টির শক্ত অংশ। ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে, সাধারণত শাজাজ বলতে মাথা ও চেহারার ঐ আঘাতকে বোঝানো হয় যা মগজের উপরিঅংশ (Meninges)-কে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এবং আরো কিছু সংখ্যক ফকীহ বলেন, মাথা এবং চেহারা ছাড়াও অন্য অংশও যদি এ ধরনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তাকেও শাজাজ বলা হবে। কিন্তু জমহুরের বক্তব্য হলো, শাজাজ শব্দ শুধু মাথা ও চেহারার আঘাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মাথা ও চেহারা ছাড়া শরীরের অন্যান্য আঘাতের ক্ষেত্রে জখম (Wound) শব্দ ব্যবহৃত হয়।[১]

---

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯৬। এতে বর্ণিত হয়েছে, শাজাজ বা শাজ্জাহ মাথা বা চেহারার হাড় সর্বস্ব জায়গার আঘাতকে বলা হয়। যেমন, কপাল, গণ্ড, কানপট্টি, থুতনী, চাপা। আম্মাহ্ বলা হয় এমন আঘাতকে যা মাথার মগজ পর্যন্ত চলে যায়। এ ব্যাপারে প্রায় সকল ফকীহের একই মত। অবশ্য কোন কোন ফকীহ বলেন, উল্লেখিত জখমের বিধান শরীরের অন্যান্য জখমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩২। তাতে বলা হয়েছে, শাজাজ শব্দ মাথা ও চেহারার জখম বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য জখম বোঝানোর জন্যে আরবীতে জারাহ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়।' 'আশশারহুল কাবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬১৯ এ লেখা হয়েছে, শাজ্জাহ' শুধুই মাথা ও চেহারার জখম অর্থে ব্যবহৃত হয়।' নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯। উল্লেখিত মতামতে মাথা ও চেহারার আঘাতকে শাজ্জাহ বলা হয় যদিও শাজ্জাহ শব্দ শরীরের অন্যান্য জখমের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

মাথা ও মুখমণ্ডলের আঘাতের প্রকারভেদ

ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে, শাজাজ এগারো (১১) প্রকার। হারিসা, দামুআ, দামিয়া, বাদিআহ্, মুতালাহিমা, সামাহাক, মুদিহাহ, হাশিমাহ, মুনকালাহ, আম্মাহ্ এবং দামিগা।

ইমাম মুহাম্মদ র. নয় প্রকার শাজাজের উল্লেখ করেছেন। তিনি হারিসা এবং দামিগার উল্লেখ করেননি।[১]

ইমাম মালিক র. এর দৃষ্টিতে শাজাজ দশ প্রকার। তিনি হাশিমার উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন, চেহারা ও মাথা ছাড়া অন্যান্য জায়গার আঘাতকে হাশিমাহ বলা হয়।

ইমাম মালিক র. প্রথমে দশ প্রকারের উল্লেখ করেন, দামিয়া, হারিসা, সামাহাক, বাদিআহ্, মুতালাহিমা। অতঃপর ষষ্ঠ স্থানে তিনি 'মাতাহ' নামে এক প্রকার আঘাতের নাম দিয়েছেন।[২]

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ র.-এর মতেও শাজাজ দশ প্রকার। এ দুজন ইমাম 'দামিয়া' কে বাদ দিয়েছেন। এই দু'জনের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে ইমাম আহমদ র. দামিয়াকে বাযিলাও বলে থাকেন। সেই সাথে এ দু'জন আম্মাহ- কে মামুমাও বলেন।[৩]

বিভিন্ন ধরনের শাজাজ হিসেবে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ

উপরে শাজাজের প্রকার হিসেবে কতিপয় আরবী শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী আইনে এগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রকাশ করে। নিম্নে সেগুলোর বিস্তারিত প্রায়োগিক ব্যাখ্যা দেয়া হলো–

---

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯৬। তাতে লেখা হয়েছে, শাজ্জাহ ১১ (এগারো) প্রকার। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর সংখ্যা ৯ (নয়টি) বলেছেন। তিনি 'হারিসা' ও দামিগার উল্লেখ করেননি। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩২। তাতে লেখা হয়েছে, শাজাজের প্রকরণে আম্মাহর পর এক প্রকার জখমের উল্লেখ করা হয় যাকে দামিগা বলা হয়। ইমাম মালিক র. এই প্রকার দুটির উল্লেখ করেননি।

২ আত-তাজ আল ইকলীল, মুখতাসার আল-খলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৫/২৪৭, হাশিয়া আদ-দাসুকী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৩। আশশারহুল কাবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬১৯।

৩ আল-মুহাযযাব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১২। নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯। কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-৮৫। আশশারহুল কাবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬১৯। এটি আল মুগনীর সাথেই ছাপা হয়েছে। আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৬১।

www.pathagar.com

১. **হারিসা :** (Scratch) ছিলে যাওয়া, চামড়া উঠে যাওয়া। এটি এমন ধরনের জখম যা শুধু চামড়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কিন্তু তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় না। আরবী ভাষায় বলা হয় 'হারাসাল কাসসারু ছাওবা' ধোপা কাপড় ফেড়ে ফেলল বা ঘষতে ঘষতে ছিড়ে ফেলল।

২. **দামুআ :** (Tearer) এমন আঘাত যাতে চোখের পানির মতো রক্ত টলমল করতে থাকে কিন্তু ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় না।

৩. **দামিয়া :** (Bleeding) রক্তক্ষরণ। অর্থাৎ যে জখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। কেউ কেউ বলেন, দামিয়া হলো এমন জখম যে জখমে রক্ত দেখা যায় কিন্তু রক্ত সেখান থেকে প্রবাহিত হয় না। যদি এই বক্তব্যকে সঠিক ধরে নেয়া যায় তাহলে দুই নম্বরে উল্লেখিত 'দামুআ'র অর্থ করতে হবে এমন জখম যা থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়।

৪. **বাদিআহ্ :** (Dissection) এমন জখম যাতে চামড়া ফেটে যায়।

৫. **মুতালাহিমা :** এমন জখম যাতে গোশত ফেটে যায় তবে ফাটার পর সেখানকার গোশত আবার মিশে যায় এবং কর্তিত স্থান জোড়া লেগে যায়। ইমাম মুহাম্মদ র. থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে, মুতালাহিমা বাদিআহ্‌র আগে হবে। 'মুতলাহিমা' শব্দটি আরবী 'ইলতাহামা শাইআন' থেকে চয়নকৃত। অর্থ : দু'টি জিনিস পরস্পর মিলে যাওয়া, জড়িয়ে থাকা। এক্ষেত্রে মুতালাহিমার অর্থ দাঁড়ায়– চামড়ার নীচের গোশত গোচরীভূত হয় ঠিক কিন্তু গোশত কাটে না। আর বাদিআহ্‌র ক্ষেত্রে চামড়ার নীচের গোশতও কাটা পড়ে। ফলে সেটির ক্রমিক মুতালাহিমার পরে হবে। বস্তুত ব্যাপকভাবে এটাই চর্চিত যে মুতালাহিমা অর্থই হচ্ছে চামড়ার নীচের গোশত ফেটে যাওয়া। এ অর্থে বাদিআহ্‌র স্থান এর আগে।

৬. **সামাহাক :** (Periosteum) যে জখম গোশত ও হাড়ের মাঝখানে যে পাতলা আবরণ থাকে সেই পর্যন্ত পৌঁছে না। এ ধরনের আঘাতে চামড়ার নীচের গোটা গোশতই কেটে যায় শুধু হাড়ের উপরে পাতলা পিচ্ছিল আবরণ অক্ষুণ্ন থাকে।

৭. **মুযিহাহ :** (Reaches to Bone)-এ ধরনের আঘাত যাতে হাড় পর্যন্ত দেখা যায়। এই আঘাতে চামড়া গোশত ও হাড়ের উপরের পিচ্ছিল আবরণ বহাল থাকে।

www.pathagar.com

৮. **হাশিমাহ :** এমন আঘাত যাতে হাড় ভেঙে যায় বটে কিন্তু স্বস্থানে বহাল থাকে।

৯. **মুনকালাহ :** এমন আঘাত যা হাড়কে ভেঙে দেয়ার সাথে সাথে হাড়কে স্থানচ্যুত করে ফেলে।

১০. **আম্মাহ :** এমন আঘাত যা মগজের আবরণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যে আবরণ মগজকে এক সাথে জমিয়ে রাখে।

১১. **দামিগা :** এমন জখম যা মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ইমাম মুহাম্মদ র. এ প্রকারটির উল্লেখ করেননি। কেননা মগজে আঘাত লাগলে কিংবা রক্তক্ষরণ হলে সাধারণত মানুষ আর জীবিত থাকে না, ফলে এই আঘাত আর শাজাজ পর্যায়ে থাকে না, সরাসরি হত্যার পর্যায়ে চলে যায়।[১]

মাথা ও চেহারার আঘাতে কিসাসের বিধান

ফকীহদের অভিমত এই যে, বর্ণিত সপ্তম পর্যায় অর্থাৎ 'মুযিহাহতে' কিসাস সাব্যস্ত হবে। কেননা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ 'ওয়াল জুরুহু কিসাস' সব ধরনের জখমেই কিসাস রয়েছে। মুযিহাহও এক প্রকার জখম। তাছাড়া এ ধরনের আঘাতেও জখমের একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে যে সীমার ভেতরে থাকলেই কেবল তা মুযিহাহ হিসেবে আখ্যায়িত হয়। এতে যথার্থ প্রতিদান নেয়াও সম্ভব। কারণ এর কিসাসে ব্যবহৃত অস্ত্র বা যন্ত্র হাড়ের আগে থামিয়ে দেয়া সম্ভব।[২] মুযিহাহ-এর পর জখমের যেসব প্রকার বা পর্যায় রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে ফকীহগণ একমত যে এসবের মধ্যে কিসাস কার্যকরী হবে না। কারণ পরবর্তী সবগুলোর মধ্যেই হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর হাড়ের জখমে কোন কিসার্সের বিধান নেই। কারণ এক্ষেত্রে অপরাধের ঠিক সমপরিমাণ শাস্তি নিশ্চিত করা অসম্ভব। হাশিমাতে হাড় ভেঙে যায়, মুনকালাতে হাড় ভেঙে স্থানচ্যুত হয়ে যায়। আম্মাতেও যদি কিসাস কার্যকরী করা হয় তাহলে

---

১ 'শাজ্জাহ' শব্দ ও এর মর্মার্থ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্যে দেখুন, তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩২; নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯/৩০; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৬১/২৬২; আশশারহুল কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬১৯; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, মুখতাসার আল খলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৬/২৪৭।

২ প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

তাতে এই আশঙ্কা থেকে যায় যে প্রতিবিধান করতে গিয়ে অপরাধীর জীবনহানি ঘটে যাবে। অথবা অপরাধের চেয়ে অপরাধীকে বেশি শাস্তি দেয়া হয়ে যাবে। 'দামিগা'র ক্ষেত্রেও এই আশঙ্কা বিদ্যমান।[১]

ক্রমধারায় 'মুযিহাহ' এর আগে যে কয় প্রকার জখমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এগুলোতে কিসাস কার্যকর হবে কি না, এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক র. বলেন, সেগুলোতেও কিসাস কার্যকর হবে। কারণ এ ধরনের আঘাতে অপরাধীকে অনুরূপ শাস্তি দেয়া সম্ভব।[২]

ফকীহ হাসান সূত্রে ইমাম আবু হানিফা র. এর মতামত বর্ণিত হয়েছে, মুযিহাহতে কিসাস ওয়াজিব। সামাহাকে যদি কিসাস কার্যকর সম্ভব হয় তবে তাতেও কিসাস ওয়াজিব হবে।[৩]

জাহের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, মুযিহাহ'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধেও কিসাস ওয়াজিব হবে। কারণ এগুলোতে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তি প্রয়োগ সম্ভব।[৪]

---

১ তাবঈনুল হাকায়েক, শরহুল কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৩; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, মুখতাসার আল-খলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৬/২৪৭। এটি মাওয়াহিবুল জলীল এর হাশিয়ায় ছাপা হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, মাথা ও চেহারায় মুযিহাহ পর্যায়ের আঘাতে কিসাস নেই। অবশ্য মুনকালাহ এর কিসাসের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা রয়েছে। বহুল আলোচিত মতামত হলো, 'ইমাম মালিক র. এর মতে হাড়ের আঘাতে কিসাস কার্যকর হবে। যদি না এক্ষেত্রে ঝুঁকি আশঙ্কাজনক পর্যায়ে থাকে।' আল-মুহাযযাব, শিরাজী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯০। আরো দেখা যেতে পারে, আল-মুহাল্লা, ইবনে হাযম, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৬১। তাতে লেখা হয়েছে, অনেকেই মনে করেন, ইচ্ছাকৃত জখমের অপরাধে মুযিহাহ ছাড়া শাজাজ এর অন্য প্রকারগুলোতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। তারা বলেন, এসব জখমে সমতা রক্ষা করে শাস্তি দেয়া অসম্ভব। এ কথা উদ্ধৃত করার পর ইবনে হাযম বলেন, সঠিক কথা হলো, সব ধরনের শাজাজেই কিসাস কার্যকর হবে। মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশ, 'যার পবিত্রতা অলংঘনীয় তার অবমাননা করলে সবাইকে এর জন্যে কিসাস ভোগ করতে হবে। কেউ যদি তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।' (সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৩) বর্ণিত আয়াতে বিশেষ কোন ধরনের আক্রমণকে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

২ আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, মুখতাসার আল খলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৬।

৩ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০৯।

৪ তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আল কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৩। তাতে লেখা হয়েছে, জাহিরে রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, মুযিহাহর চেয়ে নিম্নের জখমের কিসাস কার্যকর হবে। ইমাম মুহাম্মদ র. 'আসল' গ্রন্থে তাই লিখেছেন। এটা বিশুদ্ধ। কেননা সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিশোধ তাতেই কেবল নেয়া সম্ভব।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, মুযিহার আগে বর্ণিত জখমে কিসাস কার্যকর হবে না। কারণ এ ধরনের জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে না। ফলে এগুলোর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। যে জখমের দৈর্ঘ ও গভীরতা পরিমাপ করা যায়, সেক্ষেত্রে কিসাস প্রয়োগে সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে যায়। এখানে বাদিআহ্ ও সামাহাক এর জখমে কিসাস প্রয়োগ করতে গেলে তা মুযিহাহ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। অথবা এমনও হতে পারে সামাহাক এর কিসাস প্রয়োগের আঘাত মুযিহা'র রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। কেননা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আঘাত গোশতের ভেতরে এ পরিমাণ গভীর হতে পারে এর শাস্তি প্রয়োগ করতে গেলে অপরাধীর জখম মুযিহা বা সামাহাকে পরিণত হওয়ার আশংকা থেকে যায়।[১]

ক্রমধারায় মুযিহার পর শাজ্জাজ এর যে কয়টি প্রকার বলা হয়েছে, এগুলোতেও অন্যান্য ফকীহগণের মতো ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ র. এর মত একই। অর্থাৎ এগুলোতে কিসাস কার্যকরী হবে না। কারণ এগুলোতে অপরাধীর উপর পুরোপুরি শাস্তি প্রয়োগ সম্ভব নয়। অবশ্য এগুলোতে পুরোপুরি প্রতিদান নেয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। তবে ইমামদ্বয় এ মতামতও ব্যক্ত করেন, বর্ণিত অপরাধের বিপরীতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মুযিহার অপরাধীর উপর কিসাস নেয়ার অধিকার রাখে। কারণ ক্রমানুসারে এরপরই যে জখমের বর্ণনা রয়েছে; তা মুযিহার চেয়ে বেশি কঠিন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অপরাধীর উপর মুযিহার প্রতিশোধ নিয়ে নেয় তাহলে সে তার প্রাপ্যের একটা অংশ নিয়ে নিলো।

অবশ্য ইমাম শাফেয়ী র. একথাও বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির এই অধিকারও থাকবে মুযিহার প্রতিশোধ নেয়ার পর এর পরবর্তী ধাপের ক্ষয়ক্ষতির সাথে

---

১ আল-মুহাযযাব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯০; নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০। তাতে বলা হয়েছে, শুধু মুযিহা'য়, কিসাস ওয়াজিব। কারণ এটার অবস্থান নির্দিষ্ট এবং এর সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব। এছাড়া অন্যান্য জখমের অবস্থা এমন নয়। কেউ কেউ বলেন, মুযিহা ও এর ক্রমধারায় এর পূর্বের জখমগুলোতে কিসাসের বিধান কার্যকর। কারণ মুযিহাহ-এর পরিমাণ নির্ণয়ের দ্বারা এগুলোর পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব। এই যুক্তির জবাবে বলা হয়েছে, শুধু এই সম্ভাবনার দ্বারা আংশিক কিসাস কার্যকর হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কারণ উল্লেখিত সম্ভাবনার দ্বারা শুধু এতটুকুই সাব্যস্ত হয়, মুযিহায় যে ধরনের জরিমানা সাব্যস্ত হয় সেগুলোতেও অনুরূপ জরিমানা সাব্যস্ত হয়। মুযিহাহ এর আগে বর্ণিত হারিসাতেও জরিমানা নেই। কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮৫/৩৮৬; আশশারহুল কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৬১।

www.pathagar.com

এর যে পার্থক্য হবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি চাইলে সে এতটুকুর জন্য জরিমানাও উসূল করতে পারবে। কেননা, আহত ব্যক্তি যে পরিমাণের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অপরাধীর এ পরিমাণ ক্ষতি করা সম্ভব না হলে অবশিষ্টাংশের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জরিমানা প্রাপ্তির অধিকারী হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

মুজিহা'র চেয়ে বেশি আঘাতে কিসাস প্রয়োগ সম্ভব নয়, ইমাম শাফেয়ীর এ মতের সাথে হানাফীদের অনেকেই একমত। তবে হানাফীদের একাংশের বক্তব্য হলো, অতিরিক্তের জন্যে জরিমানার অধিকারী হবে না। কারণ তাহলে একই অংগের শাস্তি কিসাস ও জরিমানা উভয়টি একত্রিত হয়ে যায়, যা আইনত বৈধ নয়।[১]

মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমে জরিমানা

ইচ্ছাকৃত কোন অপরাধে যদি কিসাস কার্যকরী করা সম্ভব না হয়, অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিসাসের পরিবর্তে জরিমানা সাব্যস্ত হবে।[২] এই জরিমানা কখনো নির্দিষ্ট হয় আবার কখনো অনির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত, ক্রমধারায় মুযিহাহ এর পূর্ববর্তী সকল জখমে কোন নির্দিষ্ট জরিমানা নেই।[৩] অবশ্য ইমাম আহমদ র. থেকে একটি বর্ণনা এমনও রয়েছে, দামিয়াতে একটি উট, বাদিআয় দু'টি উট, মুতালাহিমায় তিনটি উট। সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এই জরিমানার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। তবে এটি হাম্বলীপন্থীদের সর্বজনগ্রাহ্য মতামত নয়।[৪]

---

১ আল-মুহাযযাব, শিরাজী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯০; আশ্‌শারহুল কবীর,৯খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬১৯।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২২।

৩ তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আল কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৩। তাতে লেখা হয়েছে, হারিসা, দামিআ, দামিয়াহ, বাদিআহ, মুতালাহিমা ও সামাহাকের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত জরিমানা ধার্য হবে। কেননা এগুলোতে নির্দিষ্ট জরিমানা নেই। সেই সাথে এসব অপরাধকে কোন প্রতিকারহীন অবস্থায়ও ছেড়ে দেয়া সমীচীন নয়। এটা ইবরাহীম নাখঈ র. ও উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. এর অভিমত। বাদায়ে আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২৪।

৪ আশ-শারহুল কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬১৯।

www.pathagar.com

মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমের ক্রমধারায় মুযিহার পরের জখমগুলোর অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানা নির্দিষ্ট

১. জমহুর ফকীহগণের মতে মুযিহা'র নির্দিষ্ট জরিমানা (৫) পাঁচটি উট। আঘাত মাথায় হোক আর মুখমণ্ডলে হোক তাতে কোন তারতম্য নেই।[১] ফকীহদের একটি দল মনে করেন, মাথার আঘাতের বিপরীতে চেহারার আঘাতে দুগুণ বেশি জরিমানা ধার্য হওয়া উচিত। কেননা, মাথার চেয়ে চেহারার আঘাত বেশি দৃষ্টিকটু। মাথার জখম চুলের দ্বারা আড়াল করা যায় কিন্তু চেহারার আঘাত আড়াল করা যায় না।[২] ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ র. এর মতে মুযিহা'র পর্যায়ভুক্ত আঘাত চেহারায় হোক আর মাথায় হোক তাতে নির্দিষ্ট জরিমানার চেয়ে বেশি সাব্যস্ত হবে না। ইমাম মালিক র. এর বহুল আলোচিত মত হলো, মাথা কিংবা চেহারার জখম ভরাট হওয়ার পরও যদি দৃষ্টিকটু দেখায় তাহলে দৃষ্টিকটু হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট জরিমানা ছাড়াও ন্যায়সঙ্গত অতিরিক্ত জরিমানা আদায় করা যাবে।[৩]

২. হাশিমা (যে আঘাতে হাড় ভেঙে গেলেও যথাস্থানে বহাল থাকে) পর্যায়ভুক্ত আঘাতে দুটি জরিমানা ধার্য হয়। হাশিমা'য় দশ উট জরিমানার বিষয়টি রসূলুল্লাহ স. এর সরাসরি কোন হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত নয়। সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. থেকে এর পরিমাণ নির্ধারিত। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, এই পর্যায়ের জখমের সম্পর্ক মাথা ও চেহারার সাথে। ইমাম মালিক র. বলেন, মাথা ও চেহারা ছাড়া

---

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৬। তাতে লেখা হয়েছে, মুযিহা যদি ভরাট হয়ে যায় আর সেটির দাগ অবশিষ্ট থাকে তবে তাতে ৫টি উট জরিমানা দিতে হবে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. এর বর্ণনা রয়েছে। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩২/১৩৩। তাতে লেখা হয়েছে, মুযিহায় পূর্ণ দিয়াতের $\frac{১}{২০}$ ওয়াজিব হয়।

২ আশশারহুল কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬৩২।

৩ মাওয়াহিবুল জালীল, শরহে মুখতাসার আল-খলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৫৯। তাতে বলা হয়েছে, মুযিহাহ জখম যদি ভরাট হয়ে যায় এবং এর দাগ দৃষ্টিকটু ও অমর্যাদাকর হয় তবে এ ব্যাপারে তিনটি মতামত রয়েছে। ইমাম মালিক র. ও ইবনে কাসিম র. এর বহুল প্রচারিত মতামত হলো, আহত ব্যক্তির জন্যে আঘাতের চিহ্ন যে পরিমাণ কদর্য ও অমর্যাদার কারণ হবে সেই অনুযায়ী যৌক্তিক জরিমানা ধার্য করা হবে।

www.pathagar.com

শরীরের অন্যান্য অঙ্গের জখমও হাশিমা'র অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালিক র. বলেন, মাথা ও চেহারার আঘাতকে বলা হবে মুনকালাহ।[১]

৩. মুনকালাহ (যে জখমে হাড় ভেঙে স্থানচ্যুত হয়ে যায়) জরিমানার পরিমাণ পনেরোটি উট। আমর ইবনে হাযম রা. এর চিঠিতে নবী কারীম স. থেকে এ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে।[২]

৪. আম্মাহ্ (যে আঘাত মগজের পর্দা পর্যন্ত পৌঁছে যায়) তে তিন ভাগের একভাগ $\frac{১}{৩}$ দিয়াত ওয়াজিব হয়। এটির দলীলও আমর ইবনে হাযম র. এর চিঠি। ইকরামা বিন খালিদ রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম স. আম্মাহ্ পর্যায়ভুক্ত আঘাতে পূর্ণ দিয়াতের $\frac{১}{৩}$ এক-তৃতীয়াংশ জরিমানার ফয়সালা দিয়েছেন।[৩]

৫. দামিগায় (যে আঘাত মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়) দিয়াতের অর্ধেক জরিমানা প্রযোজ্য। শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীদের অনেকেই বলেন, যে জখম মগজের পর্দা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অর্থাৎ আম্মাহ্ পর্যায়ের তাতে অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব।[৪] তা থেকে যে জখম বেশি তাতে

---

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৬। জখম যদি ভরাট হয়ে যায় এবং এর চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, তবে হাশিমাতে $\frac{১}{১০}$ এক দশমাংশ দিয়াত ওয়াজিব হবে। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আল কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬ পৃষ্ঠা, ১৩২/১৩৩। হাশিমার আঘাতে $\frac{১}{১০}$ এক দশমাংশ দিয়াত দিতে হবে। আল-মুহাযযাব, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২১৩। আশশারহুল কবীর, খণ্ড-৯৯, পৃষ্ঠা-৬২৫, ৬২৬।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৬। জখম যদি ভরাট হয়ে যায় এবং এর চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, তবে মুনকালাহ জখমে ১৫টি উট জরিমানা হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ র.-এর নির্দেশ রয়েছে। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩২/১৩৩। মুনকালাতে দিয়াতের এক-দশমাংশ সেই সাথে আরো $\frac{১}{২০}$ এক-বিংশতাংশ সাব্যস্ত হবে।

৩ আল-কাসানী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১৬। জখম যদি ভরাট হয়ে যায় এবং দাগ অবশিষ্ট থাকে তাহলে আম্মায় $\frac{১}{৩}$ ওয়াজিব। আল-মুহাযযাব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৩; আশ-শারহুল কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬২৭/৬২৮।

৪ আল-বাদায়ে, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৬; আল-মুহাযযাব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৩; আশ-শারহুল কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬২৮।

www.pathagar.com

ন্যায়সঙ্গত জরিমানা ধার্য হওয়া উচিত। কেননা দামিআতে আম্মাহ্‌র চেয়ে আঘাত বেশি গভীর হয়, অনেক সময় তাতে পর্দা কেটে যায়।[১]

স্মর্তব্য, ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে, মুযিহা হাশিমা মুনকালাহ এবং আম্মাহ্ পর্যায়ের আঘাত যদি এমন হয় যে, চেহারা থেকে দাগের চিহ্ন মুছে যায়, তাহলে তাতে কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেন, তাতে ন্যায়সঙ্গত অনির্ধারিত জরিমানা ধার্য হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ র. আঘাতের চিহ্ন না হলে শুধু চিকিৎসার খরচাদি দেয়ার পক্ষে।[২]

---

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৬।

২ তাবঈনুল হাকায়েক শরহে আল-কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৫; মাওয়াহিবুল জালীল, শরহে মুখতাসার আল-খলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৬০।

www.pathagar.com

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

জখম (আল-জারাহ্)

ইতঃপূর্বে আমরা শাজাজ তথা মাথার বিভিন্ন ধরনের জখম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ পর্যায়ে আমরা মাথা ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশের জখম সম্পর্কে আলোচনা করবো। ফকীহগণ সব ধরনের জখমকেই জারাহ বলে অভিহিত করেন। যে আঘাতে শরীরের কোন অংশ সম্পূর্ণ কাটা পড়ে না অথবা সম্পূর্ণভাবে কোন অঙ্গ বিকল বা অকার্যকর হয় না এবং যে আঘাত শাজাজ-এর আওতায় পড়ে না ফকীহগণের দৃষ্টিতে তাই 'জারাহ'। বস্তুত মাথা ও মুখমণ্ডল ছাড়া মানবদেহের যে কোন অংশের জখমকেই জারাহ বলা হয়। কেননা, আরবী ভাষায় 'জারাহ' শব্দ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১]

জখম দুই প্রকার

১. এমন জখম যা শরীরের গভীরে পৌঁছে যায় তাকে ফিকহের পরিভাষায় 'জায়িফাহ' বলা হয়। ফিকহের দৃষ্টিতে জায়িফাহ এমন ধরনের জখম যা শরীরের গভীরে (Alimentary Canal) পৌঁছে যায়। কোন কোন ফকীহ যেসব স্থানের জখম শরীরের গভীরে পৌঁছে যায় তথা জাইফাহর পর্যায়ভুক্ত সেগুলো নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন, বুক, পিঠ, উরু, লজ্জাস্থানের মধ্যবর্তী জায়গা ইত্যাদি। কোন কোন ফকীহ গলার শেষভাগ এবং নিতম্বকেও যায়িফাহ'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো, জখম শরীরের গভীর পর্যন্ত পৌঁছালো কিনা। জখম যদি শরীরের গভীরে পৌঁছে যায় তবে সেটিকে ফিকহের ভাষায় 'জায়িফাহ' বলা হবে।[২] কোন কোন ফকীহ বলেন, উপরোল্লিখিত অঙ্গসমূহেই

---

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৬৯।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৮/৩১৯। তাতে লেখা হয়েছে, জায়িফাহ জখমে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত ওয়াজিব হবে। একই কিতাবের ২৯৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, জখম দুই প্রকার (১) জায়িফাহ (২) এবং যা জায়িফাহ নয়। জায়িফাহ হলো, যে জখম শরীরের গভীরে পৌঁছে যায়। যেসব অঙ্গের জখম শরীরের গভীরে পৌঁছে সেগুলো হলো, বুক, পিঠ, পেট, পার্শ্বদেশ, প্রজননাঙ্গ ও পায়ু পথের মধ্যবর্তী জায়গা। হাত, পা, গলা, ঘাড় ইত্যাদিতে জায়িফাহ পর্যায়ের জখম হতে পারে না। কারণ এসব জখম পেট পর্যন্ত পৌঁছে না। ইমাম আবু ইউসুফ র. থেকে একটি উক্তি এমনও রয়েছে, জায়িফাহ্র নির্ধারিত অঙ্গগুলো ছাড়াও যদি অন্যান্য অঙ্গের জখম এমন হয় যে, যেগুলোতে তরল

www.pathagar.com

জায়িফাহ সীমিত নয়। শরীরের যে কোন আঘাতকেই জায়িফাহ বলা যাবে যদি সেটি গভীরে পৌঁছে যায়। মাথার আঘাতকেও জায়িফাহ বলা যায়। সাধারণত গলার নিচ থেকে শরীরের যে কোন অংশের আঘাতকে জায়িফাহ বলা হয়। অবশ্য মাথার আঘাতে যদি আহত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করে তবে সেটিকে শাজাজই বলা হবে যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি।[১]

২. জায়িফাহ পর্যায়ভুক্ত অঙ্গগুলো ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশে যেসব আঘাত হয়ে থাকে, এগুলোকে জারাহ বা জখমই বলা হয়। তা হাড়ে হোক বা শুধু মাংসপেশীতে হোক অথবা শরীরের কোন অংশের হাড় ভেঙে যাক।

জখমের কিসাস (শাস্তি)

জখমের কিসাস সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা র. সহ অনেক ফকীহর মতে ইচ্ছাকৃত জখমেও কোন ধরনের কিসাস নেই, জখম জায়িফাহ পর্যায়ভুক্ত হোক বা এর চেয়ে নিম্নতর হোক তাতে কিসাস কার্যকরী হবে না। কেননা জখমে যথাযথ কিসাস কার্যকরী করা অসম্ভব। জখমে কিসাস প্রয়োগের বিধান কার্যকর হলে অপরাধীর উপর জুলুমের সমূহ আশঙ্কা থাকে, কিসাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমন আশঙ্কামুক্ত হওয়া জরুরি, অন্যথায় কিসাস প্রয়োগ নিষিদ্ধ। কেননা কিসাসের শাস্তি প্রয়োগের আঘাত ও শাস্তির মধ্যে সমতা থাকা প্রধানতম শর্ত।[২]

ওষুধ প্রয়োগ করলে তা পেট পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে তাও জায়িফাহ পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা, জখম যদি শরীরের গভীর পর্যন্ত না পৌঁছে থাকে তবে তাতে দেয়া ওষুধ শরীরের গভীরে কীভাবে যাবে? আল-মুহাযযাব, আশ-শিরাজী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১৪- তে লেখা হয়েছে, জায়িফাহ এমন জখম যা পেট, পিঠ, বুক, নিতম্ব ও গলার কোণা দিয়ে শরীরের গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আত-তাজ ওয়াল-ইকলিল, আল-মুখতাসার আল-খলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৭; আশ-শারহুল কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২৮।

১ তাবঈনুল হাকায়েক শরহে আল-কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৩। তাতে লিখা হয়েছে, তা মাথা ও পিঠ উভয় জায়গায় হতে পারে। কিন্তু যেসব জখম শাজাজের পর্যায়ভুক্ত সেগুলো শুধু মাথা ও চেহারাতেই হয়ে থাকে। কোন কোন ফকীহ বলেন, জায়িফাহ গলার উপরে হয় না।

২ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০৯। তাতে লেখা হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যু থেকে বেঁচে যায় তাহলে এগুলোর কোনটিতেই কিসাস কার্যকর হবে না। জখম জায়িফাহ হোক বা না হোক এমতাবস্থায় সেগুলোতে যথার্থ কিসাস কার্যকর সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ র. সহ ফকীহদের একটি অংশের মতে, যে জখম হাড় উন্মুক্ত করে ফেলে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে। যেমন হাতের ঊর্ধ্বাংশ (বাহু), রান, পায়ের নলা কিংবা পায়ের জখম। কেননা কুরআনুল কারীমের স্পষ্ট ঘোষণা, 'সব ধরনের জখমে কিসাস'। বস্তুত যে সব জখমে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে কিসাস অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী র. এর কোন অনুসারী মনে করেন, মাথা ও মুখমণ্ডলে মুদিহাহ পর্যায়ের জখমে যেমন নির্দিষ্ট দণ্ড রয়েছে, জখমের ক্ষেত্রে অনুরূপ নির্দিষ্ট দণ্ডের বিধান নেই। তাদের এই মত ঠিক নয়। কেননা এমত বিশুদ্ধ 'নস' তথা দলীলের পরিপন্থী। এ ধরনের আঘাত বা জখমে কোন প্রকার সীমাতিক্রম বা জুলুমের আশঙ্কা ছাড়াই শাস্তি কার্যকর করা যায়। কারণ আঘাত হাড় পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। হাড় এমন ধরনের একটি সীমা যেখানে গিয়ে কিসাসকে থামিয়ে দেয়া সম্ভব।

বস্তুত এ ধরনের জখমগুলোকে মুদিহাহর বিধানের পর্যায়ে গণ্য করা যায়। মুদিহাহ পর্যায়ের মাথা ও চেহারার আঘাতে কিসাসের বিধান শুধু নির্দিষ্ট দণ্ডাদেশ থাকার কারণে সাব্যস্ত হয়নি। চেহারা ও মাথার আঘাত অন্যান্য আঘাতের চেয়ে আহতের জন্যে বেশি অমর্যাদা ও অসম্মানের কারণ ঘটে। সেই সাথে মাথা ও চেহারা মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এজন্যই শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে মাথা ও চেহারায় মুদিহাহ'র চেয়ে বেশি সব ধরনের আঘাতে দণ্ড নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অবশ্য সর্বসম্মতভাবে এসব আঘাতে কিসাস ওয়াজিব বলা হয়নি।[১]

জখম যদি হাড় পর্যন্ত না পৌঁছে, যেমন 'জায়িফাহ' অথবা হাড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তবে তাতে কিসাস সাব্যস্ত হবে না। কারণ এমতাবস্থায় অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বজায় রাখা সম্ভব নাও হতে পারে, যেহেতু আঘাতের

---

১ আল-মুহাযযাব, আশ-শিরাজী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৯০; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা-২৬২; আশ-শারহুল কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৬০। শারহুল কবীরে লিখা হয়েছে, জখম যখন হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায় যদি তা চেহারা ও মাথা ছাড়া অন্য অঙ্গ, যেমন ঊর্ধ্ব বাহু, রান ও পায়ের নলাতে হয়ে থাকে তবে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে। হানাফী মাযহাবের অনেক ফকীহ্ মনে করেন, তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। এ ধরনের জখম মাথা ও চেহারার ক্ষেত্রে মুদিহাহ' থেকে জরিমানার ভিন্নতা রাখে তদ্রূপ কিসাসের ক্ষেত্রেও ভিন্ন হবে। কিন্তু প্রমাণিত ও সঠিক মতামত হলো, এসব ক্ষেত্রে যেহেতু কিসাস কার্যকরী করা সম্ভব তাই তাতে কিসাস কার্যকর হবে। এসব জখমে কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন ছাড়াই শাস্তি প্রয়োগ সম্ভব। কারণ জখমের চূড়ান্ত সীমানা জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট থাকে তাই মাথা ও চেহারার মুদিহাহ আঘাতের মতো এক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকর হবে।

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট সীমা নেই। আঘাতের সীমারেখা চিহ্নিত না করা অবস্থায় অপরাধের পূর্ণ প্রতিশোধ অসম্ভব। ফলে এক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর হবে না।[১]

ইমাম মালিক র. বলেন, সব ধরনের জখমেই কিসাস কার্যকর হবে, আঘাত হাড় পর্যন্ত হোক বা না হোক। সেই সাথে আঘাত চামড়া, গোশত, হাড় যেখানেই হোক কিসাস রহিত হবে না। যেমন অপরাধী যদি আহতের শরীরের এক টুকরো গোশত কেটে ফেলে তাতেও কিসাস কার্যকর হবে, যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে আঘাতের গভীরতা ও ব্যাপ্তি পরিমাপ করে ঠিক সেই জায়গায় একই পরিমাণ বদলা নেয়ার অবকাশ থাকে।

ইমাম মালিক র. এর মতে, হাড়ের হাশিমা পর্যায়ভুক্ত আঘাতে যদি কিসাস প্রয়োগের অবকাশ থাকে তবে কিসাস কার্যকর হবে। ঘাড়, রান ও মেরুদণ্ডের হাড় যদি ভেঙে যায় তাতে কিসাস কার্যকর হবে না। কারণ এসব ক্ষেত্রে কিসাস প্রয়োগ করলে অপরাধের চেয়ে অপরাধীর বেশি ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যদি কিসাস প্রয়োগে সীমা অতিক্রমের ঝুঁকি না থাকে তবে ইমাম মালিক র. এর মতে হাড়ের আঘাতেও কিসাস কার্যকর হবে।

কারো অন্যায় আঘাতে যদি বাহু ভেঙে যায়, অথবা বাজু কিংবা পা, হাতের তালু কিংবা আঙুলের হাড় ভেঙে যায় তবে ইমাম মালিক র. এর মতে কিসাস কার্যকর হবে। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের হাড়ের বেলায়ও একই বিধান কার্যকর হবে যদি অপরাধীর জীবনহানির আশঙ্কা না থাকে।

কিসাস কার্যকর করা ঝুঁকিপূর্ণ কিনা এ সিদ্ধান্ত দেবেন একজন অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসক। অভিজ্ঞ কোন চিকিৎসক যদি কোন আঘাতের কিসাস প্রয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মত দেন তবে এক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর হবে না। আর যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ঝুঁকি নেই বলে অভিমত দেন তবে কিসাস কার্যকর হবে।

ইমাম মালিক র. এর মতে, কিসাস কার্যকর না হওয়ার মতো অপরাধের একটি 'জায়িফাহ্'। জায়িফাহ্ হলো এমন আঘাত যা শরীরের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এমতাবস্থায় এটিতে কিসাস প্রয়োগ করলে তাতে জীবনহানির

---

১ আল-মুহাযযাব, আশ-শিরাজী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৯০। তাতে লেখা হয়েছে, প্রথমে জখম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আঘাত যদি হাড় পর্যন্ত না পৌঁছে থাকে, যেমন জায়িফাহ পর্যায়ের আঘাত, কিংবা হাড় ভেঙে গিয়ে থাকে, যেমন বাহুর উর্ধ্বাংশে হাড় ভেঙে যায় তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। কেননা শাস্তির মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। এতে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে না যে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার সীমালঙ্ঘন করবে কিনা। বস্তুত এতে কিসাস রহিত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ঝুঁকি থাকে। এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ইমাম মালিক র. যেসব আঘাতে কিসাস প্রয়োগের পক্ষে সেগুলোর প্রায় সবগুলোই 'জারাহাত' পর্যায়ে পড়ে। এক. সকল জখমেই রয়েছে কিসাসের দণ্ড। কেননা কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে, 'সব ধরনের জখমে কিসাস ওয়াজিব'। বস্তুত ইমাম মালিক র. এর মতে, এসব জখমে পুরোপুরিই বদলা নেয়া সম্ভব।[১] মালিকী মতানুসারীদের মধ্যে ফকীহ ইবনে রুশদ বলেন, ইচ্ছাকৃত আঘাতের জখমের ক্ষেত্রে কিসাসের আয়াত কার্যকরী হবে যদি কিসাস প্রয়োগের অবকাশ থাকে, যদি অপরাধীর মৃত্যু আশঙ্কা না থাকে। ইবনে রুশদ এর এই অভিমতের ভিত্তি রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস। যে হাদীসে রসূলুল্লাহ স. দামিয়া, মুনকালাহ এবং জায়িফাহতে কিসাস রহিত করেছেন। ইমাম মালিক র. ও অন্যান্য ফকীহগণ যেসব জখমের কিসাস প্রয়োগে জীবনাশঙ্কা রয়েছে এগুলোকে উল্লেখিত তিন প্রকার জখমের সাথে তুলনা করেছেন। কারো ঘাড়ের হাড় ভেঙে যাওয়া, মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যাওয়া, বুক ও রানের হাড় ভেঙে যাওয়াকেও তারা উপরোল্লেখিত তিন প্রকার জখমের সঙ্গে তুলনা করে কিসাস প্রয়োগ না হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন।

জখমের ক্ষেত্রে জরিমানা

যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিসাস প্রয়োগের অবকাশ না থাকে অথবা কিসাস প্রয়োগের শর্তাদির কোন শর্ত যদি বিদ্যমান না পাওয়া যায় অথবা কিসাসের হকদারদের কেউ যদি কিসাস ক্ষমা করে দেয় কিংবা ভুলবশত যদি কিসাসযোগ্য কোন অপরাধ ঘটে গিয়ে থাকে, তবে এ সকল অবস্থায় কিসাসের পরিবর্তে জরিমানা ধার্য হবে।[২]

আঘাতের তারতম্য অনুসারে জরিমানায়ও তারতম্য হয়ে থাকে। যদি জায়িফাহ পর্যায়ের আঘাত হয় তবে দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ জরিমানা সাব্যস্ত হবে। কেননা রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'জায়িফাহ্তে' দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ জরিমানা ওয়াজিব। রসূলুল্লাহ স. এ দণ্ডাদেশ ইমরান ইবনে হুসাইন এর নামে ইয়েমেনবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। জায়িফাহ জখম যদি শরীর বিদ্ধ করে বেরিয়ে যায় তাহলে সেটিকে দু'টি জায়িফাহ আঘাত মনে করা হবে এবং তাতে দুই-তৃতীয়াংশ

---

১ মাওয়াহিবুল জলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৭; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, আল মুখতাসার আল খলীল, পৃষ্ঠা-২৪৬, এ কিতাবটি উপরে উল্লেখিত হাশিয়ায় ছাপা হয়েছে।

২ বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৩১।

www.pathagar.com

দিয়াত সাব্যস্ত হবে। ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী তথা অধিকাংশ ফকীহ এ মত ব্যক্ত করেছেন। কোন কোন শাফেয়ী মতাবলম্বী ফকীহ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা জায়িফাহ শরীর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেলেও একটি আঘাতই গণ্য করেন। কেননা, জায়িফাহ্‌র সংজ্ঞা হলো, শরীরের ভেতরে আঘাত পৌঁছে যাওয়া। বস্তুত যে জখম শরীরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে সেটি জায়িফাহ্‌র পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ তাঁরা বলেন, যে আঘাত শরীরের বহিরাংশ থেকে ভেতরের দিকে গেছে তাই জায়িফাহ। আর এই জায়িফার জরিমানা দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ। তাই যেটি শরীরের ভেতর থেকে বাইরের দিকে এসেছে সেটি জায়িফাহ নয় বিধায় ন্যায়সঙ্গত জরিমানা ধার্য করা হবে। জায়িফাহ না হওয়ার কারণে তাতে জরিমানা নির্দিষ্ট করা যাবে না।

যেসব ফকীহ শরীর বিদীর্ণ হওয়া জখমকে দুটি জায়িফাহ মনে করেন, তাদের ভিত্তি কয়েকটি দলীল। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব র. বলেন, হযরত আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি একজনকে তীরবিদ্ধ করল। তীরটি লোকটির শরীর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেল। এই ঘটনায় হযরত আবু বকর দুই-তৃতীয়াংশ দিয়াত নির্ধারণ করেন এবং কোন সাহাবী তাঁর এই সিদ্ধান্তে ভিন্নমত প্রকাশ করেননি। ফলে হযরত আবু বকরের সেই সিদ্ধান্ত সাহাবীদের ইজমারূপে গণ্য হয়। অনুরূপ আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতা ও দাদা থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত উমর রা. এ ধরনের ঘটনায় দুই-তৃতীয়াংশ জরিমানা ধার্য করেছিলেন। যে জায়িফাহ শরীর বিদীর্ণ করে এর মধ্যে এবং ভিন্ন ভিন্ন দুটি জায়িফাহ্‌র মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। দু'টি ভিন্ন ভিন্ন আঘাত যদি শরীরের ভেতর পর্যন্ত জখম সৃষ্টি করে তা একটি আঘাত শরীর বিদীর্ণ করার সমপর্যায়ের। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো, জখম শরীরের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে কিনা। আঘাতটি কিভাবে হয়েছে কোন অবস্থায় হয়েছে এটি বিবেচ্য নয়। যেহেতু উভয় আঘাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এক্ষেত্রে আঘাতকালীন অবস্থার বিষয়টি মূল বিবেচ্য বিষয় নয়।[১]

---

[১] আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪১৮-৪১৯। তাতে লেখা হয়েছে, জায়িফাহ্ যদি শরীর বিদীর্ণ করে ফেলে তবে তাতে দুই-তৃতীয়াংশ দিয়াত ওয়াজিব হবে। এই মতের উপর সাহাবীদের সর্বসম্মত অভিমত (ইজমা) রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবু বকর রা. এর অনুরূপ একটি ফয়সালার ব্যাপারে কোন ভিন্নমত প্রকাশ করেননি। হাশিয়া

www.pathagar.com

জায়িফাহ ছাড়া অন্য কোন ধরনের জখমে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোন জরিমানা নেই। ফলে এ পর্যায়ের সব ধরনের জখমে ন্যায়সঙ্গত জরিমানা বিচারক ধার্য করবেন। ন্যায়সঙ্গত জরিমানা নির্ধারণের বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন দেখা যাবে, ক্ষতস্থান শুকিয়ে ভরাট হয়ে গেছে বটে কিন্তু সেখানে আঘাতের চিহ্ন রয়ে গেছে। ক্ষতস্থান ঠিক হয়ে সেখানে দাগ অবশিষ্ট থাকাটাকে জায়িফাহ্‌র ক্ষেত্রে জরিমানা নির্ধারণের শর্ত বলে ফকীহগণ নির্ধারণ করেছেন।[১]

মালিকী মাযহাবের কোন কোন ফকীহর অভিমত, ন্যায়সঙ্গত জরিমানার সাথে ওষুধ, চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষার ব্যয়ভারও অপরাধীকে বহন করতে হবে।[২]

জখম যদি শুকিয়ে ভরাট হয়ে যায়, আহতের শরীরে ক্ষতের কোন দাগ না থাকে, সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে আঘাতকারীর উপর কোন দণ্ড কার্যকর হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ র. এর মতে, কষ্ট ও যন্ত্রণার জন্যে তাতেও উপযুক্ত জরিমানা সাব্যস্ত হবে। ইমাম মুহাম্মদ র. এতে শুধু চিকিৎসকের সম্মানী ও ওষুধের ব্যয় সাব্যস্ত হবে বলে মত ব্যক্ত করেছেন।[৩]

আদ-দাসুকী আলা শারহে আদ-দারদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১২; আল-মুহাযযাব, আশ-শিরাজী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৪; আশ-শারহুল কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬২৯/৬৩০।

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২০। তাতে লেখা হয়েছে, শরীরের যেসব জখম ভরাট হয়ে যায় এবং কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে, তাতে ন্যায়সঙ্গত জরিমানা ধার্য হবে। ৩২৪ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, জায়িফাহ ছাড়া অন্য কোন জখমে যদি ক্ষত ভরাট হয়ে যায় কিন্তু আঘাতের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, তাতেও ন্যায়সঙ্গত জরিমানা ধার্য হবে। হাশিয়া আদ-দাসুকী শরহে আলা আদ-দারদীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১৬; মাওয়াহিবুল জলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৭; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, মুখতাসার আল খলীল, পৃষ্ঠা-২৪৬; আল মুহাযযাব, আশ-শিরাজী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৪; আশশারহুল কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬৩৮।

২ হাশিয়া আদ-দাসুকী আলা শরহে আদ দারদীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১৬, তাতে লিখা হয়েছে, ইবনে আরাফাহ ডাক্তারের সম্মানী ও ওষুধের মূল্য পরিশোধ করার জন্যে অপরাধীকে বাধ্য করাকে সমর্থন করেন। অবশ্য এমনটি তখনই সম্ভব যখন ক্ষতস্থান সুস্থ হয়ে গিয়ে সেখানে আঘাতের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হয় যে, শরীয়তে এই আঘাতের জরিমানা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে, তবে ক্ষতস্থান ঠিক হয়ে দাগ অবশিষ্ট থাক বা না থাক তাতে শরীয়ত নির্ধারিত জরিমানাই ধার্য হবে।

৩ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২৪, তাতে লিখা হয়েছে, জায়িফাহ ছাড়া সবধরনের জখমে যদি কোন দাগ অবশিষ্ট না থাকে তবে ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে কোন জরিমানা সাব্যস্ত হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ র. ব্যথা ও যন্ত্রণার একটি জরিমানা

www.pathagar.com

ইমাম আহমদ র. এর মতে, তাতে যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত জরিমানা সাব্যস্ত হবে।[১]

ইমাম মালিক র. এর মতে, তাতে কোন জরিমানা সাব্যস্ত হবে না কিন্তু কোন কোন মালিকী মতাবলম্বী ফকীহর মতে, তাতে চিকিৎসক ও ওষুধের মূল্য জরিমানা হিসাবে সাব্যস্ত হবে।[২]

কোন আঘাতে যদি আহত ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করে কিন্তু তার দেহে আঘাতের চিহ্ন ও প্রভাব থেকে যায়, এগুলোর মধ্যে কিছু আঘাত এমনও রয়েছে যেগুলোর প্রভাব দীর্ঘদিন আহত ব্যক্তিকে বহন করতে হয় কিংবা সারাজীবনের জন্যে সেই ঘাটতি থেকে যায়, যেমন হাতের তালু, আঙুল, বাজু অথবা আঙুলের হাড় ভেঙে গেলে আহত ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করলেও এসব অঙ্গ পূর্ণ শক্তি ফিরে পায় না।

কোন কোন ফকীহ বলেছেন, ক্ষতস্থান যদি ঠিক হয়ে যায় এবং জখমের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে তবে তাতে নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট কোন প্রকার জরিমানা সাব্যস্ত হবে না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, এ ধরনের আঘাতের ঘটনায় এই মতাবলম্বী ফকীহগণের দৃষ্টিতে অপরাধী কি ধরনের শাস্তির উপযুক্ত হবে? এ প্রশ্নের বিশদ আলোচনা আমরা 'তাযিরী শাস্তির' অধ্যায়ে করবো। সেখানে মানবদেহের বিরুদ্ধে কৃত শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিশদ আলোচনা করা হবে।

নির্ধারণ করাকে ওয়াজিব মনে করেন। ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, চিকিৎসকের সম্মানী দেয়া জরুরি।

১ আশ্‌শারহুল কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬৩৭।

২ মাওয়াহিবুল জলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৭; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, আল মুখতাসার আল খলীল, পৃষ্ঠা-২৪৬। এ কিতাবটি মাওয়াহিব এর হাশিয়াতে ছাপা হয়েছে; হাশিয়া আদ-দাসুকী আশ শারহে আদ-দারদীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১৬। হাশিয়া আদ-দাসুকীতে লিখা হয়েছে, ইবনে আরাফা মনে করেন, ক্ষতস্থান বা আঘাত শুকিয়ে যাওয়ার পর যদি কোন দাগ বা চিহ্ন না থাকে তবু অপরাধীর উপর ডাক্তারের সম্মানী ও ওষুধের খরচ চাপানো উচিত। তবে শর্ত হলো, জখম এমন হতে হবে যাতে শরীয়ত নির্ধারিত কোন জরিমানা নেই।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী আইনে মানবজীবন ও দেহের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের শাস্তি

ইতঃপূর্বে আমরা ইচ্ছায় হোক আর ভুলক্রমে হোক, ইসলামী আইনে মানবজীবন ও দেহের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের শাস্তি বর্ণনা করেছি। অতঃপর ইচ্ছাকৃত যেসব অপরাধে কিসাস রহিত হয়ে যায় তাও বর্ণনা করেছি। সেই সাথে অনিচ্ছাকৃত অপরাধে জরিমানা ও দিয়াতের আবশ্যিক হওয়া না হওয়ার বিষয়ও আলোচনা করেছি। উপরের আলোচিত অপরাধের সবগুলো পর্যায়ই ছিল অপরাধ ঘটে যাওয়ার পরের বিষয়। সেখানে আমরা সংঘটিত অপরাধের কোন পর্যায় নিয়ে আলোচনা করিনি। এ পর্যায়ে আমরা অপরাধ সংঘটনের পূর্বাবস্থা নিয়ে আলোচনা করাটাকে সমীচীন মনে করছি। মনে রাখতে হবে (ATTEMP OF CRIME) অপরাধ সংঘটনের প্রস্তুতির বিষয়টি সর্বাবস্থায় ইচ্ছাকৃত অপরাধ কর্মের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কেননা অনিচ্ছাকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের প্রস্তুতির বিষয়টিই অবাস্তব। অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অপরাধীর মনে অপরাধ ঘটানোর চিন্তা ক্রিয়াশীল থাকে, যে চিন্তা সে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। আর এমনটি তখনই ঘটে যখন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ ঘটাতে যায়। এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা কেবল ইচ্ছাকৃত ও অসম্পূর্ণ তথা অসম্পাদিত অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

অপরাধকর্মের দু'টি পর্যায়

প্রথমত চিন্তা করা, দ্বিতীয়ত সেই চিন্তা অনুযায়ী অপরাধের প্রস্তুতি নেয়া। ইসলামী আইন শুধু অপরাধের চিন্তা ও পরিকল্পনা করার কারণে কাউকে শাস্তি দেয় না যতক্ষণ না কেউ চিন্তা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী অপরাধ সংঘটনের জন্য কোন পদক্ষেপ নেয়। ইসলামী আইন অপরাধ সংঘটনের প্রস্তুতির জন্যেও কোন দণ্ডারোপ করে না। অপরাধ সংঘটনের এ পর্যায়ে অপরাধ ঘটানোর জন্যে কোন পদক্ষেপ নেয়া শাস্তি প্রয়োগের জন্যে জরুরি। যেমন কোন লোক কাউকে হত্যার জন্য অস্ত্র তাক করল কিংবা কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার জন্যে অস্ত্র উত্তোলন করল অথবা ছোরা বা লাঠি দিয়ে আঘাতের চেষ্টা করল। কেননা রসূলুল্লাহ স. বলেন, "আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের সকল মন্দ চিন্তা ক্ষমা করে দেন যেসব মন্দ চিন্তা

www.pathagar.com

মানুষ মনে পোষণ করে এবং যতক্ষণ তারা চিন্তা বা সংকল্পকে কর্মে পরিণত না করে অথবা মুখে তা ব্যক্ত না করে।"[১]

অপরাধের প্রস্তুতির কারণে কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না, কারণ কেউ অপরাধের প্রস্তুতি নিলেই যে সে অপরাধ ঘটাবে এমনটি নিশ্চিত নয়। হতে পারে লোকটির এই প্রস্তুতি কোন নিরপরাধ কাজের জন্য করেছে। যদি প্রস্তুতির সার্বিক দিক বিবেচনায় বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, লোকটি অপরাধ সংঘটনের জন্য তৈরি হচ্ছিল তবুও তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কারণ এই প্রস্তুতি অপরাধ কর্ম সম্পাদিত হওয়াকে নিশ্চিত করে না। কেননা তার প্রস্তুতি ও অপরাধ সম্পাদনের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকে, এর মধ্যে পরিস্থিতি ও মানসিকতা সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে এবং লোকটি অপরাধের চিন্তা থেকে ফিরে আসতে পারে।

অপরাধ সংঘটনের পদক্ষেপ

অপরাধের সংকল্প ও পরিকল্পনা করার পর যদি অপরাধী অপরাধ সংঘটনে সুনির্দিষ্ট এমন পদক্ষেপ নেয় যাকে অপরাধের সূচনা মনে করা যায়, তবে তার এই সংকল্প অন্যায়রূপে প্রতিফলিত হয়ে গেল। এতে সংকল্পকারীর অপরাধ প্রবণতা বাস্তবে প্রতিফলিত হলো। এমতাবস্থায় সে যদি অপরাধ সংঘটনে কৃতকার্য না হয় তবুও সে শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। কারণ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "দু'জন মুসলমান যদি একে অন্যের প্রতি তরবারি উত্তোলন করে এমতাবস্থায় নিহত ও হত্যাকারী উভয়ই জাহান্নামী হবে।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 'এক মুসলমান যদি অপর মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তবে তাদের উভয়েই জাহান্নামের পাড়ে অবস্থান নেয়। তাদের একজন যদি অপরজনকে হত্যা করে তবে উভয়ই জাহান্নামে প্রবেশ করে।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, দু'জনের একজন তো নিহত হলো, সে জাহান্নামী হবে কেন? রসূলুল্লাহ স. বলেন, সেও তো তার ভাইকে হত্যা করার জন্যে উদ্যত হয়েছিল।[২]

---

১ তাফসীরে রুহুল মাআনী, আল্লামা আলুসী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫০৮, প্রকাশকাল : ১৩০১ হিজরী; সুবুলুস সালাম, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৬/২১৭, প্রকাশকাল : ১৩৫৭ হি. মাতবা ইস্তেকামাহ, কায়রো।

২ আয-যাওয়াজির আন ইকতিরাবিল কাবাইর, ইবনে হাজার আসকালানী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯২, প্রথম প্রকাশ : আলবাবী আল হালবী, কায়রো, ১৩৭০ হিজরী।

www.pathagar.com

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল, নিহত ব্যক্তিও হত্যাকারীকে হত্যা করার জন্যে উদ্যত হয়েছিল যদিও সে সুযোগ পায়নি সেও জাহান্নামী হবে। আরো বোঝা গেল, সে স্বধর্মী এক ভাইকে হত্যার সংকল্প করেছিল এবং সংকল্প বাস্তবায়নে সে হাতিয়ারও ধারণ করেছিল। কোন অপরাধের ক্ষেত্রে অস্ত্র উত্তোলন করা অপরাধের সূচনা। এই সূচনা পর্বের পর সে ইপ্সিত ব্যক্তিকে হত্যাও করতে পারতো। কিন্তু তাতে সে সফল হয়নি কিংবা আঘাত করলেও আহত ব্যক্তি চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে গেছে। অথবা হত্যাকারী তার চূড়ান্ত আঘাত হানার আগেই ইপ্সিত ব্যক্তি পাল্টা আঘাত হানে কিংবা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। বস্তুত উপরে বর্ণিত ইত্যাকার সব অবস্থাই প্রমাণ করে অপরাধী হত্যাকাণ্ড ঘটাতেই এসব পদক্ষেপ নিয়েছিল কিন্তু অন্য কারণে সে তার উদ্যোগে সফল হয়নি। তার এই ব্যর্থতা সংকল্প পরিত্যাগ কিংবা হত্যা পরিকল্পনা থেকে পিছু হটার কারণে হয়নি, বরং অপরাধী ব্যর্থ হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। ফলে সে অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

কেউ যদি কাউকে হত্যার উদ্দেশে গুলি চালায় এবং ইপ্সিত ব্যক্তি সেই গুলিতে আহত হয়, অথবা অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আঘাত করে এবং সেই আঘাতে ইপ্সিত লোকটি আহত হয়, কিন্তু সঠিক চিকিৎসায় আহত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠে এমতাবস্থায় আঘাতকারী হত্যা চেষ্টার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কারণ এক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিদের সুস্থ হয়ে ওঠা আঘাতকারীর হত্যা সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণে হয়নি, বরং যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা নেয়ার কারণে তারা প্রাণে বেঁচে গেছে। বস্তুত এ ধরনের অপরাধে অপরাধী অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। কখনো এমনও ঘটে, কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার জন্য গুলি চালায় কিন্তু লক্ষভ্রষ্ট হয়ে ইপ্সিত লোকের গায়ে আঘাত লাগে না ফলে ইপ্সিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ অক্ষত থেকে যায়। লক্ষভ্রষ্ট হয়ে হোক কিংবা অন্য কোন কারণে হোক নিশ্চিত হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণের কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যাচেষ্টার অপরাধে অপরাধী গণ্য হবে এবং তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো থেকে বিরত থাকা

উপরে বর্ণিত অবস্থাগুলো ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, অন্য কোন অনিচ্ছাকৃত কারণে হত্যাকারী হত্যাকাণ্ডে সফল হয়নি, যে কারণগুলোতে হত্যা চেষ্টাকারীর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যার উদ্দেশ্যে অস্ত্র উত্তোলন করার পর সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় হত্যাকাণ্ড

www.pathagar.com

থেকে বিরত থাকে, এমতবস্থায়ও অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়া হবে। প্রথমত, সে হত্যাচেষ্টা করে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ভয় দেখিয়েছে। দ্বিতীয়ত, সে হত্যার ইচ্ছা করেছিল।[১]

অবশ্য এক্ষেত্রে এমন মতামতও রয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় হত্যাকাণ্ড থেকে ফিরে এসে থাকে তবে তার শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। যাতে সে এ ধরনের অপরাধকর্ম ঘটানোর ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভ করার সুযোগ পায় এবং নিজের আত্মশক্তিতে এমন অপরাধ থেকে বিরত থাকতে পারে। অভিযুক্তকে এই সুযোগ দিলে আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি তার কাছে প্রতিভাত ও বোধগম্য হবে।

অপরাধ সংঘটন থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকার এই উপকারিতা আধুনিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য হবে। কেননা, আধুনিক আইনে অপরাধ কর্মের উদ্যোগ ও পদক্ষেপেও প্রায় অপরাধ সম্পাদনের মতোই শাস্তি দেয়া হয়, কিন্তু ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে এ নিয়ম অকার্যকর। প্রচলিত আইনে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধী শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অপরাধ কর্মটি সম্পূর্ণ করে না। কিন্তু কোন অপরাধী যখন জানতে পারে, অপরাধ কর্মটি সম্পাদন না করলেও অপরাধের উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে তাকে মূল অপরাধ কর্মের মতোই শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন আর সে অপরাধ কর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ বোধ করে না। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধের উদ্যোগ ও পদক্ষেপের অপরাধে সম্পাদিত অপরাধের কাছাকাছি বা অনুরূপ শাস্তি প্রদানের বিষয়টি অপরাধ থেকে স্বউদ্যোগে মানুষকে বিরত থাকার নীতি ও কৌশলের পরিপন্থী।

ইসলামী আইন উপরে উল্লেখিত বিষয়ে প্রচলিত আইনের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামী আইনে অপরাধ সংঘটনের পদক্ষেপে তাযিরী শাস্তি হয়ে থাকে।

---

১ আস-সারাখসী, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-২৭, তাতে লেখা হয়েছে, এক ব্যক্তি কাউকে হত্যার জন্যে তরবারি উত্তোলন করলো কিন্তু সে হত্যা করল না, অথবা কেউ ছুরি বা লাঠি দিয়ে হামলা করতে উদ্যত হলো কিন্তু আঘাত করল না, এমন অপরাধে কি অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হবে? ফকীহগণ বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই তাকে শাস্তি দেয়া হবে, কারণ সে নিরপরাধ মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করেছে এবং একজন মানুষকে হত্যার ইচ্ছা করে হারাম কাজ করেছে। আলফাতওয়া আল আসাদিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৮। তাতে লেখা হয়েছে, অপরাধী বিনা কারণে একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করেছে, পরে যে কোন কারণে সে অস্ত্র প্রয়োগ করেনি। এমতাবস্থায়ও অন্যায় পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে তাকে সতর্ক ও শাসন করার জন্য তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।

www.pathagar.com

তাযিরী শাস্তি প্রকৃতি, অবস্থা ও পরিস্থিতির ভিন্নতায় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কোন অপরাধ কর্মের পদক্ষেপ নিয়েও অপরাধ করা থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকে তাকে তার অবস্থা অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়। শাস্তি নির্ধারণের সময় তার ব্যক্তিগত তৎপরতা বিবেচনা করা হয়। বস্তুত অপরাধ কর্মের পদক্ষেপের শাস্তি অপরাধ সম্পাদনের শাস্তির চেয়ে অনেক কম। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো, ইসলামী আইন প্রয়োগের সময় অপরাধী অপরাধের প্রতি উৎসাহিত হওয়ার মতো কোন উপাদান থাকে না। প্রচলিত আধুনিক আইনে অপরাধী যখন দেখে, অপরাধের পদক্ষেপ নিয়ে অপরাধ থেকে বিরত থাকলেও তাকে অপরাধ সম্পাদনের মতোই শাস্তি ভোগ করতে হবে তখন অপরাধ থেকে বিরত না থেকে সে অপরাধ সম্পাদনেই প্ররোচনা বোধ করে।

অবশ্য এ বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ যে, মূল অপরাধ ঘটানো থেকে যে বিরত থাকে সেও অপরাধের পদক্ষেপ ও সূচনার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কেননা তার পূর্বাপর তৎপরতা সে যে অপরাধ ঘটাতে চাচ্ছিল তা পরিষ্কার করে দেয়। তাছাড়া একজন হত্যা চেষ্টাকারীর হত্যাচেষ্টা দ্বারা ইপ্সিত ব্যক্তির মধ্যে প্রাণ হারানোর ভয় সৃষ্টি করে, এ কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাযিরী শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার কোন অবকাশ নেই।

গ্রন্থকার বলেন, আমার দৃষ্টিতে প্রচলিত আধুনিক দণ্ডবিধির চেয়ে ইসলামী দণ্ডবিধি উত্তম ও বেশি উপযোগী। কারণ ইসলামী আইন অপরাধ সম্পাদনকারী এবং অপরাধের প্রস্তুতি গ্রহণকারীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করে উভয় পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি নির্ধারণ করেছে। কোন কোন অপরাধের প্রস্তুতিও হয় খুবই ভয়ানক, এ পর্যায়টিকে শাস্তির বাইরে রাখা যায় না। অপরাধের প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ নেয়ার পর স্বেচ্ছায় অপরাধ ঘটানো থেকে বিরত থাকলেও অভিযুক্তকে ক্ষমা করা যায় না। কারণ তাতে অনেক গুরুতর অপরাধ থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়ার অবকাশ সৃষ্টি হবে।

হত্যাকাণ্ড ঘটাতে গিয়ে যদি অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত হয়

অপরাধী হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এমন কোন কর্ম করেছে যার দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনহানি ঘটতে পারতো, কিন্তু কোন কারণে আক্রমণকারী নিজ ইচ্ছামত হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করতে পারেনি। এ অবস্থায় হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন না হলেও অপরাধীর আঘাতে আক্রান্ত ব্যক্তির দৈহিক ক্ষতি সাধিত হয়। যেমন আক্রান্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গহানি ঘটে অথবা কোন অঙ্গ

www.pathagar.com

মারাত্মকভাবে জখম হয়। এ ধরনের অপরাধে ইসলামী আইনে নির্দিষ্ট শাস্তি (কিসাস) রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি কিসাসের শর্তাদি বিদ্যমান থাকে, তবে কিসাস কার্যকর হবে। যেমন এ ধরনের আক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ সম্পূর্ণ নষ্ট বা কেটে গেল অথবা বিকল হয়ে গেল অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ কেটে গেল। তবে কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে দিয়াত ধার্য হবে। জরিমানা নির্দিষ্ট পরিমাণও হতে পারে অনির্দিষ্টও হতে পারে। অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তা নির্ণয় করবেন সংশ্লিষ্ট বিচারক।

প্রশ্ন হতে পারে, অপরাধের সূচনা ও পদক্ষেপের জন্যে তাযিরী শাস্তি দেয়া কি জায়েয?

ইমাম আবু হানিফা র. ইমাম শাফেয়ী র. ও ইমাম আহমদ র. এর মূলনীতি হলো, কোন অপরাধে যদি কিসাস কার্যকরী না হয় সে ক্ষেত্রে দিয়াত বা জরিমানা সাব্যস্ত হবে সেই সাথে তাঁরা তাযিরী শাস্তি প্রয়োগেরও পক্ষে, যদি সেখানে সাধারণ মানুষের উপকারের প্রশ্ন জড়িত থাকে। অপরদিকে ইমাম মালিক র. কিসাস, দিয়াত ও জরিমানার পাশাপাশি তাযিরী শাস্তিরও পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কল্যাণ থাকুক বা না থাকুক সেটি ইমাম মালিক র. জরুরী মনে করেননি।[১]

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে, ইমাম মালিক র. এর মতানুসারে উপরে উল্লেখিত ইচ্ছাকৃত হত্যাচেষ্টার অপরাধে অন্যান্য শাস্তির সাথে তাযিরী শাস্তির বিধানও রাখা জরুরী এবং অন্যান্য তাযিরী শাস্তির চেয়ে এই শাস্তি কঠোর হওয়া উচিত; যা একটি পূর্ণাঙ্গ অপরাধের বেলায় প্রয়োগ করা হয়। কেননা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার ইচ্ছা যে কোন সমাজের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এই অপরাধে এমন কঠোর শাস্তির বিধান থাকাই বাঞ্চনীয়।

হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধ সংঘটনের পদক্ষেপ গ্রহণের শাস্তি

হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপারাধেও একই বিধান। কারণ এমনটি হতে পারে যে, অপরাধী আক্রান্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেয়ার ইচ্ছা করেছিল অথবা কোন অঙ্গহানি ঘটানোর সংকল্প করেছিল কিংবা কোন অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্ট করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু অপরাধী তার সংকল্পে সফল হতে পারেনি। কারণ আক্রান্ত ব্যক্তি যথার্থ চিকিৎসা নিয়ে তার আঘাত

---

[১] মাওয়াহিবুল জলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩৭; আত-তাশরীউল জিনাঈল ইসলামী, পৃষ্ঠা-২৪৬-২৪৭।

www.pathagar.com

সারিয়ে তোলে। ফলে তার জখম ভরাট হয়ে শুকিয়ে যায়, কোন দাগ ও চিহ্ন অবশিষ্ট থাকেনি, সেই সাথে কোন স্থায়ী ক্ষতিরও শিকার হয়নি। এমতাবস্থায় জখম করার অপরাধে তাকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে, কিন্তু তার কৃত অপরাধের চেয়েও মারাত্মক অপরাধের ইচ্ছা পোষণ করায় তাকে আরো কঠোর শাস্তি দেয়াটাই হবে যৌক্তিক।[১]

'আল-মাবসূত' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে যেসব মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধে তাযিরী শাস্তি কার্যকর হবে। যেমন– কোন অঙ্গ কেটে ফেলার অপরাধ অথবা কোন অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্ট করে ফেলার অপরাধ কিংবা কোন ক্ষত সৃষ্টি করা কিংবা জখম করার অপরাধ। কারণ এসব আঘাত বা আক্রমণের শিকার ব্যক্তির কোন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও সে নিঃসন্দেহে ভীতসন্ত্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় অপরাধীকে লঘু শাস্তি স্বরূপ তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে নিরপরাধ কাউকে ভীতসন্ত্রস্ত করাও অপরাধ।[২]

মোটকথা, ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা এমন একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেখানে হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না, সবাই সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা, সাম্য, ভ্রাতৃবোধ এবং পারস্পরিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে বসবাস করবে।

---

১ তাবসিবাতুল হুক্কাম, ইবনে ফারহুন, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৭; মাওয়াহিবুল জলীল– খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৭; আত-তাশরীউল জিনাঈল ইসলামী, পৃষ্ঠা-২৪৬।

২ আল-মাবসূত, আস-সারাখসী, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৩২; আল-ফাতওয়া আল-আসাদিয়া– খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৮।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরহত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধের শাস্তি

অপরাধ সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই আমরা প্রমাণ করেছি যে, জনস্বার্থে ও অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন কোন সময় হদ্দ ও কিসাসের শাস্তির সাথে তাযিরী শাস্তিও দেয়া যায়। অবশ্য মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে এ ধরনের তাযিরী শাস্তি যোগ হওয়ার কোনই অবকাশ নেই। কারণ মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়ার পর একই অপরাধীকে তাযিরী শাস্তি দেয়ার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত অপরাধীর ওপর এটি জুলুম হিসেবে বিবেচিত হবে। এ সম্পর্কে পূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

নরহত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে তাযিরী শাস্তির কি বিধান, এ নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করবো। এসব অপরাধ ভুলবশত হোক আর ইচ্ছাকৃত হোক, তাতে যদি কোন কারণে হদ্দ বা কিসাস কার্যকর না হয় তবে কি ধরনের তাযিরী শাস্তি কার্যকর হবে?

এ প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতেই আমরা নজর দেবো, ইচ্ছাকৃত যেসব অপরাধে কিসাস কার্যকর না হয় সেগুলোর দিকে। যেমন, নরহত্যা অথবা এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের ইচ্ছাকৃত অপরাধ কিংবা ইচ্ছাকৃত অপরাধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অপরাধ। এরপর নরহত্যা ও হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের সেইসব অপরাধ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে যেগুলো ভুলক্রমে সংঘটিত হয়। এসব অপরাধে তাযিরী শাস্তি প্রয়োগ জায়েয না নাজায়েয এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সবশেষে ওইসব অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে মানবদেহে যেসব অপরাধের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

প্রথম অনুচ্ছেদ

ইচ্ছাকৃত যে নরহত্যায় কিসাস কার্যকর হয় না

ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, ইচ্ছকৃত নরহত্যায় যদিও ক্ষয়ক্ষতি শুধু নিহত ব্যক্তিরই হয়ে থাকে কিন্তু এই অপরাধ গোটা সমাজ ব্যবস্থারই ক্ষতিসাধন করে। ইসলামী শরীয়ত ইচ্ছাকৃত নরহত্যায় কিসাসের বিধান রেখেছে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে কিসাস (সম-প্রতিশোধ) কার্যকরী করার দাবী উত্থাপনের ক্ষমতা প্রদান করেছে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির

www.pathagar.com

যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এর প্রতিকার হয়। কিন্তু নিহতের উত্তরাধিকারীগণ যদি কিসাস ক্ষমা করে দেয় অথবা অন্য কোন কারণে কিসাস রহিত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে দিয়াত (অর্থদণ্ড) ধার্য হয়। বস্তুত নিহতের উত্তরাধিকারীগণ যদি দিয়াতও ক্ষমা করে দেয় তবে এমতাবস্থায় সমাজ কি অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে, যাতে চিহ্নিত অপরাধী গুরুতর অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে না যায়?

হত্যাকারীর কিসাস যদি নিহতের বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমা করে দেয় এমতাবস্থায় অপরাধীকে কোন তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে কি-না, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম মালিক র. ও ইমাম লাইছ র. বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর কিসাস যদি ক্ষমা করে দেয়া হয় তবে তাকে একশত বেত্রাঘাত করা হবে এবং এক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হবে। মদীনাবাসী ফকীহগণ এ মতের পক্ষে। হযরত উমর রা. থেকেও এমন অভিমতই সংকলিত হয়েছে। ইমাম আবু হানফি র. ইমাম শাফেয়ী র. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. ইমাম ইসহাক র. ও ইমাম আবু ছাওর র. বলেন, যদি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তির কিসাস ক্ষমা করে দেয়া হয়, অথচ সে পেশাদার অপরাধী, তাহলে সমকালীন শাসক নিজ ক্ষমতা বলে তাকে উপযুক্ত যে কোন তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।[১]

---

১ বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৮। তাতে লিখা হয়েছে, যে ইচ্ছাকৃত হত্যার কিসাস ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে যে, প্রশাসন তাকে শাস্তি দিতে পারে কিনা? ইমাম মালিক র. ও ইমাম লাইছ র. বলেন, প্রশাসন তাকে একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের কারাবাসের শাস্তি দিতে পারে। মদীনার ফকীহগণও এ মতের সমর্থক। হযরত উমর রা.-এর সূত্রেও এমন বর্ণনা রয়েছে। ইমাম ইসহাক ও আবু ছাওর র. বলেন, অভিযুক্ত এতে অবশ্য শাস্তিযোগ্য অপরাধী নয়। আবু ছাওর র. বলেন, অপরাধী যদি দুষ্কৃতকারী হিসেবে কুখ্যাত হয় তবে প্রশাসন তার সংশোধনের জন্য উপযোগী শাস্তি দিতে পারে। প্রথম পক্ষের প্রমাণ একটি অতি দুর্বল হাদীস আর দ্বিতীয় পক্ষ জাহেরী রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণ পেশ করেন। এসব ক্ষেত্রে শাস্তি নির্ধারণের পক্ষে কোন না কোন দলীল থাকা জরুরী। অথচ উল্লেখিত অবস্থাগুলোতে শাস্তি দেয়ার পক্ষে কোন নস নেই। সূত্র : তাবসিরাতুল হুককাম, ইবনে ফারহুন। উল্লেখিত কথাগুলো ফাতহুল আলী আল-মালিকীর হাশিয়ায় ছাপা হয়েছে, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৫। তাতে বলা হয়েছে, 'ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে যদি দিয়াত ক্ষমা করে দেয়া হয় তবুও হত্যাকারীর দিয়াতের টাকা পরিশোধ ওয়াজিব এবং তার কাফফারা আদায় করা মুস্তাহাব। তাছাড়াও তাকে শত বেত্রাঘাত ও এক বছর কারাবন্দি রাখা হবে।

www.pathagar.com

ইমাম ইবনে হাযম র. বলে, উত্তরাধিকারীগণ হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার পর আর তাকে কোন ধরনের শাস্তি দেয়া জায়েয নয়। 'ক্ষমা ঘোষণার পর অপরাধীর আর কোন শাস্তি নেই', যারা এই মত পোষণ করেন, তাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা র., ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এবং আবু সুলাইমান ও তার সঙ্গীবৃন্দ রয়েছেন। ইমাম ইসহাক, ইবনে রাহওয়ায়হ্ এবং আহলে হাদীসগণও একই মত পোষণ করেন। ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীস এমত পোষণকারীদের দলীল। হাদীসটি হলো, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিসাস বলবৎ ছিল, কিন্তু রক্ত ঝরানোর কোন শাস্তি ছিল না। ইসলাম আগমনের পর কুরআনুল কারীম ঘোষণা করেছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○

'হে ঈমানদারগণ! নিহতের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা এবং সততার সঙ্গে তার দেয় আদায় করা বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমা লংঘন করে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।"

(সূরা আল-বাকারা : ১৭৮)

ক্ষমার অর্থ হলো ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত গ্রহণ সম্মত হওয়া। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ রেয়াত এবং দয়া। এজন্য হত্যাকারীর কর্তব্য যথারীতি দিয়াত আদায় করা। এরপরও যদি কোন পক্ষ সীমা লংঘন করে তবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে বলে

সূত্র : আদদিয়াত ফিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়া, ড. আলী সাদেক আবু হায়ফ, পৃষ্ঠা-২২-২৩; শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৮, তাতে লেখা আছে : যদি ক্ষমা না করা হয় তবে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে কিসাস কার্যকর করা ওয়াজিব। আর ক্ষমা করে দিলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। যদি এই ক্ষমা কোন ধরনের দেনা-পাওনার বিনিময়ে হয়ে থাকে, তবে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে যে বিনিময় নির্ধারিত হবে তাই পরিশোধ করতে হবে। হত্যাকাণ্ডের দিয়াত হিসেবে যে মূল্য সাব্যস্ত ছিলো তা ওয়াজিব হবে না।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে যেসব ফকীহ দিয়াতের সাথে তাযিরী শাস্তি প্রদানের পক্ষে, তারা নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন,

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ○

'আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না এবং ব্যভিচার করো না, যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে'।

(সূরা আল-ফুরকান : ৬৮)

এখানে হত্যাকাণ্ডকে ব্যভিচারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোন বিবাহিত কিংবা বিবাহিতা ব্যক্তি যদি যেনা করে তবে তার শাস্তি হলো প্রস্তরঘাতে মৃত্যুদণ্ড। আর যদি বিবাহিত না হয় তবে মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে হত্যাকারীকে যদি কোন কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়া না যায় তবে তার ওপর অন্তত অবিবাহিতের শাস্তি কার্যকর হবে। এ মতাবলম্বীগণ তাদের মতের পক্ষে রসূলুল্লাহ স.-এর একটি হাদীসও উদ্ধৃত করেন। 'একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক লোক হাজির হলো, যে তার গোলামকে হত্যা করেছে। রসূলুল্লাহ স. তাকে একশত বেত্রাঘাত করলেন এবং এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দিলেন। এবং গনীমতের সম্পদে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে সেও যে অংশের অধিকারী হয়েছিল তার সেই অংশ বাতিল করে দেন, কিন্তু তার ওপর কিসাসের দণ্ড কার্যকর করেননি। এই ঘটনাটি হযরত উমর রা.-এর বর্ণিত ঘটনা নয়।

ফকীহ ইবনে হাযম র. বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে কিসাস রহিত করার ব্যাপারটির সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, যেনাকে হত্যার সাথে তুলনা করা এক প্রকার কিয়াস। হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে কিয়াসের কোন কার্যকারিতা নেই; এখানে কিয়াস বাতিল। তর্কের খাতিরে কিয়াসকে কার্যকরী ধরে নিলেও এখানে কিসাস ও যেনার মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার। আল্লাহ তাআলা হত্যাকারী ও যেনাকারীকে ইহজাগতিক কোন ব্যাপারের সমতুল্য বলেননি, বরং আখেরাতের ব্যাপারে তাদেরকে একই ধরনের শাস্তির হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে।[১]

---

১ আল-মুহাল্লা, ইবনে হাযম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৬১। এরপর দেখুন, একই কিতাবের পৃষ্ঠা-৭১। নিহায়াতুল মুহতাজ শরহে আল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৭৩। তাতে

www.pathagar.com

গ্রন্থকার ড. আবদুল আযীয আমের বলেন, আমার মত হলো, হত্যাকারীর কিসাস যদি ক্ষমা করে দেয়া হয় তাহলে তার অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা বিচার করে উপযুক্ত তাযিরী শাস্তি দেয়া উচিত। মানবিক চাহিদাও তাই দাবি করে। অপরাধীদের সংশোধনের জন্যও তাদের শাস্তি দেয়া জরুরী। পক্ষান্তরে এর বিপরীত মত যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে কিসাস ক্ষমা করে দেয়ার পর অপরাধী সব ধরনের শাস্তি থেকেই রেহাই পেয়ে যায়। কারণ নিহতের উত্তরাধিকারীগণ অনেক ক্ষেত্রে দিয়াতও ক্ষমা করে দেয়। তখন অপরাধী সব ধরনের শাস্তি থেকেই খালাস পেয়ে যায়। অথচ সে গুরুতর একটা সামাজিক অপরাধ করেছে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পবিত্র ঘোষিত নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে।

কিসাস প্রয়োগের শর্তগুলোর মধ্যে যদি কোন শর্ত অপরাধীর মধ্যে বিদ্যমান না থাকে তবে অপরাধীকে বিনা বিচারে ছেড়ে না দিয়ে তাযিরী শাস্তি দিতে হবে। যেমন, পিতা পুত্রকে হত্যা করেছে। এ ক্ষেত্রে যারা পুত্র হন্তা পিতাকে কিসাসের শাস্তি স্বরূপ হত্যার বিপক্ষে, তারা বলেন, এমতাবস্থায় পিতার বিরুদ্ধে তাযিরী শাস্তি কার্যকর হবে। অনুরূপ হত্যার হুকুমদাতা এবং হত্যা বাস্তবায়নকারীর শাস্তির ক্ষেত্রে এবং কোন কারণে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে যারা কিসাস কার্যকর করার বিপক্ষে তারা উল্লিখিত অবস্থাগুলোতে তাযিরী শাস্তিদানের পক্ষে। মোটকথা, যেসব অবস্থায় কোন কারণে অপরাধীর ওপর কিসাস কার্যকর হয় না, সেসব ক্ষেত্রে তাযিরী শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কারণ অপরাধী যে অপরাধ কর্ম করেছে, তা সর্বাবস্থায় হারাম। যেহেতু এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট শাস্তি দেয়ার অবকাশ নেই সেহেতু তাযিরী শাস্তি প্রয়োগ করা জরুরী।[১]

লেখা আছে, অনেক সময় তাযিরী শাস্তির সাথে কাফফারা একীভূত হয়ে যায়। শরহে আল মিনহাজের হাশিয়ার ১৭৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, যেসব হত্যাকাণ্ডে কিসাস ওয়াজিব হয় না, তন্মধ্যে একটি হলো, পিতা কর্তৃক পুত্র হত্যা। কাশ্‌শাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭২; মুঈনুল হুককাম, পৃষ্ঠা-১৭৭। তাতে লেখা আছে, এক ব্যক্তি কাউকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখলো কোন হিংস্রজন্তু এসে লোকটিকে মেরে ফেলল। তাতে কিসাস ও দিয়াত কোনটাই ওয়াজিব হবে না বটে কিন্তু বেঁধে রাখার কারণে অভিযুক্তকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। তাকে আমৃত্যু বন্দি রাখা হবে। আবু হানিফা র.-এর মতে, এতে দিয়াত ওয়াজিব হবে।

১ হাশিয়া ইবনে আবদীন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৪/১৮৫; আস-সিয়াসাতুর রাঈয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-৫৫; আল-কাসানী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩৪।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের অপরাধে তাযিরী শাস্তি

হানাফী ফকীহদের সর্বসম্মত মূলনীতি হলো, হত্যার যেসব অবস্থায় কিসাস কার্যকর হয় না, যেমন বড় কাঠ, পাথর কিংবা এ ধরনের ভারী জিনিসের দ্বারা কৃত হত্যা। এসব অপরাধ যদি একই অপরাধীর দ্বারা একাধিকবার ঘটে তাহলে প্রশাসন তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে, যদি তাতে কোন সার্বিক কল্যাণ থাকে। যেমন কোন অপরাধী কাউকে শ্বাসরোধ করে, পানিতে ডুবিয়ে অথবা উঁচু জায়গা থেকে নীচে ফেলে হত্যা করার ঘটনা বারবার ঘটায়, তাহলে তাযিরের আওতায় তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়, যদি তাকে বিরত রাখার অন্য কোন পথ না থাকে। ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে যদিও কিসাস ওয়াজিব হয় না কিন্তু এগুলো হত্যাকাণ্ডের একটি ধরন। আর হত্যাকাণ্ডে মৃত্যুদণ্ড বিধেয়।

ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের কোন কোন অবস্থায় এবং কিছু শর্তের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যায়, যেহেতু এই অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, তার অনিষ্ট থেকে মানুষকে নিরাপত্তা দেয়া। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া যদি অন্য কোন উপায়ে এই উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তাহলে তাযিরী শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত অন্য কোন শাস্তি প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।

ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের যদি পুনরাবৃত্তি না ঘটে

অপরাধী যদি ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না ঘটায়, প্রথম সে এমন একটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে, তাহলে তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে কি-না? 'কাশশাফুল কিনা' গ্রন্থের রচয়িতা 'আল-মাবদা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে তাযিরী শাস্তি ওয়াজিব। কেননা, এই অপরাধে যে বাধ্যতামূলক কাফফারা প্রযোজ্য হয় তা আল্লাহর হক হিসেবে বিবেচিত, যেমন ভুল হত্যাকাণ্ডে ধার্যকৃত কাফফারা আল্লাহর হক হিসেবে সাব্যস্ত। এই কাফফারা নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের অপরাধে প্রযোজ্য হয় না, বরং সেই জীবনের প্রতিদান হিসেবে অপরাধীর কাফফারা দিতে হয়, তার যে ভুলের কারণে একটি জীবনহানি ঘটেছে।[১] গ্রন্থকার বলেন, কয়েকটি কারণে এই বিবেচনা ঠিক হতে পারে–

---

১ কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩।

www.pathagar.com

১. ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডও মানবজীবনের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ। এই ক্ষেত্রে অপরাধীর কৃত কাজটির ফলে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় যা ইচ্ছাকৃত। অতএব এটি একটি ভয়ংকর অপরাধ তাতে কোন দ্বিমত নেই। এটিও অনিচ্ছাকৃত অপরাধ সদৃশ্য। কারণ ইচ্ছাসদৃশ অপরাধেও ব্যক্তির জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইসলামী সমাজের অধিকার খর্ব হয়। ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতির প্রতিদান উচ্চমূল্য দিয়াতের মাধ্যমে করা হয় কিন্তু এই প্রতিদান সরকার বা সমাজ পায় না, পেয়ে থাকে নিহতের উত্তরাধিকারীরা। বস্তুত সাধারণ ও প্রসিদ্ধ অর্থে এটিকে নিরেট শাস্তি বলা যায় না। যদিও দিয়াত আদায় করার পর হত্যাকারীর প্রতি নিহতের উত্তরাধিকারীদের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ কমে যায়, পক্ষান্তরে অপরাধীও বিরাট সম্পদের ক্ষতির চাপে পিষ্ট হয়, তাতে এক ধরনের সতর্কতামূলক হুঁশিয়ারীও থাকে। ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের শাস্তিতে যারা দিয়াতের পাশাপাশি কাফফারা ধার্যের কথাও বলেন, তাদের মতেও এটি কোন সাধারণ শাস্তি নয়। বস্তুত ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের কাফফারার অবস্থানও ভুল হত্যাকাণ্ডের শাস্তির সমতুল্য। অবশ্য ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে অপরাধী গোটা সমাজের অধিকার ক্ষুণ্ন করে। সামাজিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা একটি তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কারণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং জন-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসন তাযিরী শাস্তি দিয়ে থাকে।

২. পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী এ ধরনের অপরাধে নির্ধারিত শাস্তির পাশাপাশি তাযিরী শাস্তি প্রয়োগে বাধা নেই। এর আগে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, যদি কোন কল্যাণকর দিক থাকে তবে কাফফারা, কিসাস এবং হদ্দের সাথে তাযিরী শাস্তিও দেয়া যায়।

গ্রন্থকার বলেন, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে সামাজিক কল্যাণের বিবেচনায় নির্ধারিত শাস্তির সাথে তাযিরী শাস্তিও দেয়া উচিত। কারণ এ প্রকারের হত্যাকাণ্ডে যে শাস্তি নির্ধারিত আছে এগুলো একটি বিশেষ প্রকৃতির, প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ অর্থে নিরেট শাস্তি নয়। অপরদিকে ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ড এমন একটা অপরাধ যা শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল সমাজের জন্যে বিরাট বিপদস্বরূপ এবং সামাজিক জীবনের সীমারেখার প্রকাশ্য লংঘন। কেননা সামাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই সামাজিক জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

যদিও ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে কারো ক্ষতি করার কোন ইচ্ছা অপরাধীর থাকে না, তবুও তা অপরাধের ভয়াবহতাকে মোটেও হ্রাস করে না। তাছাড়া ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের হদ্দ এর সাথে যদি তাযিরী শাস্তির ব্যবস্থা না রাখা হয়

www.pathagar.com

তাহলে লোকজন এ ধরনের অপরাধ সংঘটনে বেপরোয়া হয়ে ওঠবে। বিশেষত, যারা বিত্তশালী, যাদের পক্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা-পয়সা ও কাফফারা দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ক্ষমতা থাকবে, তারা এ ধরনের অপরাধকে মামুলী ঘটনা মনে করে তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টাই করবে না।

৩. (যারা ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে হদ্দ এর পরিবর্তে কাফফারা ও দিয়াতের শাস্তি প্রয়োগের পক্ষে) সেক্ষেত্রে কাফফারাও দিয়াতের সাথে যদি তাযিরী শাস্তি কল্যাণজনক মনে হয়, তবে দিয়াত ক্ষমা হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে উপলব্ধি করা যায়। কারণ প্রশাসনের দিয়াত ক্ষমা করার অধিকার নেই, দিয়াত ক্ষমা করতে পারে নিহতের উত্তরাধিকারীগণ। আমরা যদি হদ্দ ও কিসাসের সাথে তাযিরী শাস্তি দানের বিষয়টি নাকচ করে দেই, তবে যারা ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে কাফফারার পক্ষে নন, তবে তাদের মতে এ প্রকৃতির অপরাধীরা সব ধরনের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যারা শুধু কাফফারার শাস্তি প্রয়োগের পক্ষে তাদের মতে অপরাধী শুধু কাফফারা দিয়েই ছাড়া পেয়ে যাবে। উল্লেখিত উভয় অবস্থা অপরাধ নিয়ন্ত্রণে উপযোগী নয়।

৪. ফকীহদের এক দল হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ, যেমন কোন অঙ্গচ্ছেদ, শাজাজ (মস্তকের আঘাত) ও জখম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কিসাসের পাশাপাশি তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের পক্ষে। ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডে হদ্দ এর সাথে তাযিরী শাস্তি প্রয়োগ তাদের মতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল দেখা যায়। কারণ অপরাধকর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং মানবজীবনের বিরুদ্ধে সংঘটিত হত্যার চেয়ে নিম্নতর অপরাধকর্মের মধ্যে তেমন তারতম্য নেই।

www.pathagar.com

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধের তাযিরী শাস্তি

কেউ যদি হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ করে এবং তাতে আক্রান্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ কেটে যায় কিংবা অঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় অথবা আঘাতে শাজাজ বা জখম সৃষ্টি হয় তবে এ ধরনের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কিসাস, দিয়াত, নির্দিষ্ট জরিমানামূলক শাস্তি প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এ পর্যায়ে উল্লেখিত অপরাধগুলোতে শুধু তাযিরী শাস্তিদান প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

প্রশ্ন হলো, ক্ষমা করার কারণে যদি কিসাস রহিত হয়ে যায়, অথবা কিসাস কার্যকর করার শর্তাবলীর কোনটি বিদ্যমান না থাকে, অথবা কিসাস প্রয়োগ অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে দিয়াত ও জরিমানার পাশাপাশি অপরাধীকে তাযিরী শাস্তিও দেয়া যেতে পারে কিনা?

ইমাম মালিক র.-এর অভিমত : ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি, হত্যার চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের অপরাধে ইমাম মালিক র. কিসাসের সাথে তাযিরী শাস্তি দানের পক্ষে। এ ধরনের অপরাধে যদি কিসাস রহিত হয়ে যায় কিংবা কিসাস প্রয়োগ কোন কারণে স্থগিত হয়ে যায়, এমতাবস্থায় ইমাম মালিক র.-এর মতে, দিয়াত ও জরিমানার পাশাপাশি কিংবা জরিমানা ছাড়া অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী তাযিরী শাস্তি দেয়া যেতে পারে। যেমন : অতি গুরুত্বপূর্ণ হাড়ের কোন একটি পর্যন্ত যদি আঘাত পৌঁছে যায় কিংবা তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; এমতাবস্থায় ইমাম মালিক র.-এর মতে কিসাস ধার্য হয় না। যেমন, মেরুদণ্ডের হাড়, রান বা ঘাড়ের হাড় অথবা মুনকালাহ বা মুযিহাহ্ পর্যায়ের আঘাত। জায়িফাহ্ পর্যায়ের আঘাতের ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য। কেননা, জায়িফাতেও কিসাস কার্যকর করা সম্ভব নয়।[১]

যদি আঘাতের কারণে কোন অঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় বটে কিন্তু সেই অঙ্গটি যথাস্থানে বহাল থাকে এবং অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্টের দ্বারা দৃশ্যত সৌন্দর্যহানি না ঘটে; যেমন অপরাধীর আঘাতের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে বটে কিন্তু চোখ যথাস্থানে বহাল আছে এবং আক্রান্তের

---

১ মাওয়াহিবুল জালীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৭; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, মুখতাসার আল-খলীল, পৃষ্ঠা-২৪৬; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১১২।

www.pathagar.com

দৈহিক সৌন্দর্যের কোন ত্রুটি হয়নি তাহলে এতে কিসাস ওয়াজিব হয় না। অনুরূপ হাতের কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু হাতের অবয়বের কোন বিকৃতি ঘটেনি। মোটকথা এ ধরনের সব অবস্থায় অপরাধীর কাছ থেকে দিয়াত আদায় করে তাকে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।[১]

অন্যান্য ইমামগণের অভিমত : হানাফী ও শাফেয়ী মতাবলম্বী ফকীহগণের অনুসৃত মূলনীতি হলো, কোন অপরাধী যদি একই অপরাধ বারবার করে এবং এজন্য সে বারবার শাস্তিও ভোগ করতে থাকে, কিন্তু এরপরও সে অপরাধ সংঘটন থেকে নিবৃত্ত না হয় তখন তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া যাবে।[২] তাঁদের মতে, বারংবার একই অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পরও এই দণ্ড তাকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তখন তার জন্য আরো কঠিন শাস্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অবস্থা ও পরিস্থিতিও তাই প্রত্যাশা করে।

গ্রন্থকারের মতামত : হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধে নির্দিষ্ট শাস্তির সাথে বিভিন্ন কারণে তাযিরী শাস্তির বিধানও থাকা জরুরী।

১. অপরাধের দিক থেকে হত্যার সাথে হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ও তার পরিজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু কিসাস, দিয়াত ও জরিমানার অর্থ সমাজ পায় না, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গই পেয়ে থাকে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষতির প্রতিদান দেয়া হয় কিন্তু সামাজিক যে ক্ষয়ক্ষতি হয় এর প্রতিদান তাযিরী শাস্তি দ্বারাই দেয়া সম্ভব।

---

১ মাওয়াহিবুল জালীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪৬। তাতে লেখা আছে, মুখতাসার আল ওয়াতার-এ লেখা হয়েছে, কারো চোখে যদি আঘাত লাগে এবং দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায় কিন্তু দৃশ্যত চোখ ঠিকই দেখা যায় তাহলে তাতে ৫০০ দিরহাম দিয়াত দিতে হবে, কিন্তু কিসাস হবে না, যদিও ইচ্ছাকৃতভাবেই এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। কারণ এখানে কিসাস কার্যকর করার কোন উপায় নেই।

কারো আঘাতে হাতের কার্যকারিতা রহিত হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান যখন হাতের অবয়ব দৃশ্যত ঠিক দেখা যায়। কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া কিন্তু জিহ্বা না কাটার ক্ষেত্রেও একই বিধান। অনুরূপ হুকুমই উল্লেখিত ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সব ক্ষেত্রে।

২ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আবু য়ালা, পৃষ্ঠা, ২৪৩; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২০৯; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৬।

www.pathagar.com

২. এ ধরনের অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অপরাধীর কিসাস ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার রাখে। আবার কখনো কিসাসের শর্ত না থাকার কারণে শাস্তি প্রয়োগ হয় না কিন্তু অপরাধ তো ঠিকই ঘটেছে। এ ধরনের অপরাধে তাযিরী শাস্তি নেই বলা হলে অপরাধীর ওপর দিয়াত ও জরিমানা ছাড়া আর কোন শাস্তি প্রয়োগের অবকাশ থাকে না। তখন বিত্তশালী লোকদের এ ধরনের অপরাধ সংঘটনে বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হবে।

৩. ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে দিয়াত ক্ষমা করে দেয়, আর এই ক্ষমার অধিকার তার আছে। এসব অপরাধে এমন অবস্থাও কখনো হতে পারে, অনেক ফকীহর মতে সেখানে জরিমানা সাব্যস্তই হয় না। যেমন শাজাজ-এর পর্যায়ভুক্ত আঘাতে যদি ক্ষতস্থান ভরাট হয়ে যায় এবং তার চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে তবে আবু হানীফা র. এর মতে কোন জরিমানা সাব্যস্ত হবে না।[১] এমন অবস্থায় যদি তাযিরী শাস্তির ব্যবস্থাও না থাকে, তাহলে অপরাধী সব ধরনের শাস্তির ঊর্ধ্বে থেকে গেল, যা অপরাধ ও দণ্ডবিধির দৃষ্টিতে মোটেও যৌক্তিক ও কাঙ্খিত নয়।

---

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৬।

www.pathagar.com

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

(৪) ভুলবশত হত্যা এবং এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধ ও তাযিরী শাস্তি

ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়েও আলোচনা করেছি, ভুলবশত হত্যা ও এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে অবস্থাভেদে কখনো দিয়াত, কখনো জরিমানা সাব্যস্ত হয়। এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করাবো, উল্লেখিত অপরাধসমূহে তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য কি না?

ভুলবশত হত্যা কিংবা হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ সমাজে বেশি ঘটে- ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জরুরি নিরাপত্তামূলক সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি পূর্ণ সতর্ক ও সচেতনভাবে নিরাপত্তামূলক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি করতো তাহলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতো না। বৈধ কাজটিও সম্পন্ন করার আগে তার উচিত ছিল এ ব্যাপারে পূর্ণ প্রস্তুতি এবং প্রাসঙ্গিক সব ধরনের ঝুঁকি থেকে অন্যদের নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সংশ্লিষ্টদের অসতর্কতা, অবহেলা কিংবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণে কারো অঙ্গহানি ঘটে, কারো হাত-পা কেটে যায়, কারো অঙ্গ বিকল হয়ে যায়। ইত্যাকার দুর্ঘটনার শিকার হয় সাধারণ মানুষ, তাতে স্বাভাবিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অপরাধী মনে হয় না। কিন্তু যে বা যারা এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ শুরু করার আগে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, উপযোগী ব্যবস্থা ও সর্বোত্তম কৌশল প্রয়োগ করেনি– দুর্ঘটনায় সাধারণ মানুষের ক্ষয়ক্ষতির জন্য নিশ্চয়ই তারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আমরা আগেই বলেছি যে, যে কোন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অসতর্কতা, অবহেলা, উপযুক্ত প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার না করা অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থকার বলেন, উল্লেখিত অপরাধে শুধু জরিমানা কিংবা দিয়াতের শাস্তি প্রয়োগ সঠিক নয়। এ ধরনের অপরাধে তাযিরী শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধী শাস্তির আওতায় নাও আসতে পারে। যেমন, অপরাধীর দিয়াত ও জরিমানা ক্ষমা করে দেয়া হলে তার কোন শাস্তিই হবে না। বস্তুত দিয়াত ও জরিমানা প্রকৃত শাস্তি নয়, কারণ এটির মালিক হয় নিহতের উত্তরাধিকারীগণ। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যে সামাজিক অপরাধ করেছে তার জন্য নির্দিষ্ট জরিমানা ও দিয়াতের পাশাপাশি তাযিরী শাস্তির ব্যবস্থাও থাকা জরুরি।

www.pathagar.com

উল্লেখিত অপরাধের ক্ষেত্রে এমন অবস্থাও হয়, যাতে ফকীহদের মতে দিয়াত বা জরিমানা কোনটাই প্রযোজ্য নয়। সেক্ষেত্রে তাযিরী শাস্তির ব্যবস্থা না রাখা হলে অপরাধ ঘটবে কিন্তু কোন শাস্তি দানের সুযোগ থাকবে না। এমনটি আইনের দৃষ্টিতে মোটেও কাঙ্খিত নয়। যেমন ধরুন, ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে, মাথা ও মুখমণ্ডলের আঘাত যদি ঠিক হয়ে যায় এবং আঘাতের চিহ্নও বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে এ ধরনের আঘাতে কোন কিসাস নেই, জরিমানাও নেই।[১] আবু হানীফা র. এর মতে মূদিহাহ, হাশিমাহ, মুনকালাহ এবং আম্মাহ পর্যায়ভুক্ত আঘাত যদি ভালো হয়ে যায়, আর আঘাতের চিহ্নও অবশিষ্ট না থাকে তবে এই আঘাতে কিসাস ও জরিমানা কোন শাস্তিই হবে না।[২] উল্লেখিত মতামত বিবেচনায় আমার (গ্রন্থকার) মতে, এ ধরনের অপরাধে তাযিরী শাস্তি আবশ্যিক। যাতে অপরাধী শাস্তির বাইরে না থাকে। মালিকী মতাবলম্বী ফকীহগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতও তাই। ভুল আঘাতে চেহারা শরীর মাথা কিংবা দেহের কোন অংশের ক্ষতস্থান বা জখম শুকিয়ে গেলে যদি তাতে কোন দৃষ্টিকটু চিহ্ন না থাকে, শরীয়ত এ ব্যাপারে কোন জরিমানা বা দিয়াত ধার্য করেনি। যেমন, মেরুদণ্ডের হাড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ হাড় যদি ভেঙে গিয়ে আবার জোড়া লেগে যায় এবং তাতে কোন ধরনের ত্রুটি বা বক্রতা সৃষ্টি না হয় তবে অপরাধীর কোন জরিমানা বা দিয়াত দিতে হবে না। কিন্তু এ ধরনের অপরাধে অপরাধীকে তাযিরী শাস্তির বাইরে রাখা কিংবা কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা মোটেও সঙ্গত হতে পারে না।[৩]

আল্লামা ইবনে হাযম র. বলেন, অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মূলত অপরাধের পর্যায়েই পড়ে না। কেননা মাসিয়াত বা অপরাধ সেই সব কর্মকেই বলা হয় যা আল্লাহ তাআলা বা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। ভুল এমন অপরাধ নয় যা আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۝

"আল্লাহ কারো উপর তার সামর্থ্যের অতীত কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না" (সূরা আল-বাকারা :২৮৬)। অর্থাৎ এমন কথা কেউ বলতে পারে না যে তার কোন ভুল হবে না। ইবনে হাযম র. বলেন, ভুলের জন্য কোন জবাবদিহিতা

---

১ আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২৪।

২ মাওয়াহিবুল জালীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪৬।

৩ এ মত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল-মুহাল্লা, ইবনে হাযম, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪১৩।

www.pathagar.com

কিংবা শাস্তি নেই। ভুলের জন্য মানুষ গোনাহগার হয় না। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ○

'তোমাদের ওপর কোন গোনাহ নেই যা তোমরা ভুলক্রমে করো কিন্তু তোমরা স্বেচ্ছায় যা করো তাতে গোনাহ হবে।' (সূরা আল-আহযাব : ৫)

রসূলুল্লাহ স.বলেন, 'মহান আল্লাহ আমার উম্মতের ভুলচুক ক্ষমা করে দেন, সেই সাথে তাদের ওপর বল প্রয়োগ করে যেসব কাজ করানো হয় তাও ক্ষমা করে দেন।'

মহান আল্লাহর বাণীতে, 'সকল সম্পদই পবিত্র।' আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ○

"তোমরা অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে খেতে পারো।" –(সূরা আল-নিসা : ২৯)

নবী কারীম স. বলেন, "তোমাদের রক্ত, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের প্রাণ তোমাদের জন্য হারাম।" অর্থাৎ তোমরা এগুলোর ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। ভুলবশত যদি কোন অন্যায় হয়ে যায় তাতে কোন জরিমানা আবশ্যিক নয়, যদি না অকাট্য প্রমাণ বা ফকীহদের সর্বসম্মত রায় দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়। এমন কিছু না ঘটলে ভুলকৃত অপরাধ ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হবে।[১]

ইবনে হাযম র.-এর এই মতের ভিত্তি হলো, ভুলের উর্ধে থাকা কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ফকীহগণের সর্বসম্মত মূলনীতি হলো, আল্লাহ তাআলা সাধ্য অনুযায়ী মানুষকে শরীয়তের পাবন্দ বানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে মানুষের দ্বারা অপরাধ ঘটে যায়। কিংবা উদ্দিষ্ট কর্মের জন্য পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও যথাযথ উপকরণ ব্যবহার না করার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এ ধরনের ভুলবশত অপরাধ এমন যে, মানুষ ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে তা এড়াতে পারে কিংবা নিরাপদ থাকতে পারে। কাজেই ভুলবশত অপরাধ থেকে বাঁচা মানুষের সাধ্যের বাইরে ঢালাওভাবে এ কথা বলা ঠিক নয়। সেই সাথে ভুলে কৃত অপরাধ মূলত অপরাধ নয় এমনটি বলাও সংগত নয়।

---

১ সুবুলুস সালাম, আস-সানআনী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১৭।

www.pathagar.com

আমরা যদি ইমাম ইবনে হাযম র.-এর মতামত মেনেও নেই, তবুও বৃহত্তর স্বার্থে ভুলবশত কৃত অপরাধেও তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের এখতিয়ার প্রশাসনের আছে। নীতিগতভাবে যদিও যেসব ক্ষেত্রে হদ্দ প্রযোজ্য নয় শুধু এসব ক্ষেত্রেই জনস্বার্থে প্রশাসন শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু মাকরূহ কাজ করা এবং মুস্তাহাব কাজ না করার জন্যেও বৃহৎ কল্যাণে প্রশাসন শাস্তি দিতে পারে। বরং জনস্বার্থের বিবেচনায় যেসব কর্মকাণ্ড অপরাধের আওতায় পড়ে না, এসব ক্ষেত্রেও প্রশাসন শাস্তি দিতে পারে।

রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস, 'উম্মতের সকল ভুলকৃত অপরাধ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন' কোন কোন ইমামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। 'সুবুলুস সালাম' কিতাবের লেখক বলেন, ইবনে আবু হাতিম উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনা সূত্র সম্পর্কে তাঁর পিতার কাছে জিজ্ঞেস করলে তাঁর পিতা বলেন, 'এই হাদীস পরিত্যাজ্য। এটির বক্তব্য সম্পূর্ণ মওজু (বানোয়াট)।' 'আবদ ইবনে আহমদ' 'আল-ইলাল' গ্রন্থে লিখেছেন, আমি আমার পিতার কাছে এই হাদীসের সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এই হাদীস সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।' এ হাদীসটি 'হাসান' সনদে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ 'খাল্লাল' আহমদ র. সূত্রে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি মনে করে ভুলকৃত অপরাধে মানুষের কোন জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা শাস্তি হবে না, সে আল্লাহর কিতাব ও রসূল র.-এর সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ করলো। কেননা, আল্লাহ তাআলা ভুলবশত হত্যাকাণ্ডে কাফফারা ধার্য করেছেন। বর্ণিত হাদীস থেকে বোঝা যায়, আকীদা সম্পর্কিত কোন বিধান যদি ভুলে স্মৃতিভ্রমে কিংবা জবরদস্তির আওতায় করা হয় তবে তাতে কোন শাস্তি হবে না। একে ভিত্তি করে জাগতিক কোন বিধান কিংবা কোন আইন লংঘনের বিষয়ে সমাধান দেয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[১]

বস্তুত হত্যা ও হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে তাযিরী শাস্তি না দেয়ার ব্যাপারে উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয় না।

যেসব আঘাতে শরীরে কোন চিহ্ন থাকে না সেসব আঘাতের তাযিরী শাস্তি

কারো অন্যায় আঘাতে যদি আক্রান্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ কাটা না পড়ে এবং অঙ্গের অবয়ব অক্ষুণ্ন থাকার পাশাপাশি অঙ্গের কার্যকারিতাও অবশিষ্ট থাকে

---

১ আল-বাদায়ে আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯৯, মুঈনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা-১৭৭, তাতে লিখা আছে, থাপ্পড়, ঘুষি, ধাক্কা, মারপিট ইত্যাদিতে কিসাস নেই।

www.pathagar.com

অথবা আঘাতের ফলে মাথা ও মুখমণ্ডলে কোন ক্ষত সৃষ্টি না হয় কিংবা শরীরের অন্য কোন অংশে কোন ধরনের বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি না হয়, এমতাবস্থায় অধিকাংশ ফকীহর মত হলো, এগুলোতে কোন কিসাস সাব্যস্ত হবে না। বস্তুত থাপ্পড়, ঘুষি, কনুই, চাবুক অথবা ডাণ্ডা দিয়ে আঘাতের কোন কিসাস নেই, যদি না আঘাতে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে কোন প্রকার আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি হয়। তবে এসবে তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে।[১] ইমাম ইবনে কাইয়্যিম এবং কোন কোন হাম্বলী ফকীহর মতে, মারামারি ও থাপ্পড়ের আঘাতেও কিসাস ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ○

'অতএব যে কেউ তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।' (সূরা আল-বাকারা : ১৯৪)

অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে–

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ○

'তুমি যদি কাউকে শাস্তি দিতে চাও, তবে এতটুকু শাস্তি দাও যতটুকু তোমাকে দেয়া হয়েছে।' (সূরা আল-নাহল : ১২৬)

উল্লিখিত আয়াতগুলোর সারকথা হচ্ছে কিসাসে সমতা থাকতে হবে। এজন্য অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে। যদি সমতাপূর্ণ শাস্তি দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে এর কাছাকাছি কোন শাস্তি দিতে হবে। অপরাধ ও শাস্তির

---

১ মাওয়াহিবুল জালীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৬, তাতে লেখা আছে, থাপ্পড় মারার অপরাধে কিসাস নেই, তবে অপরাধীকে সংশোধনমূলক শাস্তি দেয়া যাবে। শায়খ আবুল হাসান বলেন, এর কারণ হলো, থাপ্পড়ের পরিমাপ করা যায় না। তাছাড়া ব্যক্তির ভিন্নতায় থাপ্পড়ের মধ্যেও পার্থক্য থাকে, তাই এতে সংশোধনমূলক শাস্তি সাব্যস্ত হবে। অনুরূপ ডাণ্ডার আঘাতের বহুল আলোচিত মতামত হলো, এতেও কিসাস নেই যদি না তাতে ক্ষত সৃষ্ট হয়। যদি ক্ষত সৃষ্টি হয় তবে কিসাস কার্যকরী হবে। 'আন-নাওয়াদের' কিতাবে 'যে থাপ্পড় ও মারপিটে কিসাস নেই', শীর্ষক পরিচ্ছেদে এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'মুদাওয়ানা' কিতাবে বলা হয়েছে, 'আবুল কাসিম বলেছেন, 'চাবুকের আঘাতে কিসাস আছে।' ইমাম মালিক র.-এর বরাতে বলা হয়েছে, চাবুকের আঘাতের কিসাস নেই তবে সংশোধনমূলক শাস্তি দিতে হবে। ইবনে আরাফা শায়খ আশশিহাব থেকে বর্ণনা করেন, থাপ্পড়, চাবুকের মার, ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত অথবা অনুরূপ কিছু দিয়ে মারপিটের কিসাস নেই যদি না এসবের আঘাতে জখম সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

মধ্যে যদি সব দিক দিয়ে সমতা বিধান করা সম্ভব না হয় তাহলে কিসাসের শাস্তি রহিত হয়ে যায়। উপরে উল্লেখিত ফকীহগণের নিকট থাপ্পড়ের শাস্তি হিসেবে থাপ্পড়, আঘাতের শাস্তি হিসেবে আঘাতই সবচেয়ে উপযুক্ত। বাহ্যিক ও শরয়ী উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাযিরী শাস্তির চেয়ে এই কিসাস বেশি উপযোগী। কেননা, তাযিরী শাস্তির স্বভাব ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই অপরাধের চেয়ে ভিন্ন রকম হয়। উপরে বর্ণিত প্রমাণাদি উপস্থাপন ছাড়া থাপ্পড়ের অপরাধে কিসাসের সমর্থক ফকীহগণ বলেন, হযরত আবু বকর রা. হযরত উসমান রা. হযরত আলী এবং হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. থাপ্পড়ের অপরাধে কিসাস কার্যকরী করেছেন।[১]

---

১ ইলামুল মুকিঈন, ইবনে কাইয়্যিম আলজাওযিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২, আল কুরদী আল আযহারীর মুদ্রিত সংস্করণে লেখা হয়েছে, শাফিয়ী, হানাফী, মালিকী এবং হাম্বলী মতানুসারীদের মুতাআখখেরীন ফকীহদের মত থাপ্পড় এবং মারপিটে কিসাসের শাস্তির বিপক্ষে। তারা এ ধরনের অপরাধে তাযিরী শাস্তির পক্ষে। কেউ কেউ বলেন, মূলত এসব অপরাধে কিসাস ওয়াজিব। ইমাম আহমাদ থেকে এ ব্যাখ্যা উদ্বৃত হয়েছে। এজন্যে দেখুন, আল-ইকনা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯২, আল মাতবাআতুল মিসরিয়্যা, আল আযহার, সম্পাদনা ও টীকা অধ্যাপক আবদুল লতীফ মুহাম্মদ মূসা আস-সুবকী, কাশশাফুল কিনা, পৃষ্ঠা-৭২৩। তাতেও বলা হয়েছে, থাপ্পড় , ঘুষি কিংবা ধাক্কা দেয়ার অপরাধে কিসাস সাব্যস্ত হয় না; এগুলোতে তাযির সাব্যস্ত হয়, কারণ এগুলো এমন অপরাধ যেগুলোতে কোন নির্দিষ্ট কিসাস নেই।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানহানি এবং অন্যান্য চারিত্রিক অপরাধ

যেনা কযফ গালি-গালাজ

ইসলামী শরীয়ত যেনা ও কযফ (ব্যভিচারের প্রমাণহীন অভিযোগ) সংক্রান্ত অপরাধে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান করেছে। দণ্ডবিধি সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আমরা যেনার ঐ দিকটা সম্পর্কেই আলোচনা করবো কোন কারণবশত (তথা হদ্দ কার্যকর হওয়ার জন্য শর্তাদির কোন একটি বিদ্যমান না থাকার কারণে) শরীয়তের নির্দিষ্ট হদ্দ এর শাস্তি যেক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অথবা অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে সংশয় সন্দেহ দেখা দেয়ার ফলে হদ্দ যেখানে রহিত হয়ে যায়।

তাছাড়া এখানে আমরা 'কযফ'-এর ঐসব দিক আলোচনা করবো, যেসব ক্ষেত্রে কযফ এর হদ্দ কার্যকর করার শর্তাদি বিদ্যমান না থাকার কারণে কযফ এর হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না অথবা কযফ প্রমাণের ক্ষেত্রে এমন সংশয় সন্দেহের উদ্ভব ঘটে যাতে কযফের শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

উল্লেখিত দুই অবস্থায় এসব অপরাধ ঘটনার বিবেচনায় এই মানের অপরাধ হিসেবেই গণ্য হয়, সে অপরাধে শরীয়ত সুনির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষণা করেছে এবং তাতে হদ্দ কার্যকরী হওয়াও বিধেয় কিন্তু অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা কিংবা অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সংশয় সন্দেহের কারণে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না।

উল্লেখিত দুই ধরনের অপরাধের বাইরেও এমন অপরাধও ঘটে যেগুলোতে শরীয়তের কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নেই। তদ্রূপ এ ধরনের অনুরূপ অপরাধেও শরীয়ত কর্তৃক কোন হদ্দ ঘোষিত হয়নি। কিন্তু তাতে তাযিরী শাস্তি অবশ্যই প্রযোজ্য। কেননা, কর্মকাণ্ড হিসেবে তা অবশ্যই অপরাধের পর্যায়ভুক্ত। এজন্য অবশ্য আমি আমাদের আলোচনাকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে চাই।

প্রথম ভাগে যে ধরনের যেনায় হদ্দ নেই এবং যেনার সাথে সামঞ্জস্য থাকলেও যেসব অপরাধে শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি নেই সেগুলোর আলোচনা হবে। বস্তুত যেসব অপরাধ মানহানি এবং চারিত্রিক অধঃপতনের পর্যায়ে পড়ে সেগুলোও এর আওতাভুক্ত হবে। আর দ্বিতীয় ভাগে কযফ ও গালি-গালাজ সম্পর্কিত অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা হবে।

www.pathagar.com

প্রথম অনুচ্ছেদ

১. যে যেনায় হদ্দ নেই

যেনার শাস্তিস্বরূপ হদ্দ কার্যকর করার জন্যে কতিপয় শর্ত রয়েছে, যেগুলো বিদ্যমান থাকা জরুরী। সেসব শর্তের কোন একটি শর্ত যদি না পাওয়া যায় কিংবা পাওয়া গেলেও তাতে সংশয় সন্দেহের অবকাশ থাকে তবে হদ্দ রহিত হয়ে যায়। শর্তের মধ্যে অন্যতম শর্ত হলো, অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সংশয় সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। যে সংশয়ের কারণে হদ্দ রহিত হয়ে যায়। যেমন যেনাকারিনী জীবিত, আর যেনার উদ্যোগটি পুরুষ কর্তৃক হয়েছে কিন্তু যেনার কর্মটি ঘটেছে নারী তথা ব্যভিচারিণী কর্তৃক (অবশ্য এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে) এমতাবস্থায় অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে সংশয় তৈরি হওয়ায় হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

অনুরূপ কেউ যদি মৃত কোন নারীর সাথে যেনা করে, অথবা ব্যভিচার হয়েছে তবে তা সম্মুখ ভাগে তথা প্রজননতন্ত্রে হয়নি পায়ু পথে হয়েছে, এমতাবস্থায় অপরাধীর উপর হদ্দ কার্যকর হবে না। কিন্তু যেহেতু উল্লেখিত অপরাধসমূহে অপরাধীরা জড়িত এজন্য তারা তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধী বিবেচিত হবে।

এখন আমরা যেসব অবস্থায় সংশয়ের কারণে যেনার হদ্দ রহিত হয়ে যায় কিংবা হদ্দ প্রয়োগের শর্তাদির মধ্যে কোন শর্ত বিদ্যমান না থাকে সেসব অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সংশয় সন্দেহ এবং এর প্রভাব

যেনার অপরাধে হদ্দ কার্যকরী হওয়ার অন্যতম জরুরী বিষয় হচ্ছে, ঘটনা ঘটানোর ক্ষেত্রে ঘটক তথা পুরুষের মধ্যে এমন কোন সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারবে না, যে সংশয় বা সন্দেহ থাকলে হদ্দ রহিত হয়ে যায়। এই সংশয় অপরাধ কর্মের ক্ষেত্রে হোক কিংবা যানিয়ার (ব্যভিচারে অংশগ্রহণকারী নারী) ক্ষেত্রে হোক অথবা নারীর মালিকানা কিংবা অধিকারের ক্ষেত্রে হোক অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে হোক।[১] উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে যদি কোন সংশয় থাকে তবে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে কিংবা অপরাধীকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ সে এমন অপরাধ করেছে যাতে শরীয়ত কর্তৃক সুনির্দিষ্ট শাস্তি নেই।

---

[১] সংশয় ও সন্দেহের সংগা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে এই গ্রন্থের শুরুতে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

(ক) কর্মের ক্ষেত্রে সংশয়ের উদাহরণ

কেউ যদি তার তালাক দেয়া স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালে[১] অথবা স্ত্রী ধন-দৌলত দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে কিংবা বায়েন তালাক হয়ে গেছে[২] এমন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অথবা এমন নারীর সাথে সহবাস করে যে নারী তার স্বামীর কাছ থেকে খুলা নিয়ে নিয়েছে।[৩]

উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেলেও সংশ্লিষ্ট কিছু বিধান অবশিষ্ট থাকে এবং তাতে সংশয়ের অবকাশও থাকে। কিন্তু সংশয় তখনই কার্যকারী ভূমিকা রাখবে যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি বৈধ সম্পর্ক মনে করে সহবাস করে থাকে। কারণ এখনও যেহেতু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আইনানুগ বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হয়নি, তাই এমতাবস্থায় কারো সহবাস বৈধ বলে সংশয় হতে পারে। ফলে এই সংশয় হদ্দকে রহিত করে দেবে। উল্লেখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে যেহেতু শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট হদ্দ নেই, তাই এই অপরাধে তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য হবে। কারণ তার কাজটি অবশ্যই একটি অপরাধ।

উপরের উদাহরণসমূহের একই বিধান প্রযোজ্য হবে যেক্ষেত্রে অনুরূপ অপরাধ পাওয়া যাবে।

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, এ ধরনের অপরাধে হদ্দ রহিত হওয়ার জন্য অপরাধীর কাজটিকে জায়েয মনে করতে হবে। কিন্তু অপরাধীর যদি এমন অনুভূতি থাকে, যে কাজটি সে করেছে তা অবৈধ এবং এই অবৈধ হওয়ার

---

১ শরহে আল কানয, আইনী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৫/২২৬। তাতে লেখা হয়েছে, কর্মের সংশয়ের মধ্যে কোন সীমারেখা নেই। যেমন তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতে সীমারেখা রয়েছে। তিন তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকালীন সময়ে তার থাকার জায়গা, পানাহার তথা নাফকা, ঘরের বাইরে যাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা, তার ঔরসজাত সন্তানের বংশ পরিচয় নির্ধারণের ফয়সালা, ইদ্দতকালীন সময়ে তালাকপ্রাপ্তার বোনের সাথে তালাকদাতা স্বামীর বিবাহে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি; বস্তুত সংশয়ের অবকাশ এখানে রয়েই গেছে। এমতাবস্থায় যদি কোন স্বামী ইদ্দতপালনকারী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করাকে জায়েয মনে করে তবে তাতে সংশয়ের সৃষ্টি হয়, যেহেতু এতে সংশয়ের অবকাশ আছে তাই অভিযুক্তকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। সূত্র, আস-সারাখসী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৮৮; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৫৮।

২ শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭২, প্রথম সংস্করণ : মাতবায়া আমিরীয়া, বুলাক, মিসর, ১৩১৬ হিজরী।

৩ প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

স্বীকারোক্তিও অপরাধী দিয়ে থাকে, তবে হদ্দ রহিত হবে না।[১] কারণ কাজটি হারাম হওয়ার জ্ঞান থাকা অবস্থায় অপরাধীর সংশয় দূর হয়ে গেছে।

(খ) মালিকানার ব্যাপারে সন্দেহের উদাহরণ

এক ব্যক্তি ইশারা ইঙ্গিতে তার স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিয়েছে।[২] এ ধরনের তালাকের মধ্যে স্ত্রী সহবাস তখনও হালাল থাকার একটা সংশয় থাকে। এ ধরনের অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তির এ বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী নয় যে কাজটি জায়েয। কর্মের সংশয় সন্দেহের মতো এক্ষেত্রেও অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে কাজটি বৈধ বিবেচিত হওয়া জরুরী নয়। যেমনটি কর্মে সংশয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মালিকানা কিংবা অধিকারে সংশয়ের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত অপরাধী যদি স্বীকারও করে যে, কাজটি হারাম এ ব্যাপারে তার জ্ঞান ছিল তবুও এই স্বীকারোক্তিতে মালিকানা কিংবা অধিকারের মধ্যে সংশয় দূরিভূত হয়ে যায় না।[৩]

(গ) আকদ বা বিবাহ চুক্তির ব্যাপারে সংশয়

আকদ বা বিবাহ চুক্তিতে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও হদ্দ রহিত হয়ে যায়। বিবাহের আকদ দ্বারা বিবাহিত পুরুষের জন্যে সংশ্লিষ্ট নারী হালাল হওয়ার ভিত্তি রচিত হয়। দৃশ্যত যদি আকদ বিদ্যমান থাকে কিন্তু বাহ্যিক এই

---

১ শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৬। তাতে বর্ণিত হয়েছে, এ ধরনের হদ্দ প্রযোজ্য নয়, যদি না এ কর্মের কর্তা ব্যক্তিটি এ কাজকে হালাল মনে করে। যদি কর্তা জানে যে, এই মহিলার সাথে আমার সঙ্গম করা সম্পূর্ণ হারাম, তদুপরি সঙ্গম করে, তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। সংশ্লিষ্ট দু'জনের একজন যদি দাবি করে, সে মনে করেছিল তাদের মধ্যে এ কাজ হালাল কিন্তু অপরজন তা অস্বীকার করে তবে তাদের উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। সংশ্লিষ্ট উভয়েই যদি দাবি বা স্বীকার করে তাদের মধ্যে সঙ্গম হারাম তা আগেই তারা জানতো তাহলে হদ্দ ওয়াজিব হবে। কিন্তু তাদের কারো একজনের মধ্যে সংশয় কাজ করলে তা তার প্রতিপক্ষকেও প্রভাবিত করবে। সূত্র, আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৭।

২ শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৬। তাতে বর্ণিত হয়েছে, ক্ষেত্রে সংশয় বা শুবহি ফিল মহলের উদাহরণ হলো, 'কেউ যদি স্ত্রীকে ইঙ্গিত বা ইশারায় তালাক দিয়ে থাকে এবং তার সাথে পরবর্তীতে সঙ্গম করে।'

৩ শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৬। তাতে লেখা হয়েছে, এমতাবস্থায় হদ্দ ওয়াজিব নয়। যদিও সে বলে, 'এই মহিলা যে আমার জন্য হারাম এ বিষয়টি আমার জানা ছিল।'

www.pathagar.com

আকদ-এর আইনগত কোন ভিত্তি যদি না থাকে, বা অকার্যকর থাকে, তবে এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট স্বামীর জন্যে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনের বাহ্যিক একটা উপাদান বিদ্যমান থাকে যদিও বিবাহটি বিশুদ্ধ নয়। এ কারণে এ ধরনের সহবাসে কোন প্রকার শরয়ী বিধান কার্যকর করা যাবে না তবে বৈবাহিক অবস্থাটা তবুও বহাল থাকবে। এ কারণেই এহেন পরিস্থিতিতে কোন স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তবে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ যে কোন ধরনের সংশয়ের সুযোগ থাকলেই হদ্দ রহিত হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানিফা র. ও ইমাম যুফার র. এর মতে, কেউ যদি সন্দেহবশত দায়েমী মাহরাম (যাদের সাথে চিরদিনের জন্যে বিবাহ হারাম) এর সাথে সহবাস করে এবং এই সহবাস হারাম হওয়ার ব্যাপারটি তার জ্ঞাত হয়, তবুও সংশয় থাকার কারণে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। ইমাম ছাওরী র.ও এ প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা র. ও ইমাম যুফার র. এর সাথে সহমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য এ ধরনের অপরাধে অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। কারণ সে একটি জঘন্য অপরাধ ঘটিয়েছে।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ র. ও ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, কোন মাহরাম নারীকে যদি কোন পুরুষ বিবাহ করে এবং সে হারাম হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত থাকে, তবে এই বিবাহ তার জন্যে হারাম হবে। এরপরও সে এই নারীর সাথে সহবাস করলে হদ্দ কার্যকর হবে। এই বিধান সেইসব নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা স্থায়ী মাহরামের অন্তর্ভুক্ত কিংবা যে নারী অন্যের বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ অথবা যারা মাহরামের সংগাভুক্ত।[১]

---

[১] আল-মাবসূত, আস-সারাখসী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৮৫-৮৭। তাতে বর্ণিত হয়েছে, কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করল। কিন্তু সেই মহিলা সেইসব নারীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বিবাহ করা এই ব্যক্তির জন্যে হারাম। বিবাহের পর সে যদি এই মহিলার সাথে সঙ্গম করেও থাকে তবুও তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। এই মহিলা তার জন্য হারাম এ বিষয়টি তার জানা থাকুক বা না থাকুক। এটি ইমাম আবু হানীফা র.-এর বক্তব্য। উক্ত মহিলার সাথে তার বিবাহ হারাম এ বিষয়টি জ্ঞাত থাকার পরও বিবাহ করার অপরাধে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, বিবাহ হারাম হওয়ার বিষয়টি জ্ঞাত থাকার পরও বিবাহ করলে তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে। কারণ সকল হারাম মহিলা তথা অন্যের বিবাহিত স্ত্রী এবং স্থায়ী মুহাররামাতের ক্ষেত্রেও একই বিধান কার্যকর হবে।

সূত্র, শরহে ফাতহুল কাদির, ইবনে হুমাম, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৭। তাতে বর্ণিত হয়েছে, বংশানুক্রমে যেসব নারী হারাম, কেউ যদি তেমন কোন নারীকে বিবাহ করে, যেমন

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা র. এর দলিল হলো, এ ধরনের সহবাসের মধ্যে সংশয় সন্দেহ থাকে। তাই হদ্দ কার্যকর হবে না। এর আগেই আমরা বলে এসেছি, বাহ্যিক আকদ হওয়ার কারণে সহবাসের বৈধতার উপাদন তৈরি হয়েছে যদিও বাহ্যিক আকদ দ্বারা সহবাস বৈধ হয় না। তবুও যেহেতু বাহ্যিক হলেও একটা আকদ এর অস্তিত্ব এখানে রয়েছে এটি হদ্দ রহিত করার জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত হবে।[১] এ ধরনের অবস্থায় বংশধারা হারাম হওয়া, দুগ্ধপানজনিত সম্পর্ক হারাম হওয়া এবং স্পর্শজনিত হারাম হওয়ার বিষয়টিও একই রূপ হবে।[২]

উদারহণস্বরূপ বলা যায়, কোন পুরুষ যদি মা ও কন্যাকে একই সাথে বিবাহ করে[৩] এবং তাদের সাথে সহবাসও করে বসে কিংবা কেউ চার স্ত্রী থাকাবস্থায় পঞ্চম স্ত্রী হিসেবে কোন মহিলাকে বিবাহ করে ফেলে অথবা একই সাথে

মা, কন্যা তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম যুফার র. এর মতে তাতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। যদিও হারাম হওয়ার বিষয়টি তার জানা থাকে। বিবাহের কারণে তাকে মোহরানা পরিশোধ করতে হবে এবং তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এই শাস্তি তাকে তাযিরী ও অনৈতিকতার জন্যে দেয়া হবে। শরীয়তের নির্ধারিত হদ্দ হিসেবে এ শাস্তি প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু তাদের সাথে বিবাহ হারাম এ জ্ঞান যদি তার না থাকে তবে তার উপর হদ্দ ও তাযির কোনোটাই সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ র. বলেন, হারাম হওয়ার বিষয়টি যদি তার জ্ঞাত থাকে তবে হদ্দ ওয়াজিব হবে। সূত্র, শরহে কানয, আল আইনী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪৬, মাতবায়া : আলমায়মুনা, কায়রো। তাতে লিখা হয়েছে, মাহরাম মহিলার সাথে সঙ্গমের অপরাধে কাউকে হদ্দ দেয়া যাবে না, যদি না সে বিবাহ করে থাকে। কারণ এই বিবাহটিকে সংশয়জনক বিবাহ মনে করা হবে। এটিই ইমাম আবু হানীফা র. এর অভিমত। অবশ্য সে যদি বিবাহ হারাম সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে তবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, উল্লেখিত অবস্থায় হারাম হওয়ার জ্ঞান থাকলে তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে। কারণ এসব মহিলার সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত। সূত্র-আল-হিদায়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৬, মাতবায়া আলবাব আল হালবী, মিসর ১৩০০ হিজরী।

১ আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৫২-১৫৩।

২ শরহে ফাতহুল কাদীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৮, বংশ ও দুগ্ধপান সম্পর্কিত মহিলাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান।

৩ প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

পাঁচজন মহিলাকে বিবাহ করে,[১] অগ্নিপূজক[২] কিংবা পৌত্তলিক[৩] নারীকে বিবাহ করে অথবা যে নারীর দুধপান করেছে তার আপন বোনকে বিবাহ করে। বিবাহ এক সাথে হোক বা ভিন্ন ভিন্ন[৪] কিংবা অপরের বিবাহিতা স্ত্রীকে, অথবা ইদ্দত পালনরত নারীকে বিবাহ করে অথবা এ ধরনের নারীর সাথে সহবাস করে অথবা নিজের তিন তালাক দেয়া স্ত্রীর সাথে সহবাস করে[৫] তবে সবকটি অবস্থাতেই তাকে কঠোর তাযিরী শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইমাম মালিক র. বলেন, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম এ ব্যাপারে জ্ঞান থাকার পরও যদি মা, বোন, খালা, ফুফু, এ ধরনের কাউকে বিবাহ করে এবং তাদের সাথে সহবাসও করে তবে তার উপর যেনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে, যদি স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে এই কর্ম করে থাকে।[৬]

ইমাম শাফিয়ী র. বলেন, জ্ঞাতসারে এবং স্বজ্ঞানে কেউ যদি মাহরাম কাউকে বিবাহ করে সহবাস করে তবে তার উপর যেনার হদ্দ কার্যকর হবে। যেহেতু এই বিবাহ হারাম হওয়া সম্পর্কে সরাসরি পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তার সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় করার কারণে সংশয়ের অবকাশও ধর্তব্য হবে না।[৭]

---

১ আল-বাদায়ে আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি পঞ্চম বিবাহ করে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছে। এমতাবস্থায় আবু হানিফা র. এর মতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর মতে অভিযুক্তের উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে। শরহে কানয, আইনী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৬।

২ শরহে ফাতহুল কাদীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৮, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৫, শরহে আইনী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৬।

৩ প্রাগুক্ত।

৪ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৫। তাতে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করে এবং তার সাথে সঙ্গম করে বসে, তবে আবু হানিফা র. এর মতে তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। যদিও বিবাহ হারাম হওয়ার বিষয়টি তার জানা ছিল। এজন্য তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আহমদ র. এর মতে অভিযুক্তের উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে। শরহে কানয, আইনী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৬।

৫ শরহে ফাতহুল কাদীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৮, হাফিয আদ-দীন, আল-আইনীতে লিখেছেন, পরস্ত্রী, অথবা কারো ইদ্দত পালনরত স্ত্রী, অথবা কারো তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মুহাররামাতের পর্যায়ভুক্ত।

৬ আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৩৯।

৭ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-১১৩-১১৪।

www.pathagar.com

হাম্বলী মতাবলম্বীগণ বলেন, বস্তুত মাহরামের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সকলের মতেই অবৈধ। এমন কোন কথিত স্বামী যদি সহবাস করে তবে তার উপর হদ্দ এর শাস্তি কার্যকর হবে। 'আলমুগনী' এর প্রণেতা বলেন, অধিকাংশ ফকীহ্ একই মত পোষণ করেন। যেমন হাসান বসরী, যায়েদ বিন ছাবিত, জাবির ইবনে যায়েদ, ইমাম শাফিয়ী, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ইসহাক, আবু আইউব এবং ইবনে আবু হাইছামা র. প্রমুখ। এসব মনীষীর দলীল হলো, অভিযুক্ত ব্যক্তির কর্মটি এমন জায়গায় সম্পাদিত হয়েছে, সর্বসম্মতভাবে যার সাথে সহবাস হারাম। কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তি না এই মহিলার সাথে সহবাস করার অধিকার রাখে, না এ অধিকার প্রশ্নে কোন ধরনের সংশয়ের অবকাশ আছে। তাই নিসন্দেহে যেনা করেছে, ফলে সে হদ্দযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত যেহেতু এই কাজটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে সে জ্ঞাত ছিল তাই সে হদ্দ যোগ্য অপরাধী। এটির তুলনা হবে এমন সহবাসের সাথে যে নারীর সাথে কোন ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াই সহবাস করা হয়েছে। দৃশ্যত এক উপাদানই সহবাসকে বৈধতা দেয় বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে সম্পর্ক বিশুদ্ধ মনে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ও নিষিদ্ধ; সেই সাথে অভিযুক্তের এই কর্মটি একটি জঘন্য অপরাধ হওয়া ছাড়াও অবশ্য দণ্ডযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে হদ্দ রহিত হয়ে যাওয়ার কোন উপাদান যোগ হতে পারে না।[১]

জীবিত নারী হওয়া

হদ্দযোগ্য যেনার শর্তাবলীর অন্যতম একটি হচ্ছে, ধর্ষিতা বা যেনার শিকার নারী জীবিত হওয়া। মৃত নারীর সাথে যেনা করলে হদ্দ কার্যকর হবে না। মৃতের সাথে অপকর্মকে যেনা বলা যাবে না। কারণ তখন কাজটি মৃতের প্রতি অসম্মানের পর্যায়ে পড়বে এবং সুস্থ স্বাভাবিক কোন মানুষ কোন মৃতের সাথে যেনায় প্রবৃত্ত হতে পারে না। কেননা মৃত মানুষের প্রতি স্বভাবতই কেউ যৌন আকর্ষণ অনুভব করে না। এমন ঘটনায় কোন বিধিবদ্ধ শাস্তি ঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করেনি শরীয়ত। কিন্তু তারপরও যদি কোন নরাধম এমন কাণ্ড করে বসে তবে শরীয়তে সুনির্দিষ্ট শাস্তি না থাকার কারণে অভিযুক্তকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[২]

---

১ আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৫২-১৫৪।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৪। তাতে বর্ণিত হয়েছে, মৃত মহিলার সাথে সঙ্গমের কারণে হদ্দ কার্যকরী হয় না। এটি তাযিরযোগ্য অপরাধ। দেখুন, আল-

www.pathagar.com

জীবজন্তুর সাথে অথবা নারীকর্তৃক কিংবা পায়ুপথে সঙ্গম হওয়া

সঙ্গমের ঘটনা যদি কোন পুরুষের পক্ষ থেকে না হয়ে কোন নারী বা জীবের দ্বারা ঘটে অথবা কর্মটি নারী প্রজননতন্ত্রে না হয়ে পায়ু পথে হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের সব ঘটনাই নারীর পায়ু পথে রতিক্রিয়ার সাথে তুলনীয় হবে অথবা কোন পুরুষের সাথে (লাওয়াতাত) সমকাম, কিংবা কোন জীব জন্তুর সাথে রতিক্রিয়া কিংবা শিশুর সাথে রতিক্রিয়া ইত্যাদির পর্যায়ভুক্ত হবে। এ পর্যায়ে আমরা এ ধরনের প্রত্যেকটি অবস্থা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো।

যেনা যদি পুরুষের দ্বারা সংঘটিত না হয়

যেনার অপরাধে হদ্দ এর দণ্ড কার্যকরী করতে হলে এর শর্ত হলো, কর্মটি পুরুষ কর্তৃক সংঘটিত হতে হবে। যদি এমনটি না হয়ে থাকে তবে সেটিকে যেনা বলা হবে না এবং অভিযুক্তকে হদ্দের শাস্তি দেয়া যাবে না।

এক. যেমন কোন নারী যদি বানরের সাথে রতিক্রিয়া করে তবে তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ এই কর্মটি যেনা বা ব্যভিচারের সংগায় পড়ে না। তবে এটি নিসন্দেহে একটি অপরাধ। এমন অপরাধ যে অপরাধে শরীয়তের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তি ঘোষিত হয়নি। তাই এক্ষেত্রে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[১]

মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৫২। তাতে হযরত ইমাম আওযাঈ র. এর অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, মৃত নারীর সাথে সঙ্গমের অপরাধে হদ্দ কার্যকর হবে। কোন মৃত নারীর সম্মুখ ভাগে যদি সঙ্গম করা হয় তবে সেটিকে একজন জীবিত নারীর সাথে সঙ্গম তুল্য মনে করা হবে। বরং এটি এর চেয়েও আরও জঘন্য। এটি খুবই মারাত্মক একটি অপরাধ। তাতে শুধু নারীর অধিকারই ক্ষুণ্ন করা হয়নি, মৃত লাশেরও মর্যাদাহানি করা হয়েছে।

অবশ্য উল্লেখিত ফকীহর এমন একটি মতামতও উদ্ধৃত করা হয়েছে, যাতে তিনি বলেছেন, মৃতের সাথে সঙ্গম অর্থহীন। অনুভূতিহীন অঙ্গে সঙ্গম করা না করা সমান। ফলে তাতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কেননা, মৃত মানুষের প্রতি কোন মানুষের যৌন আকর্ষণ থাকে না। ফলে এমন বিরল ঘটনার ব্যাপারে বিধিবদ্ধ কোন আইনের বিধান করা জরুরি নয়। কারণ হদ্দ এর শাস্তি মানুষকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখা এবং শিষ্টাচার শেখানোর জন্য দেয়া হয়ে থাকে।

১ আল-জাওহারাতুন নাইয়ারা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৫। কোন নারী যদি বানরের সাথে সঙ্গম করে তবে তা কোন পুরুষের জীব জন্তুর সাথে সঙ্গম করার সঙ্গে তুলনীয়। এর অর্থ

www.pathagar.com

দুই. কোন নারী যদি অন্য কোন নারীর সাথে যৌন ক্রিয়া করে যাকে ইংরেজিতে (Lesbinnism) বলা হয় তবে এটিকে যেনা বলা হবে না। এজন্য হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। এই অপরাধে অভিযুক্তকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[১]

যেনা যদি নারীর যোনী পথে না হয়

যেনার হদ্দ কার্যকরী করার জন্যে নারীর যোনীপথে রতিক্রিয়া হওয়াটা শর্ত। কিন্তু রতিক্রিয়া যদি নারীর পায়ুপথে করা হয়, কিংবা কোন পুরুষের সাথে করা হয় তবে ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে এ কাজ যেনার সংগায় পড়ে না। এটি অবশ্যই তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ইমাম আবু ইউসুফ র. ও ইমাম মুহাম্মদ র. উভয় অবস্থাকেই যেনার অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তাদের মতে এ ধরনের অপরাধে অপরাধী যদি বিবাহিত হয় তবে (রজম) প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড এবং অবিবাহিত হলে একশ বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রযোজ্য হবে।[২]

হলো, অভিযুক্তকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। জন্তুর সাথে কোন মানুষের সঙ্গম ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১ শরহে ফাতহুল কাদীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫০, তাতে বর্ণিত হয়েছে, নারী যদি কোন নারীর সাথে যৌন ক্রিয়া করে তাবে উভয়কেই তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৬২। নারীর সমকামিতাকে আল-মুগনীর রচয়িতা যেনা বলে অভিহিত করেছেন। তবে শাস্তি হিসেবে তাযিরকেই প্রযোজ্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, নারী যদি সমকামিতায় লিপ্ত হয় তবে সেটিকে যেনা গণ্য করতে হবে। কেননা, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'কোন নারী যদি কোন নারীর সাথে যৌন ক্রিয়া করে তবে উভয়েই যেনাকারী গণ্য হবে।' তবে তাদের উপর তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য হবে। কারণ সত্যিকার অর্থে তাদের এ কাজের মধ্যে পুরুষাঙ্গের প্রবেশ পাওয়া যায় না। যেমন, কোন একজন নারী আর পুরুষ লোক যদি যোনীপথ ছাড়া যৌন ক্রিয়া করে তবে তাদের উপর তাযিরী শাস্তি হবে।

২ কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা-৬৬। তাতে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি লুতজাতির মতো সমকামের ঘটনা ঘটায়, তবে তাকে তাযিরী শাস্তি এবং যাবজ্জীবন জেল দেয়া হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে যাইলাঈ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮০, ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে, সমকামিতার অপরাধে হদ্দ প্রযোজ্য নয়। জামেউস সগীর গ্রন্থে কারাদণ্ডের উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

ইমাম মালিক র. এর মতেও তাতে যেনার হদ্দ কার্যকরী হবে। কারণ তিনি এ কাজকে যেনা মনে করেন। বিখ্যাত ফিকহের কিতাব 'আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরায়' বর্ণিত হয়েছে, যদি কোন নাবালেগের সাথে যেনার অপরাধ হয়ে থাকে তবে বালিগ ব্যক্তিকে রজম করা হবে। উভয়েই যদি বালেগ হয় তবে উভয়কেই রজম করা হবে, তারা উভয়েই বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক।[১]

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, সমকামিতাও যেনার পর্যায়ভুক্ত। এ কাজে জড়িতদের কেউ যদি অবিবাহিত হয় তাহলে একশ বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত হলে রজম করা হবে। কারো কারো মতে, ইমাম শাফিয়ী এক্ষেত্রে বিবাহিত অবিবাহিতদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন না, উভয়কেই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির রায় দিয়েছেন।[২] ইমাম শাফিয়ী র. থেকে অন্য একটি বর্ণনা এমনও রয়েছে যে, এ ধরনের অপরাধে যেনার হদ্দ প্রযোজ্য যেমনটি ইমাম আবু ইউসুফ র. ইমাম মুহাম্মদ বলেন। এবং ইমাম শাফিয়ী র. এরও এটি বহুল প্রচারিত বক্তব্য।[৩]

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, এটিও যেনা অতএব হদ্দ এর শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৪; মুখতাসার আল-কুদরী, পৃষ্ঠা-১১৩; আল হিদায়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৬; আল-জাওহারাতুন নাইয়ারা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৫; আল -লুবাব, আলমায়দানী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৯/৬০; দুরারুল হুক্কাম, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৪; শরহে কানয, আইনী-খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৬; আস-সারাখসী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৭৭-৭৯। তাতে লিখা হয়েছে, এগুলো এমন অপরাধ যেগুলোতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নেই, ফলে তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য হবে। এছাড়া যদি সংশোধনমূলক কোন শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় তবে তা সমকালীন শাসক তথা বিচারকের মতামতের উপর নির্ভর করবে। তিনি যদি কোন শাস্তিকে প্রয়োজনীয় মনে করেন, তবে দিতে পারবেন। কোনো পুরুষ যদি কোন পরনারীর পায়ুপথে সঙ্গম করে তবে ইমাম আবু ইউসুফ র. ও মুহাম্মদ র. এর মতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে কিন্তু ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

১ আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৩।

২ আল আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১২/২১৩।

৩ শরহে আল কবীর, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৭৫/১৭৭। তাতে বর্ণিত হয়েছে, প্রথমোক্ত অভিমতটি ঐ হাদীসের ভিত্তিতে করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে– 'যাকে তোমরা লুত আ. এর জাতির মতো (বিকৃত) যৌনকর্ম করতে দেখতে পাও, তাদের কর্তা ও পাত্র উভয়কেই হত্যা করে ফেলো।' অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'উপরের ও নীচের উভয়জনকে রজম করো।' তাছাড়া এ ধরনের অপরাধে শাস্তির ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, এ অপরাধের অপরাধীকে রজম বা হত্যা করা হবে।

www.pathagar.com

উল্লেখিত দণ্ড এমন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি রতিক্রিয়া পুরুষে পুরুষে, কিংবা নারীতে নারীতে অথবা কোন পরনারীর পায়ুপথে হয়ে থাকে। কিন্তু এ কর্ম যদি কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে করে তবে সকল ফকীহ একমত যে স্বামীর উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে না, তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। কারণ স্বামী এমন অপরাধ করেছে যাতে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নেই।[১]

(গ্রন্থকার বলেন) আমার মতে, উল্লেখিত সকল অপরাধের ক্ষেত্রেই তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য হবে। কারণ এগুলো যেনার পর্যায়ভুক্ত নয়। যেনা হলো, কোন পুরুষ কর্তৃক পরনারীর সাথে যোনী পথে রতিক্রিয়া সম্পন্ন করা। বস্তুত উপরে উল্লেখিত সকল অবস্থাতেই তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য।

এমন ধরনের দুষ্কর্ম যদি কেউ কোন জীবজন্তুর সঙ্গে করে তবে তার উপরও হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ এ কর্মটি যেনার সংগায় পড়ে না। হানাফী ফকীহগণের মতে এমন লোককে তাযিরী শাস্তি দিতে হবে। কারণ ঘটে যাওয়া কর্মটির ব্যাপারে শরীয়ত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি ঘোষণা করেনি।[২] ইমাম

তবে কীভাবে হত্যা করা হবে এ ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হযরত আলী রা. বলেন, এ ধরনের অপরাধীকে রজম করা হবে। কারণ লূত আ. জাতিকেও রজম করা হয়েছিল। দ্বিতীয় মতের ভিত্তি হলো, সেই হাদীস যাতে বলা হয়েছে– কোন পুরুষ যদি কোন পুরুষের সাথে যৌনক্রিয়া করে তবে তাদের উভয়েই যেনাকারী। কারণ যেনার সংগা হলো, কোন মানুষ তার যৌনাঙ্গ অপরের যৌনাঙ্গে প্রবেশ করাবে কোন বৈবাহিক সম্পর্ক কিংবা সম্পর্কের সংশয় ছাড়া। বস্তুত সমকামীতাও পরনারীর সাথে সঙ্গম করার মতোই একটি অপরাধ। এক্ষত্রে ইমাম আবু হানিফা র. এর অভিমত হলো, পায়ু পথ সঙ্গমের কোন জায়গা নয়, তাই এতে যৌন ক্রিয়া সঙ্গমের পর্যায়ভুক্ত নয় বলে যেনা বলে বিবেচিত হবে না। আরো বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৫১-১৫২।

১ তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮০/১৮১। কেউ যদি নিজ স্ত্রীর সাথে এমনটি করে তবে সর্বসম্মতভাবে তাতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। তবে নিষিদ্ধ কর্ম করার কারণে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। আল-জাওহারাতুন নাইয়ারা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৫, আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৬২। তাতে বর্ণিত হয়েছে, সে যদি নিজ স্ত্রীর পায়ু পথে সঙ্গম করে থাকে তবে কাজটি হারাম হয়েছে কিন্তু তাতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কারণ স্ত্রীর সর্বাঙ্গই যৌন কর্মের ক্ষেত্র। কোন কোন ফকীহ তো এ কর্ম জায়েয হওয়ার পক্ষেও অভিমত দিয়েছেন। বস্তুত যে ক্ষেত্রে সংশয় ও মতপার্থক্য রয়েছে সে ক্ষেত্রে হদ্দ প্রয়োগের অবকাশ নেই। তবে সমকামিতার বিষয়টি এর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৪। কোন জীবজন্তুর সাথে সঙ্গম হদ্দযোগ্য অপরাধ নয়। তবে এই অপরাধে তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ এটি এমন

www.pathagar.com

মালিক র. এ মতই ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। শারহুল কবীর গ্রন্থে এ মতের পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে, এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সহীহ কোন হাদীস নেই। এ কাজটিকে কোন মানুষের সাথে কৃত যৌনাচারের সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ একজন মানুষের যে মর্যাদা রয়েছে কোন জীব জন্তুর এই মর্যাদা নেই। তাছাড়া সাধাণত মানুষের রুচি এটিকে ঘৃণা করে। যে কোন সুস্থ মানুষের কাছে এটি ঘৃণ্য কাজ। ফলে এ ধরনের কাজে হদ্দ এর মতো কঠোর শাস্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নেই। মূলনীতি হিসেবেই এটিতে কোন হদ্দ নেই এমন পর্যায়ে এটিকে রাখা উচিত। রসূলুল্লাহ স. এর বর্ণিত হাদীস, 'কেউ যদি কোন জীবজন্তুর সাথে যৌনকর্ম করে তবে সেই ব্যক্তি ও জানোয়ার উভয়কে হত্যা করে ফেলো।'

এ হাদীসটি শুধু আমর ইবনে আমর রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ এর সমর্থনে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। আমর ইবনে আমর রা. সম্পর্কে ইমাম তাহাবী র. বলেন, আমর খুব দুর্বল রাবী। তিনি ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, অথচ ইবনে আব্বাসের অবস্থান এর বিপক্ষে। ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমর থেকে বর্ণিত হাদীস যঈফ বা দুর্বল।

ইমাম আহমদ র. কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, কেউ যদি জীব জন্তুর সাথে সঙ্গম করে তখন কি শাস্তি হবে? ইমাম আহমদ তখন দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকেন কিন্তু এই হাদীসটির তিনি উল্লেখ করেননি। যেহেতু যে কোন ধরনের সংশয়ের অবকাশে হদ্দ রহিত হয়ে যায়, তাই এমন যঈফ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু হদ্দ কার্যকরী না হওয়াটা তাযিরী শাস্তিকে নিষেধ করে না। বরং এমন জঘন্য কর্মের জন্য অভিযুক্তকে তাযিরী শাস্তি প্রদান খুবই যৌক্তিক।[১]

অপরাধ যাতে নির্দিষ্ট শাস্তি নেই, তাই তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। শরহে কানয, আইনী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৬; আল-জাওহারাতুন নাইয়ারা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৫; আল লুবাব, আল-মায়দানী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬০। তাতে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি কোন জীব জন্তুর সাথে সঙ্গম করে সে সেটির মালিক হোক বা না হোক তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কেননা এ কর্মটি যেনার সংগায় পড়ে না। তবে তাকে তাযিরী শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে। কেননা সে একটি নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করেছে। দুরারুল হুক্কাম, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৪।

১ আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৩/১৪। আশ-শারহুল কবীর, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৭৭। আরো দেখুন, আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১২।

www.pathagar.com

নাবালেগ ও নাবালেগার বিধান

ইমাম মালিক র. বলেন, কোন নারী যদি এমন কোন বালকের সাথে যেনা করে যে বালকের তখনো স্বপ্নদোষ হয়নি কিংবা বীর্যপাত ঘটেনি বটে কিন্তু বালকের সঙ্গম করার মতো ক্ষমতা আছে, তবে সেই নারীর উপর যেনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কারণ ইমাম মালিক র. এর দৃষ্টিতে এ কাজ যেনার সংগায় পড়ে না। যেহেতু কাজটি হারাম এজন্য তার উপর তাযিরী শাস্তি কার্যকর হবে।[১]

আল-মুগনী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, নাবালেগা বালিকা যদি যেনা করার উপযোগী হয় তবে তার উপর যেনার শাস্তি কার্যকর হবে। কিন্তু যদি বালিকা সঙ্গমের উপযুক্ত না হয় তদুপরি কেউ তার সাথে সঙ্গম করে তবুও সঙ্গমকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে, কারণ সঙ্গমকারী একজন নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটিয়েছে। এটি একজন পূর্ণ বয়স্কা নারীর সাথে যেনার মতোই অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এমন বর্ণনা কোন কোন ফকীহ থেকে রয়েছে যে, নাবালেগা বালিকার সাথে কৃত সঙ্গমে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কারণ এটি খুবই কম ঘটে থাকে এবং বিষয়টি না হওয়ার মতোই। আর যে ক্ষেত্রে এ কাণ্ডটি ঘটেছে ক্ষেত্রটি যেনার কাজে আকৃষ্ট হওয়ার মতো নয়। কাজেই এমন কর্মে হদ্দ প্রয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

এমন একটি বর্ণনাও রয়েছে, বালিকার বয়স যদি নয় বছরের কম হয় তবে তাতে হদ্দ নেই, কারণ এমন শিশুর প্রতি যৌন আকর্ষণই হয় না। অনুরূপ কোন দশ বছরের কম বয়স্ক বালকের সাথে যদি কোন পূর্ণবয়স্কা নারী সঙ্গম করে তবে তাতেও হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।

তাতে বর্ণিত হয়েছে, জন্তুর সাথে যে সঙ্গম করে সে যেনাকারী। সে যদি অবিবাহিত হয় তবে তাকে একশ বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে হবে। আর বিবাহিত হলে তাকে রজম করা হবে। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, অপরাধী বিবাহিত অবিবাহিত যাই হোক না কেন, তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন জন্তুর সাথে সঙ্গম করে সে এবং উক্ত জন্তু উভয়কেই হত্যা করা হবে।' আরো দেখুন, আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৬৩। তাতে বর্ণিত হয়েছে, জীবজন্তুর সাথে সঙ্গমের বিধান সমকামিতার বিধানের মতো। ফকীহ হাসান র. বলেন, এ অপরাধে যেনার শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত হয়েছে, উভয়কেই হত্যা করা হবে। কারণ, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'কেউ যদি জনোয়ারের সাথে সঙ্গম করে তবে তাকে এবং জানোয়ার উভয়কেই হত্যা করা হবে।'

১ আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৪৩।

www.pathagar.com

উল্লেখিত বক্তব্যগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে আল-মুগনীর প্রণেতা বলেন, যেক্ষেত্রে সঙ্গম সম্ভব সে ক্ষেত্রে যে 'মুকাল্লাফ বিশ শরীআহ' অর্থাৎ যে পূর্ণবয়স্ক তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে নয় বা দশ বছরের সীমারেখা টেনে দেয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

শরীয়তের পক্ষ থেকে যদি কোন সীমারেখার কথা উল্লেখ থাকে, সেক্ষেত্রে সীমারেখা টেনে দেয়ার সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে শরীয়ত কোন বয়সের সীমা বলেনি। বলা হয় নয় বছর বয়সে একজন সুস্থ মানুষ সঙ্গমের স্বাদ অনুভব করতে শুরু করে, এ বিষয়টি এমন নয় যে, এর আগে কেউ তা অনুভব করতে পারবে না। যেমন বলা হয়ে থাকে; পনেরো বছর বয়সে একজন কিশোর বালেগ হয় কিন্তু এ কথা কোন সীমারেখা টেনে দেয়নি যে, পনেরো বছরের আগে কোন কিশোর বালেগ হতে পারবে না।[১]

২. অশ্লীলতা ও বেহায়াপনামূলক অপরাধ

যেনার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের যে সকল অপরাধে নির্দিষ্ট কোন শাস্তি শরীয়তে নেই, সেগুলোও ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে অপরাধের পর্যায়ভুক্ত। এগুলোতে অপরাধীকে তাযিরী শাস্তি ভোগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন নারী যদি যৌনাঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য কোন ভাবে রতিক্রিয়া করে, যেমন পেট উরুসন্ধি ইত্যাদি; এটি এমন অপরাধ যাতে সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তি নেই, তাই তাযিরী শাস্তি কার্যকর হবে।[২] এমনও হতে পারে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন পরনারীর সাথে সঙ্গমের প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড করেছে, যেমন মর্ষকাম, চুম্বন, মর্দন লেহন ইত্যাদি বস্তুত সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই সে করেছে, তবে এই অপরাধে তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[৩] অনুরূপ কোন পরনারীকে স্পর্শ করা, চুমু দেয়া, আলিঙ্গন করা ইত্যাদিতেও তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[১]

---

১ আল-মুগনী, খণ্ড-১০ পৃষ্ঠা-১৫২।

২ "শরহে ফাতহুল কবীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫০। তাতে লিখা হয়েছে, 'মূল লেখক এর বক্তব্য, যে ব্যক্তি পরনারীর সঙ্গে যোনীপথ ছাড়া অন্য কোন পথে সঙ্গম করেছে, এর অর্থ হলো, কেউ যদি দুই উরুর মাঝে কিংবা পেটের ভাজে রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে যার মধ্যে পায়ু পথ পড়ে না তবে এই অপরাধীকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ তাতে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি নেই। আল-লুবাবুল মায়দানী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৮; শরহে কানয, আইনী, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-২২৬; কুদূরী, পৃষ্ঠা-১১০, মাতবায়া উসমানিয়া, ১৩০৯ হিজরী।

৩ আল মাবসূত, আস-সারাখসী, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৩৬। তাতে বর্ণিত হয়েছে, অপরাধী অপরাধ কর্ম শুরু করে দিয়েছিল এবং সঙ্গম ছাড়া সে সঙ্গমের প্রাসঙ্গিক সব কর্মই

www.pathagar.com

এ ধরনের কর্মকাণ্ড অপরাধের পর্যায়ভুক্ত কারণ এতে অভিযুক্ত ব্যক্তি পরনারীর গোপন অঙ্গে হস্তক্ষেপ করেছে। এক্ষেত্রে কারো এই আপত্তি করার অবকাশ নেই যে, কেউ যদি কোন পরনারীর মুখে চুমু দেয় তাহলে তা অপরাধ বিবেচিত হওয়া উচিত নয়, কারণ চেহারা বা মুখমণ্ডল সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিশেষ করে আক্রান্ত নারী যখন তার চেহারা খোলা রেখে চলে এবং চেহারায় চুমু দেয়াটাকে সে অপমানকর ও অমর্যাদাজনক মনে না করে। কোন মহিলা বা নারী যদি তার কোন অঙ্গকে সতর জ্ঞান না করে উন্মুক্ত রাখে তখন কেউ তাকে চুমু দিলে অপরাধ হবে কেন?

এর জবাব হলো, জমহুর আলিমের নিকট চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কিছু বা কতিপয় লোকের বিভ্রান্তি বা বিকৃত রুচির কারণে একটি নিষিদ্ধ বিষয় বৈধতা পেতে পারে না। উল্লেখিত কাজগুলো যদি কোন নারী করে তবে সর্বসম্মত ভাবেই সেগুলো অশ্লীলতা এবং মুসলিম নারীর জন্যে অবমাননাকর। তাই যে কোন নারীর চেহারায় চুমু খাওয়া মানহানির পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে।[২] আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, উল্লেখিত অপরাধসমূহ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী পাশ্চাত্যের আধুনিক আইন এবং শরীআহ আইনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অপরাধ বিবেচিত হওয়ার জন্য এ ধরনের কর্মকাণ্ড জোরপূর্বক কিংবা ভয়ভীতির মাধ্যমে হওয়া জরুরী বিবেচনা করে না। ইসলামী শরীয়ত বলপ্রয়োগ ও ভয়ভীতিকে অপরাধের মূলভিত্তি মনে করে না, কারণ এ ধরনের আচরণ শুধু আক্রান্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হয় না বরং গোটা সমাজ ব্যবস্থাকেই কলুষিত করে। অথচ আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নৈতিক ও চারিত্রিক অপরাধের ক্ষেত্রে জোরপূর্বক, বলপ্রয়োগ কিংবা ভয়ভীতিকে অপরাধের মূল উপাদান মনে করা হয়। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক/বালিকা হয় তবে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হয়।[৩]

সেরে ফেলেছে, তবে তার উপর ৩৯ বেত্রাঘাতের শাস্তি বর্তাবে। আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৬২।

১ আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৭। এক ব্যক্তি স্বাধীন কোন পরনারীকে চুমু দিল, অথবা পরনারীর সাথে কোলাকুলী করল, অথবা যৌন উত্তেজনা নিয়ে স্পর্শ করল, তবে তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।

২ অধিকাংশ ফকীহ মনে করেন, নারীর মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়। এটি মানলেও কোন পরনারীকে চুমু খাওয়া অপরাধ। কারণ এটি অন্যের ব্যক্তি মর্যাদায় হস্তক্ষেপ।-গ্রন্থকার।

৩ শরহে কানূনে তাযিরাত, ডক্টর মাহমুদ ও মাহমুদ মুস্তাফা। বিশেষ অংশ। প্রকাশকাল : ১৯৪৮ খৃ., দারুন নাশার আস্ সাকাফা, ইস্কান্দারিয়া, পৃষ্ঠা-২৪৩। মিসরীয় দণ্ডবিধির

www.pathagar.com

অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা

অপরাধের পর্যায় যদি এমন হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কর্মটি করেছে তা উপরে উল্লেখিত অপরাধগুলোর পর্যায়ে পড়ে না, যা আক্রান্ত ব্যক্তির সতরের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তার জন্যে অপমানজনক। কিন্তু এখন আমরা আলোচনা করছি এমন কর্মকাণ্ড নিয়ে যা শালীনতা ও শিষ্টাচার পরিপন্থী এবং যা দেখে বা শুনে মানুষ লজ্জা পায় কিংবা শুনতে বিব্রতবোধ করে তবে কর্মটি নোংরা অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে না এবং এটি মানুষের জন্যে অপমানজনকও নয়, আধুনিক আইনে যাকে 'বিব্রতকর' বলে অভিহিত করা হয়। এটিও এক প্রকার অপরাধ এবং এই অপরাধে শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন শাস্তি ঘোষিত হয়নি। তাই ইসলামী আইনে এ ধরনের অপরাধে তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। অপরাধী এ অপরাধ প্রকাশ্যে করুক বা গোপনে করুক। যেমন, কেউ যদি কারো সামনে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে যায় তবে এটা দর্শকের জন্য চরম বিব্রতকর কিন্তু শরীয়তে এর জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি নেই। এ কাজটি নিঃসন্দেহে শালীনতা ও শিষ্টাচার পরিপন্থী, তাই অভিযুক্ত ব্যক্তি তাযিরী শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।[১]

---

২৬৮ নম্বর ধারায় এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কেউ যদি বল প্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন করে কারো সম্ভ্রমহানী ঘটায়, অথবা এমন পদক্ষেপ নেয়, তাকে তিন থেকে সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে। আক্রান্ত নারীর বয়স যদি ১৬ (ষোল) বছর পূর্ণ না হয়ে থাকে, অথবা অপরাধী সেইসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত দফা (২৬) (খ) তে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাহলে কারাবাসের সময় যতো ইচ্ছা ততো বাড়ানো যাবে এবং সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে। মিসরীয় দণ্ডবিধির ১২৬৯ নং দফা এ বিষয়টির ব্যাখ্যায় বলেছে, কেউ যদি বলপ্রয়োগ বা ভয়-ভীতি না দেখিয়ে নাবালেগ বালক বালিকার সম্ভ্রমহানি ঘটায়, যার বয়স এখনো আঠারো বছর পূর্ণ হয়নি, তবে তাকে কারাবাসের শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু আক্রান্ত বালক বালিকার বয়স যদি সাত বছর পূর্ণ না হয়ে থাকে, কিংবা অপরাধী যদি তাদের কেউ হয়ে থাকে ধারা ২৬৭ (খ)তে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে। ধারা ২৬৭ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি আক্রান্তের পূর্বসূরীদের কেউ অথবা তার অভিভাবকের কেউ, অথবা তার তত্ত্বাবধানকারীদের কেউ, অথবা সে যাকে টাকার বিনিময়ে শ্রম দেয়, অথবা উপরে উল্লেখিতদের কারো অর্থের বিনিময়ে শ্রমিক হয়ে থাকে। তবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

১ আল-ফাতওয়া আল আসাদিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৯। তাতে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি কাউকে বলে, তুমি তোমার নিজের পাত্র থেকে আমাকে এক পাত্র পানি দাও, তা আমি আমার জানোয়ারকে খাওয়াবো, প্রত্যুত্তরে ঐ লোকটি কাপড় খোলে তাকে লজ্জাস্থান

www.pathagar.com

মিসরীয় আইন এ ধরনের অপরাধে শাস্তি দানের জন্যে কর্মটি প্রকাশ্যে সম্পাদিত হওয়াকে জরুরী মনে করে। অবশ্য কোন নারীকে উদ্দেশ্য করে যদি গোপনেও কোন পুরুষ এ কাজ করে তবে সেও শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।[১]

চরিত্রহননমূলক কর্মকাণ্ড

যেসব কাজ চরিত্রহননমূলক ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সেগুলো অপরাধ। যেহেতু চরিত্রহননমূলক কাজে শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন শাস্তি নেই তাই এগুলোতে তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। যেমন, কোন লোক যদি নাবালেগা কোন মেয়েকে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়, এই অপরাধে তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ এই অপরাধে ইসলামী আইনে সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তি নেই। তবে অপহরণ করার পর অপহরণকারী যদি তার সাথে এমন কোন অপরাধ করে যে অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে, তবে অপহরণকারীকে সেই শাস্তি দেয়া হবে।[২]

কেউ যদি কোন বিবাহিতা মহিলাকে তার স্বামীর ঘর কিংবা অবিবাহিতা মেয়েকে তার বাবার ঘর থেকে অপহরণ করে অন্য কারো কাছে বিয়ে দিয়ে দেয়, এক্ষেত্রেও অপহরণকারীর তাযিরী শাস্তি হবে। কারণ এক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি নেই।[৩]

দেখিয়ে বলল, এ থেকে আমি তোমাকে পান করাবো, তাহলে সে তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধী বিবেচিত হবে।

১ মিসরীয় দণ্ডবিধির ২৭৮ নং দফায় বলা হয়েছে, কেউ প্রকাশ্যে কোন অশ্লীল অসম্মানজনক কর্মকাণ্ড ঘটালে, তাকে কারাবন্দির শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তবে এ শাস্তি এক বছরের চেয়ে বেশি হবে না। অথবা তাকে ৫০০ মিসরীয় পাউন্ডের জরিমানা করা হবে।

২ আল-ফাতাওয়া আল-আনকারাবিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৭। তাতে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি তরুণী বা মহিলাকে অপহরণ করে কোন অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। অপহৃত নারীকে ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এ অপরাধে অপরাধীকে কারারুদ্ধ রাখা হবে। এ অভিমত ইমাম মুহাম্মদ র এর। অথবা যে পর্যন্ত না সে অপহৃতার অবস্থান ও ভাগ্য সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য দেবে ততোদিন পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হবে।

৩ আল-আশবা ওয়া আন-নাযায়ের, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০০। তাতে বর্ণিত হয়েছে, এক লোক কারো স্ত্রীকে অপহরণ করে তাকে অন্য কারো সাথে বিবাহ দিয়ে দিয়েছে, অথবা কোন তরুণীকে অপহরণ করে অনুরূপ কাণ্ড করেছে, তাকে তওবা না করা পর্যন্ত কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত বন্দি করে রাখা হবে। কারণ সে সমাজে অস্থিতিশীলতা ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

কোন লোক যদি পরনারীর ঘরে তার সম্মতিতে যায় তাকেও তাযিরী শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ কাজ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি বারবার করে তবে তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। সেই সাথে সেই নারীকেও কঠোর শাস্তি দিতে হবে যে পরপুরুষকে তার ঘরে আসার অনুমতি দিয়েছে।[১]

হস্তমৈথুন

হস্তমৈথুন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেহেতু শরীয়ত কর্তৃক এতে কোন শাস্তি নির্ধারিত নেই এজন্য এই অপরাধে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[২]

স্মর্তব্য, কাশশাফুল-কিনা-এর লেখক লিখেছেন, হস্তমৈথুন অত্যধিক প্রয়োজনে জায়েয। কাজেই এ কাজের জন্য তাযিরী শাস্তি ওয়াজিব হবে না। অবশ্য যদি অত্যধিক প্রয়োজন না হয় তবে এটি অবশ্যই হারাম এবং এ ধরনের কর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ, অত্যধিক প্রয়োজন ছাড়া এ কাজ একটি নৈতিক বিকৃতি, এজন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কেননা, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে'। 'কাশশাফুল কিনা' কিতাবে লিখা হয়েছে, হস্তমৈথুন নারী দ্বারা ঘটলেও একই অপরাধ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত রুচির নারীরাও বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার করে রতিক্রিয়ার বিকৃত স্বাদ অনুভব করে। কোন স্বামী যদি স্ত্রীকে দিয়ে নিম্নাঙ্গের পশম অপসারণ করায় তবে সেটি নাজায়েয হবে না। এটি স্ত্রীকে চুমু দেয়ার পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে।[৩]

---

১ ঈদ্দাতু আরবাবিল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা-৭৮। কোন নারী যদি কোন পর পুরুষের ঘরে স্বেচ্ছায় গমন করে অথবা পরপুরুষকে ভালোবাসে, তবে সেই পুরুষ যদি পূর্বে এমন কর্ম না করে থাকে তবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। যদি পুরুষ পূর্বেও এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে, তবে বিচারক তার বিবেচনা মতো শাস্তি দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে বিচারক প্রহার করতে পারেন, অথবা বন্দি করতে পারেন, দেশান্তর করতে পারেন কিংবা সংশোধনীমূলক কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং পরপুরুষকে তার ঘরে প্রবেশ করানোর অপরাধে সংশ্লিষ্ট নারীকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।

২ আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৭।

৩ কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭৫, তাতে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি যেনায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা থেকে হস্তমৈথুন করে, অথবা অসহনীয় শারীরিক উত্তেজনা প্রশমনে হস্তমৈথুন করে, তাহলে তার উপর কোন শাস্তি হবে না। ফকীহ মুজাহিদ বলেছেন, এক সময় মুরব্বীরা তরুণদেরকে যৌন অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য হস্তমৈথুনে উৎসাহিত করতেন। মুজাহিদ আরো বলেন, এমনটি তখনই জায়েয যখন সুস্থ স্বাভাবিক বা স্বাস্থ্যবান কোন যুবকের পক্ষে কোন মেয়েকে বিবাহ করার

www.pathagar.com

আর্থিক কিংবা পারিপার্শ্বিক সংগতি না থাকে। কারণ তখনকার এ কাজটি ছিল প্রয়োজনের খাতিরে। এভাবেই তৎকালীন যুবকেরা তাদের যৌন চাহিদা পূরণ করতো। যদি যুবক বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে তখন আর তার পক্ষে এমনটি করা জায়েয হবে না। কারণ বিনা প্রয়োজনে এমন কাজ করা কঠিন গোনাহ। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেন, 'ওয়াল্লাযিনাহুম লি ফুরুযিহিম হাফিযুন' যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।' ফকীহ ইবনে আরাফা তার 'হাযব' গ্রন্থে এ মর্মে একটি হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। 'আল-মাবদা' এর গ্রন্থকার বলেছেন, এক্ষেত্রে মহিলাদেরও একই বিধান। কারণ তারাও অনেক ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গ সদৃশ বিশেষ বস্তু ব্যবহার করে। ইবনে আকীল এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'পুরুষের জন্যে এটি জায়েয সে তার স্ত্রী কিংবা বাদীর দ্বারা হস্তমৈথুন করাবে। কারণ এ কাজটি তার জন্য স্ত্রী বা বাদীকে চুমু দেয়ার পর্যায়ভুক্ত একটি কর্ম মাত্র।'

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
যে কযফ ও গালিগালাজে হদ্দ নেই

প্রথম অনুচ্ছেদ
যে কযফে (মিথ্যা অপবাদ) হদ্দ নেই

যেনার ক্ষেত্রে যেসব বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, কযফ এর ক্ষেত্রেও হুবহু একই বিধান। কযফ এর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর কযফ এর হদ্দ কার্যকরী হবে না, যদি হদ্দ কার্যকর হওয়ার শর্তাদি না পাওয়া যায়। শর্তসমূহ যদি পুরোপুরি না পাওয়া যায় কিংবা কোন শর্ত প্রমাণে কোন ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে অভিযুক্তের উপর হদ্দ কার্যকর হবে না।[১]

অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি যদি মুহসিন (সচ্চরিত্র) না হয়

কযফ এর হদ্দ কার্যকর করার জন্য অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মুহসিন হওয়া আবশ্যিক।[২] মুহসিন হওয়ার জন্য শর্ত হলো, অপবাদ আরেপিত ব্যক্তির মুসলমান, জ্ঞানী, প্রাপ্ত-বয়স্ক এবং যেনা থেকে পবিত্র হওয়া।[৩] ইসলামের প্রাথমিক যুগে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগের জন্য অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির স্বাধীন হওয়া শর্তযুক্ত ছিল। কিন্তু

---

১ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ এ বর্ণিত হয়েছে, ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যে কযফ এ হদ্দ কার্যকর হয় তা সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত অপরাধী কারো উপর যেনার অপবাদ আরোপ করলো। দ্বিতীয়ত : অপরাধী কারো জন্মসূত্র অস্বীকার করলো, অথচ অভিযুক্ত ব্যক্তির মা একজন মুসলিম। যদি কযফ আরোপিত ব্যক্তির মা অমুসলিম হয় কিংবা বাদী-দাসী হয় এমতাবস্থায় কযফ আরোপকারী অপরাধীর উপর হদ্দ কার্যকর হবে কি না এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক রহ. বলেন, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মা বাদী কিংবা অমুসলিম হলেও হদ্দ কার্যকর হবে। ইবরাহীম নাখয়ী রহ. বলেন, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মা যদি বাদী কিংবা আহলে কিতাব হয় তাহলে হদ্দ কার্যকর হবে না। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অবস্থানও যৌক্তিকতার দৃষ্টিতে তাই হওয়া উচিত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ৩৬।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪০; এতে বর্ণিত হয়েছে- অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি নারী-পুরুষ যেই হোক তাকে মুহসিন হতে হবে।

৩ প্রাগুক্ত; কযফ এ মুহসিন হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত। স্বজ্ঞান হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, স্বাধীন হওয়া, মুসলমান হওয়া এবং যেনা থেকে পবিত্র হওয়া।

www.pathagar.com

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দাস-দাসীর কোন অস্তিত্ব নেই। বস্তুত স্বাধীন হওয়ার শর্তটি নিয়ে এখন বিস্তারিত আলোচনা একান্তই একাডেমিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।[১] মুহসিন এর শর্তগুলোর মধ্যে যদি অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মধ্যে কোন শর্ত পাওয়া না যায় তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর তাযিরী শাস্তি কার্যকর হবে না। যেমন কেউ যদি কোন পাগল অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করে তবে সে তাযিরী শাস্তির উপযুক্ত হয়।[২]

---

১ আল-মাবসূত, আস-সারাখসী, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৩৬/৩৭। তাতে বর্ণিত হয়েছে– কেউ যদি কোন মুসলিম বাদীর উপর অপবাদ আরোপ করে, এমতাবস্থায় অপবাদ আরোপিত বাদী বা দাসীকে মুহসিন নয় এমনটি মনে করা হবে। যেহেতু অপরাধী একজন মুসলমানের চরিত্রে কলংক আরোপ করেছে এবং অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অবাস্তব অশ্লিলতা প্রচার করেছে, যা ইসলামী আইনে হারাম, তাই তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। আল-হিদায়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৭; এতে বর্ণিত হয়েছে– কেউ যদি কোন গোলাম, দাসী কিংবা উম্মে ওয়ালাদের (মুনীবের সন্তান ধারণকারিণী দাসী) উপর অপবাদ আরোপ করে তবে তাকে তাযিরী দণ্ড দেয়া হবে। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আল-কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৮; আল মুদাওয়নাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৪।

২ আল-লুবাব, আল-মায়দানী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৪, তাতে বর্ণিত হয়েছে– কেউ যদি কোন নাবালেগ ব্যক্তির উপর যেনার অপবাদ দেয়, সে তাযিরী শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। কারণ এই অপবাদের কারণে নাবালেগ ব্যক্তির উপর কলংক আরোপিত হয়েছে এবং তার খ্যাতি ও সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। অপরাধীর উপর হদ্দ কার্যকর হবে না, কারণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মুহসিন নয়। হদ্দযোগ্য শাস্তি কার্যকরী হওয়ার পরিধি যেহেতু শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত এজন্য কিয়াস বা পর্যালোচনামূলক তুলনা করে এ ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যাপ্তি বাড়ানো যাবে না, আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২০২।

www.pathagar.com

কেউ যদি কোন অমুসলিমের উপর[১] যেনার অপবাদ আরোপ করে কিংবা এমন কোন নারী বা পুরুষের উপর যেনার অপবাদ দেয় খ্রিস্টান থাকাবস্থায়[২] যার দ্বারা যেনা সংঘটিত হয়েছিল অথবা এমন কোন মুসলিম নারী বা পুরুষের উপর যেনার অপবাদ আরোপ করে বাস্তবে যাদের দ্বারা যেনাকর্ম সংঘটিত হয়েছে[৩] অথবা এমন কোন ব্যক্তির উপর যেনার অভিযোগ আরোপ করে, যে

---

১ আল-মাবসূত, আস-সারাখসী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১১৮; কেউ যদি কোন অমুসলিমের বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ করে তবে অভিযোগকারীর উপর কযফ এর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা, অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তির মুহসিন হওয়ার শর্তের মধ্যে একটি শর্ত হলো- মুসলমান হওয়া। একই গ্রন্থের খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৩৬ এ বর্ণিত হয়েছে– কোন মুসলিম যদি কোন যিম্মি (সরকারের অনুমতি নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম) নারীকে গালি দেয় কিংবা তার বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ আনে তাহলে অভিযোগকারীকে তাযিরী দণ্ড দেয়া হবে। কেননা, যিম্মি নারী মুসলমান নয়। অমুসলিম হওয়ার কারণে তার মধ্যে মুহসিন-এর শর্ত অনুপস্থিত তাই অভিযোগ আরোপকারীর উপর হদ্দ কার্যকর হবেনা। তবে যেহেতু সে এমন একটা জঘন্য অপরাধ করেছে তাই তার উপর তাযিরী শাস্তি কার্যকর হবে। আল-হিদায়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৭; কেউ যদি কোন অমুসলিমের উপর যেনার অপবাদ আরোপ করে তবে তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ সে কযফ এর অপরাধ করেছে কিন্তু এক্ষেত্রে কযফ এর দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না, যেহেতু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মুহসিন নয়। তাই অপরাধী তাযিরী শাস্তি যোগ্য বিবেচিত হবে। আল-লুবাব, আল-মায়দানী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৪।

কেউ যদি কোন অমুসলিমের উপর যেনার অভিযোগ আরোপ করে তবে তকে তাযিরী দণ্ড দেয়া হবে। কেননা সে তার মর্যাদাহানি করেছে এবং তার সুনাম ক্ষুণ্ন করেছে। তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি মুহসিন নয়। মুখতাসার আল-কুদূরী, পৃষ্ঠা-১১১; আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২০১; ইবনে মুসাইব ও ইবনে আবি লায়লা বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন যিম্মি নারীর উপর যেনার অভিযোগ করে যে যিম্মি নারীর কোন ছেলে সন্তান মুসলমান এমতাবস্থায় অভিযোগকারীর উপর হদ্দ কার্যকর হবে। কিন্তু গ্রহণযোগ্য মতামত হলো, অভিযুক্ত ব্যক্তির মুসলিম হওয়া শর্তযুক্ত।

২ শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৫/২০৬; কোন ব্যক্তি যদি খ্রিষ্টান থাকাবস্থায় যেনা করে থাকে; তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর উপরও হদ্দ দণ্ড কার্যকর হবে না।

৩ আল-মাবসূত, আস-সারাখসী, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৩৬/৩৭; অনুরূপ কোন অমুসলিম নারী বা পুরুষ ইসলাম গ্রহণের পর কেউ তাদের বিরুদ্ধে অমুসলিম থাকাবস্থায় যেনা করার অভিযোগ আরোপ করলো, এমতাবস্থায়ও অভিযোগ আরোপকারীর উপর হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ ঘটনা সংঘটনের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি মুহসিন ছিল না। কিন্তু যেহেতু

www.pathagar.com

অশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে রতিক্রিয়া করেছে।[১] অথবা অপরের মালিকানাধীন দাসীর সাথে অবৈধ সহবাস করেছে[২] অথবা এমন নারীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ করেছে, যে নারীর একটি সন্তান আছে বটে কিন্তু তার জনক অজ্ঞাত[৩] অথবা এমন নারীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ করেছে, যে তার সন্তানের জনক সম্পর্কে স্বামীর সাথে লিআন করেছে,[৪] বর্ণিত সকল অবস্থাতেই অভিযুক্ত ব্যক্তির সচ্চরিত্র হওয়ার গুণাবলী অক্ষুণ্ন থাকে না। ফলে অপরাধী হদ্দযোগ্য বিবেচিত হবে না। আমরা উপরে উল্লেখ করেছি,

---

অভিযোগ আরোপকারী একজন মুসলমানের মর্যাদাহানি করেছে, যার কোনই বৈধতা ছিলনা, এবং অশ্লীলতার বিস্তার ঘটিয়েছে তাই তার উপর তাযিরী দণ্ড কার্যকর হবে।

১. আল-মাবসূত, আস-সারাখসী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১০২; কেউ যদি অশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে কোন নারীর সাথে সহবাস করে আর এই কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ যেনার অভিযোগ আরোপ করে তবে অভিযোগকারীর উপর হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তি অশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে সহবাস করার দ্বারা অবশ্যই একটি হারাম কর্ম করেছে, ফলে তার মুহসিনের মর্যাদা বিনষ্ট হয়ে গেছে।

২. শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৪; কেউ যদি অপরের মালিকানাভুক্ত দাসীর সাথে অবৈধ সহবাস করে, তবে অভিযোগ আরোপকারীর উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। কারণ অবৈধ সহবাস করার কারণে অভিযুক্তের মুহসিন গুণাবলী নষ্ট হয়ে গেছে।

৩. শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৩; তাতে বর্ণিত হয়েছে- কেউ যদি এমন কোন নারীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ করে যে নারীর এমন একটি সন্তান রয়েছে, যে সন্তানের জনক অজ্ঞাত, তাহলে দণ্ড কার্যকর হবে না।

৪. শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৩; কোন সন্তানকে কেন্দ্র করে স্বামীর সাথে লিআনকারিনী নারীর বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। অভিযোগের সময় সেই শিশু জীবিত থাকুক বা না থাকুক; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৩৪; এ বর্ণিত হয়েছে- কোন নারী যদি তার সন্তানকে কেন্দ্র করে সন্তান ব্যতিরেকে তার স্বামীর সাথে লীআন করে থাকে, এমতাবস্থায় তার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে। অভিযোগের সময় সেই নারীর সাথে তার সন্তান থাকুক বা না থাকুক; অনুরূপ আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২২৫; এ বর্ণিত হয়েছে- ইমাম আহমাদ রহ. এর মতেও লিআনকারিণী নারীর বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ কার্যকর হবে। ইবনে আব্বাস, হাসান, শা'বী, তাউস, মুজাহিদ, মালিক, শাফেয়ী রহ. এবং জমহুর আলিমগণও একই মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. নবী করীম স. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. লিআনকারিনী নারীর উপর যেনার অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন। তাই তার বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগকারীর উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে। কারণ লিআন করার দ্বারা সেই নারীর মুহসিন গুণ বাতিল হয়ে যায় না। সেই সাথে লিআনের পর সে যেনাকারিনী সাব্যস্ত হয় না। কারণ লিআন করার পর তার উপরে হদ্দদণ্ড কার্যকর হয় না।

www.pathagar.com

ব্যভিচারের অভিযোগ থেকে পবিত্র হওয়া মুহসিন হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত।[১]

মুহসিন হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. যে শর্তারোপ করেছেন, ইমাম শাফেয়ী রহ.ও একই শর্তারোপ করেছেন। উভয়ের কাছে মুহসিন হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য; প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, স্বজ্ঞান হওয়া, মুসলমান হওয়া, স্বাধীন তথা গোলাম– দাসী না হওয়া এবং যেনার অপরাধ থেকে পবিত্র হওয়া। অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি যদি নাবালেগ, পাগল, গোলাম অথবা এমন কোন ব্যক্তি হয়, যেনা করার কারণে যার চরিত্রের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং যেনার অপরাধে তার উপর হদ্দদণ্ড প্রয়োগ হয়েছে, তবে কযফ এর দণ্ড কার্যকর হবে না। কিন্তু যেহেতু সে একজন মানুষের মনে কষ্ট দিয়েছে এবং অশ্লীলতা চর্চা করে বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়েছে, তাই তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[২] কযফ-এর ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বিষয়ে হাম্বলী মতাবলম্বীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে- হাম্বলী মতাবলম্বীদের একটি অভিমত এমন রয়েছে, যাতে মুহসিন হওয়ার জন্য কযফের অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তির প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া আবশ্যিক শর্ত। এ শর্ত মতে, (মাকযুফ) অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি নাবালেগ হলে কাযিফ-এর উপর কযফ এর হদ্দদণ্ড কার্যকরী হবে না। বরং তাকে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। হাম্বলীদের এমত হানাফী ও শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মতের অনুরূপ। ফকীহ আবু সাওর-এর মতও এমতের অনুরূপ।

আবু সাওর বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শরীয়ত পালনের বাধ্যবাধকতার জন্য শর্ত; তাই এটিকে স্বজ্ঞান হওয়ার শর্তের অনুরূপ মনে করতে হবে। কোন নাবালেগ কর্তৃক যদি যেনাকর্ম সম্পাদিত হয় তবে তার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হয় না। বস্তুত এক্ষেত্রেও অভিযোগ আরোপকারীর উপর তাযিরী শাস্তি কার্যকর হবে।

ইমাম আহমাদ রহ. থেকে একটি বর্ণনা এমনও রয়েছে যে, কযফ-এর অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তির বালেগ হওয়া কযফ-এর হদ্দদণ্ড কার্যকর হওয়ার

---

১ আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৩; ফকীহ ইবনে কাসিম বলেন, অবৈধ সহবাসে অভিযুক্ত যে ব্যক্তির উপর কোন কারণে হদ্দ কার্যকর হয়নি, যদিও কাজটি হারাম সাব্যস্ত হয়, তবুও তার বিরুদ্ধে কেউ যেনার অভিযোগ আরোপ করলে অভিযোগকারীর উপর কযফ এর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না।

২ আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১৭।

www.pathagar.com

জন্য আবশ্যিক শর্ত নয়। কারণ, মাকযুফ নাবালেগ হলেও সে যদি জ্ঞানী, স্বাধীন ও চরিত্রবান হয় তাহলে যেনার অভিযোগ তার উপর কলংক আরোপ করে। কারণ এমন অপকর্ম তার দ্বারা সংঘটিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে, তাই এক্ষেত্রে নাবালেগকেও বালেগের সমকক্ষ মনে করতে হবে। স্মর্তব্য, উল্লেখিত বর্ণনা মতে– যে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর যেনার অভিযোগ আরোপকারীর উপর কযফ-এর হদ্দ কার্যকর হবে না, বরং যে নাবালেগের মধ্যে যেনা করার দৈহিক সামর্থ রয়েছে শুধু এমন নাবালেগের বিরুদ্ধে কৃত কযফ-এর অভিযোগে হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে। আল-মুগনী গ্রন্থ প্রণেতার মতে, ছেলে হলে এমন নাবালেগের বয়স অন্তত দশ বছর হতে হবে আর মেয়ে হলে অন্তত তার বয়স নয় বছর হতে হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম ইসহাক রহ. এ মতের পক্ষে।[১]

বস্তুত অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তির বয়স যদি নির্দিষ্ট বয়সে না পৌঁছে তাহলে অভিযোগকারীর উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। তার উপর তাযিরী দণ্ড কার্যকর হবে। কারণ এমন বয়সে অভিযুক্তের দ্বারা এমন কর্ম সম্পাদিত হওয়া সম্ভবই নয়, তাই সে বালেগ লোকের সমতুল্য হবে না।

অজ্ঞাতের প্রতি অভিযোগ

কযফ-এর হদ্দদণ্ড কার্যকরী হওয়ার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি জ্ঞাত না থাকে, তবে অভিযোগ আরোপকারীর উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। কারণ সে এমন অপরাধ

---

[১] আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২০২/২০৩; হদ্দদণ্ড প্রয়োগের জন্য মুসলমান হওয়া, স্বাধীন হওয়া এবং এমন বয়স হওয়া জরুরী। এর মধ্যে কোন শর্ত যদি গ্রহণযোগ্য না পাওয়া যায় তাহলে হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। অপরাধীকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে, যাতে ভবিষ্যতে অপরাধী নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে সম্ভ্রমহানিকর অভিযোগ উত্থাপন করে কলংক আরোপ করা থেকে বিরত থাকে।

আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২০/২১ এ বর্ণিত হয়েছে- নাবালেগ ছেলে অথবা মেয়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যেনার অভিযোগে হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না, যতদিন ছেলের স্বপ্নদোষ না হবে এবং মেয়ের ঋতুস্রাব না হবে। অথবা তাদের লজ্জাস্থানে পশম না গজাবে অথবা তারা এমন বয়সে পৌঁছে যাবে, সাধারণত মানুষের প্রবল ধারণা জন্মে যে, এই বয়সী ছেলে-মেয়ের স্বপ্নদোষ কিংবা ঋতুস্রাব না হয়ে থাকতে পারে না।

ইবনে কাসিম বলেন, নাবালেগ ছেলে যদি সঙ্গম করার মতো দৈহিক সামর্থের অধিকারীও হয় কিন্তু তখন পর্যন্ত তার কোন স্বপ্নদোষ হয়নি, এমতাবস্থায় তার বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগে অভিযোগকারীর উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না।

www.pathagar.com

করেছে যা গোনাহ এবং এই ধরনের গোনাহের জন্যে শরীয়তের কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নেই।[১] যেমন : কোন ব্যক্তি যদি কারো দাদা-নানা কিংবা ভাইয়ের উপর যেনার অভিযোগ করে এবং তার দাদা, নানা কিংবা ভাই কাউকে নির্দিষ্ট না করে[২] এমতাবস্থায়ও অভিযোগ আরোপকারীর উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। কারণ অভিযোগ অনির্দিষ্ট।

যেসব শর্ত কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট

যেনার অভিযোগে কযফ-এর হদ্দদণ্ড কার্যকরী হওয়ার জন্য স্পষ্ট যেনা বা ব্যভিচার বা দ্ব্যর্থহীন শব্দের দ্বারা অভিযোগ আরোপ করতে হবে এবং অভিযুক্তের দ্বারা এমন কর্ম সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। যদি ব্যভিচারের অভিযোগ স্পষ্ট না হয় এবং অভিযুক্তের দ্বারা এমন কর্ম সম্পাদনের সম্ভাবনা না থাকে তবে অভিযোগ আরোপকারীকে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।[৩]

কাযেফ যদি স্পষ্ট ভাষায় ব্যভিচারের অভিযোগ না করে তবে তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। যেমন: কেউ কাউকে বললো– 'তুমি আমার চেয়ে বেশি ব্যভিচারী' অথবা বললো– 'তুমি সব ব্যভিচারীর চেয়ে বড় ব্যভিচারী' কিংবা

---

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৩; অপর শর্ত হলো- অভিযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞাত হতে হবে। অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি যদি অজ্ঞাত হয় তবে অভিযোগ আরোপকারীর উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না।

২ প্রাগুক্ত; কেউ যদি বলে 'তোমার দাদা-নানা যেনাকারী' তবে তার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। কারণ দাদা-নানা শব্দটি উর্ধ্বতন পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হয়, নিম্নতর পুরুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি মূলত অজ্ঞাত মনে করতে হবে। অনুরূপ কেউ যদি বলে– তোমার ভাই ব্যভিচারী। অথচ তার একাধিক ভাই রয়েছে তাহলে অভিযোগ অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে অজ্ঞাত মনে করা হবে। তার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না।

৩ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪২; এ বর্ণিত হয়েছে– যেসব শর্ত মূল অপরাধকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট এগুলো দুই প্রকার : (এক) কযফ-এর অভিযোগে দ্ব্যর্থহীন শব্দে ব্যভিচারের কথা বলতে হবে অথবা এমন অভিযোগ যাতে মূলত যেনারই অভিযোগ থাকে। যেমন পিতৃত্বের অস্বীকার। কারণ ইঙ্গিতসূচক শব্দে চলমানতার অবকাশ থাকে; কোন ধরনের সংশয় ও অস্পষ্টতা থাকলে সেক্ষেত্রে যেনার মতো অপরাধ প্রমাণিত হয় না। সেই সাথে হদ্দদণ্ডও বাতিল হয়ে যায়। এখানে যেহেতু দ্ব্যর্থহীনবোধক শব্দ ও চলমানতার অবকাশ রয়েছে ফলে অবধারিত ভাবেই হদ্দদণ্ড বাতিল হবে যাবে; একই গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে- যে অপরাধের অভিযোগ করা হবে, সেই অপরাধ কর্মের সম্ভাবনা অভিযুক্তের মধ্যে থাকতে হবে।

www.pathagar.com

বললো– 'তুমি অমুকের চেয়ে বড় ব্যভিচারী' এসব কথার দ্বারা এমন অর্থও করা যায় যে, ব্যভিচার কর্ম তোমার দ্বারা বেশি সম্পাদিত হয়ে থাকে কিংবা এমন অর্থও বোঝানো হতে পারে যে– 'তুমি এ কর্মে অন্যদের চেয়ে বেশি পারদর্শী বা সক্ষমতার অধিকারী', যেহেতু এক্ষেত্রে এসব শব্দের দ্বারা একাধিক মর্ম উপলব্ধি করার অবকাশ আছে তাই দ্ব্যর্থহীন অর্থে তা দিয়ে যেনার অর্থ করা সম্ভব নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে– 'তুমি সবচেয়ে বেশি যেনাকারী' অথবা 'তুমি আমার থেকে বেশি যেনাকারী' কিংবা 'তুমি অমুকের চেয়ে বেশি যেনাকারী' বাক্যগুলোর মধ্যে তারতম্য রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে- প্রথম বাক্যের দ্বারা অপবাদ আরোপকারীর উপর কযফ এর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে এবং পরবর্তী দু'টি বাক্যের দ্বারা হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। অপবাদ আরোপকারীর বক্তব্য- 'তুমি সবচেয়ে বেশি যেনাকারী' বাক্যটি সাধারণ অর্থে নিশ্চিত বিশ্বাস করা যায়। এর অর্থ করা যেতে পারে 'তুমি যেনা করার ক্ষেত্রে সবাইকে অতিক্রম করে ফেলেছো' কারণ সকল যেনাকারীই বস্তুত এমন কর্ম সম্পাদনে অভিযুক্ত। তাই প্রথম বাক্যটিকে সাধারণ অর্থেই উপলব্ধি করতে হবে। আর অপর দু'টি বাক্য যাতে বলা হয়েছে– 'তুমি আমার চেয়ে কিংবা অমুকের চেয়ে বেশি যেনাকারী' বাক্য দু'টি নিশ্চিতভাবে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা যায় না। হতে পারে একই বাক্যের বক্তা কিংবা অমুক ব্যক্তি উভয়েই বাস্তবে যেনাকর্ম থেকে পবিত্র। প্রকৃত পক্ষে সে যদি যেনাকারী না হয়ে থাকে তবে তার চেয়ে কিংবা অমুকের চেয়ে অন্য ব্যক্তি কি করে বেশি যেনাকারী সাব্যস্ত হবে? তখন বক্তার কথার অর্থ হবে- 'তুমি আমার চেয়ে অথবা অমুক ব্যক্তির চেয়ে এ কর্মে বেশি পারদর্শী' কিংবা বেশি সামর্থবান। বস্তুত এ ক্ষেত্রে যেনার অভিযোগ সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে কযফ হবে না।

হাম্বলী মতাবলম্বীগণ উপরে উল্লেখিত সকল অবস্থাতেই কযফ-এর দণ্ড কার্যকর হওয়ার পক্ষে। কেননা, বাক্যগুলোর প্রকৃত অর্থ যেনা, তাই যেনার অর্থই গ্রহণ করা হবে। যেমন কেউ যদি কাউকে বলে 'তুমি যেনাকারী'।'[১]

---

[১] আল কাসায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৩; যেমন কেউ কাউকে বললো– 'তুমি সকলের চেয়ে বেশি ব্যভিচারী, অথাব বললো– 'তুমি সকল ব্যভিচারীর চেয়ে বেশি ব্যভিচারী' অথবা বললো- 'তুমি অমুকের চেয়ে বেশি ব্যভিচারী' এমতাবস্থায় তার উপর কযফ-এর হদ্দ কার্যকর হবে না। এটি হানাফীদের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী রহ.ও এ

www.pathagar.com

কেউ যদি কাউকে বলে (انت تذنى) "তুমি ব্যভিচার করো বা ব্যভিচার করবে।" এমতাবস্থায় অপবাদ আরোপকারীকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ এ বাক্য যেমন বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হয় তদ্রূপ ভবিষ্যত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ফলে এর দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর যেনার অপবাদ স্পষ্ট হয় না। তাই উল্টো সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে বলে এটিকে অপবাদ সাব্যস্ত করা হবে না।[১]

কেউ যদি কোন নারীকে বলে– 'আমি তোমার চেয়ে ভালো কোন ব্যভিচারিনী দেখিনি' অথবা কোন পুরুষকে বলে– 'আমি তোমার চেয়ে ভালো কোন ব্যভিচারী দেখিনি'[২] এক্ষেত্রেও অপবাদ আরোপকারীকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। এসব বাক্যে বক্তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে 'ভালো ব্যভিচারিণী' কিংবা 'ভালো ব্যভিচারী' বলেনি বরং সে 'ব্যভিচারিণী' কিংবা 'ব্যভিচারী'দের চেয়ে ভালো বলেছে বুঝতে হবে। কারণ এ বাক্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা যেনাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে এমনটি সাব্যস্ত করে না। তাই কযফ এর দণ্ড আবশ্যিক হবে না। কেউ যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগের প্রত্যয়ন করে[৩]

মতের পক্ষে। আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১৬ তে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি কাউকে বলে- 'তুমি অমুকের চেয়ে বেশি যেনাকারী' এ কথার পরিণতি সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, এ বক্তব্যে বক্তা ইঙ্গিত ব্যক্তি ছাড়া 'অমুক' কেও ব্যভিচারী সাব্যস্ত করেছে এবং একজন থেকে অপরজনকে বেশি যেনাকারী আখ্যা দিয়েছে, বস্তুত যেনার অভিযোগ উভয়ের ক্ষেত্রেই উত্থাপন করেছে। আরবী বাক্য রীতিতে বেশি' শব্দটি ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ শব্দের দাবী হলো- মূলকর্মে একাধিক অংশগ্রহণকারী থাকবে এবং একজনের চেয়ে অন্যজন অগ্রগামী হবে। হাম্বলীদের মতে, অভিযোগকারী শুধু ইঙ্গিত ব্যক্তির কাযেফ হবে। কারণ বাবে افعل -এর ছিগা কখনো শুধু একজনের জন্যেও ব্যবহৃত হয়।

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪২; কেউ যদি বলে (انت تذنى) তুমি যেনা করো কিংবা যেনা করবে, তাহলে বক্তার উপর কযফ এর দণ্ড কার্যকর হবে না।

২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩/৪৪; কেউ যদি কোন নারীকে বলে- 'আমি তোমার চেয়ে ভালো কোন ব্যভিচারিনী দেখিনি' কিংবা কোন পুরুষকে বলে- 'আমি তোমার চেয়ে ভালো কোন ব্যভিচারী দেখিনি' তাহলে তার এই কথা কযফ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৩ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৪; এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বললো- 'হে ব্যভিচারী! এমতাবস্থায় তৃতীয় কোন ব্যক্তি বললো, 'তুমি সত্যি বলেছো' এক্ষেত্রে অপবাদ আরোপকারীকে কযফ-এর দণ্ড দেয়া হবে কিন্তু প্রত্যয়নকারী কযফ-এর দণ্ডে দণ্ডিত হবে না। কারণ, হতে পারে সে বক্তার অন্য কোন বিষয়ে প্রত্যয়ন করার উদ্দেশ্যে একথা বলেছে; আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১৫/২১৬ তে বর্ণিত হয়েছে-

www.pathagar.com

অথবা একজন যদি অপরজনকে বলে- 'আমি জানতে পেরেছি তুমি ব্যভিচারী' অথবা বলে- 'আমার সামনে অমুক সাক্ষ্য দিয়ে গেছে তুমি ব্যভিচারী'[১] এক্ষেত্রে তাদের উপর কযফ-এর দণ্ড কার্যকর হবে না।

অনুরূপ বিধান সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ব্যভিচারের অপবাদ অপর ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়।[২] অথবা কেউ কাউকে নির্দেশ দিলো, 'অমুককে গালি দাও'[৩] কিংবা কাউকে বললো- 'ইশারা ইঙ্গিতে অমুককে গালিগালাজ করো'। হানাফীদের মতে এতে হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না, অপরাধী তাযিরী শাস্তিরযোগ্য বিবেচিত হবে।[৪]

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.ও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বিদ্রূপ, ঠাট্টা, ভর্ৎসনামূলকভাবে যেনার প্রতি ইঙ্গিত করলেও ইঙ্গিতকারীর উপর হদ্দদণ্ড

প্রত্যয়নকারীকেও অপবাদ আরোপকারী সাব্যস্ত করা হবে। কারণ কাযিফ যে কথা বলেছে সে ক্ষেত্রেই তার প্রত্যয়ন গৃহীত হবে।

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৪; কেউ যদি কাউকে বলে- 'আমাকে খবর দেয়া হয়েছে তুমি একজন ব্যভিচারী' অথবা কেউ কাউকে বললো- 'আমার সামনে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে তুমি একজন ব্যভিচারী' এমতাবস্থায় বক্তাকে অপবাদ আরোপকারী সাব্যস্ত করা হবে না। হাম্বলী ও শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ এমত ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে বক্তা যা বলেছে, তা একান্তই একটি সংবাদ মাত্র। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে এমন সংবাদ রয়েছে। এটি তার পক্ষ থেকে এক ধরনের সাক্ষ্য দেয়ার মতো, যে অমুক আমার কাছে অমুক সম্পর্কে একথা বলেছে। আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১৬ তে বলা হয়েছে- এ সংবাদের বিষয়টি এমনও হতে পারে যে, অপর কোন ব্যক্তি যদি এটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে সংবাদদাতা অপবাদ আরোপকারী বিবেচিত হবে। কারণ সে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করেছে। ফকীহ আতা, মুজাহিদ, যুহরী প্রমুখ এ মত ব্যক্ত করেছেন। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে- আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৪।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৪; কেউ যদি শুধু সংবাদ সরবরাহের জন্যে কাউকে বলে- 'অমুক ব্যক্তি আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছে এবং বলেছে, আমি যাতে তোমাকে বলি, "হে ব্যভিচারিণীর ছেলে!" তবে বার্তাবাহকের উপর কযফ দণ্ড সাব্যস্ত হবে না। আল-ফাতাওয়া আল-আসদিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৮।

৩ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৪; কেউ যদি কাউকে বলে- অমুকের কাছে যাও এবং তকে বলো- "হে ব্যভিচারী! অথবা "হে ব্যভিচারিনীর ছেলে! তবে প্রেরণকারী কাযেফ হবে না। কারণ সে কযফ-এর নির্দেশদাতা মাত্র।

৪ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৩; দু'জন একে অন্যকে গালি দিচ্ছে, একে অন্যকে বলছে- 'আমি ব্যভিচারী নই, আমর মাও ব্যভিচারিণী নয়" এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে কাযেফ গণ্য করা হবে না।

www.pathagar.com

প্রয়োগকে সমর্থন করেন না। তবে তাঁর মতে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকারোক্তি দেয় যে, সে যেনার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল তাহলে কাযেফ রূপে গণ্য হবে।[১]

ইমাম মালিক রহ. বলেন, ঠাট্টাচ্ছলে, বিদ্রূপ করে কিংবা ভর্ৎসনামূলকভাবেও যদি কেউ কারো উপর ব্যভিচারের অপবাদ-আরোপ করে তবে এই অপরাধে সে কযফ-এর দণ্ডে দণ্ডিত হবে। তিনি বলেন, (تعريض) ঠাট্টা বিদ্রূপের বিধানও স্পষ্ট বাক্যের মতো। 'আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা' গ্রন্থে-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে- কেউ যদি ক্ষুব্ধ কিংবা উত্তেজিত অবস্থায় বলে- 'আমি তো যেনা করিনি' তখন এর অর্থ দাঁড়াবে, 'তুমি যেনা করেছো'।[২]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে, তার কাছে ঠাট্টা বিদ্রূপমূলক বাক্য দ্বারা কযফ সাব্যস্ত হয় না। অন্য বর্ণনা মতে ঠাট্টা বিদ্রূপাত্মক বাক্যেও কযফ সাব্যস্ত হয়। প্রথম বর্ণনার দলীল হিসেবে বলা হয়েছে- মহান আল্লাহ 'বিবাহের প্রস্তাব' সম্পর্কিত আয়াতে (تصريح و تعريض) স্পষ্ট ও বিদ্রূপাত্মক শব্দে পার্থক্য করেছেন। যেমন কোন নারী যদি ইদ্দত পালনরত অবস্থায় থাকে তবে তাকে স্পষ্টভাবে বিবাহের প্রস্তাব না করে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিতে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই কযফ-এর ক্ষেত্রেও এই নীতি কার্যকর হবে। এক্ষেত্রে ইশারা ইঙ্গিত কিংবা স্পষ্ট ও অস্পষ্ট বাক্যের মধ্যে পার্থক্য হওয়া উচিত। কেননা যেসব বাক্য বা শব্দ দ্ব্যর্থবোধক, এসব শব্দের দ্বারা কযফ সাব্যস্ত হয় না। যেমন– কেউ কাউকে বললো– 'তুমি একজন ফাসেক'। দ্বিতীয় বর্ণনার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে– খলীফা উমর রা. বিদ্রূপাত্মকভাবে কারো প্রতি যেনার অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কযফ এর দণ্ড প্রয়োগ করেছেন। উমর রা. এর শাসনামলে এক ব্যক্তি আরেকজনের উদ্দেশ্যে বলেছিলো, 'না আমি ব্যভিচারী, না আমার মা ব্যভিচারিণী ছিল।' বিষয়টি উমরের কাছে উত্থাপন করা হলে- তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। সাহাবায়ে কিরাম পরামর্শ দিলেন- বক্তা এক্ষেত্রে তার মায়ের প্রশংসা করেছে। কিন্তু উমর রা. বললেন, 'সে

---

১ আল-বাদায়ে, আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১৮।

২ আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৪; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১৮।

www.pathagar.com

একথা বলে বরং বিদ্রূপাত্মকভাবে প্রতিপক্ষের উপর যেনার অপবাদ আরোপ করেছে।' বস্তুত সেই বক্তার উপর তিনি কযফ-এর হদ্দদণ্ড কার্যকর করেছিলেন। খলীফা উসমান রা. থেকেও অনুরূপ সিদ্ধান্তের কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বিদ্রূপাত্মকভাবে কারো প্রতি যেনার অপবাদ আরোপকারীকে কযফ দণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

تعريض-এর সাথে যদি এমন কোন প্রসঙ্গ বা উপাদান থাকে, যে উপাদান تعريض -এর দ্ব্যর্থবোধক অর্থকে একটি অর্থে নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে সেটিকে (تصريح) স্পষ্ট মনে করতে হবে। এ কারণেই তো ইশারা ইঙ্গিতে তালাক দিলেও তালাক কার্যকর হয়।

উপরের আলোচনার সারকথা হলো- উল্লেখিত বাক্য যদি ঝগড়া, বিবাদ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে বলা না হয়ে থাকে এবং এমন কোন প্রসঙ্গ বা উপাদান না থাকে যে উপাদান এটিকে কযফ অর্থে স্পষ্ট করে দেয় তবে এ ধরনের বাক্যে কযফ সাব্যস্ত হবে না।[১]

উপরের দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা বোঝা গেল, যেসব ফকীহ ইশারা ইঙ্গিত বিদ্রূপাত্মক বা ঠাট্টাচ্ছলে কারো প্রতি যেনার অপবাদ আরোপকারীকে কযফ-এর হদ্দযোগ্য অপরাধী বিবেচনা করেন না, তারা এদেরকে অবশ্যই তাযিরী দণ্ডযোগ্য মনে করেন। কারণ নিশ্চিত এসব লোক দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছে। অবশ্য একটি পক্ষ উপরে বর্ণিত অপরাধে অভিযুক্তদেরকে কযফ-এর অপরাধীরূপে গণ্য করে কযফ দণ্ডে দণ্ডযোগ্য মনে করেন। আমার মতে, উপরে যেসব দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে ইঙ্গিত-ইশারা ও বিদ্রূপ-ঠাট্টাচ্ছলে কারো প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ হদ্দযোগ্য অপরাধ বিবেচিত হবে না। কারণ ইঙ্গিত বা ইশারাসূচক শব্দ দুই ধরনের অর্থ ধারণ করে, ফলে এমন সংশয়ের জন্ম নেয় যে সংশয় অবধারিতভাবে হদ্দদণ্ডকে নাকচ করে দেয়।

কেউ যদি কারো প্রতি এমন শব্দ ও বাক্য দ্বারা যেনার অপবাদ আরোপ করে যেসব শব্দ বা বাক্য যেনার অর্থ পরিষ্কার করে না[২] অথবা কারো প্রতি হারাম

---

১ আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২০৩/২০৪।

২ আল-মাবসূত, আস-সারাখসী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১১৯/১২০; কেউ যদি কাউকে বলে- 'হে ফাসিক! অথবা হে ফাসিকের সন্তান! কিংবা বলে- 'হে বেশ্যার ছেলে! তবে বক্তার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। কারণ সে যেসব শব্দ ইঙ্গিত ব্যক্তিকে বলেছে, এগুলো

www.pathagar.com

কর্ম সমকামিতার অভিযোগ উত্থাপন করে[১] তবে এই অভিযোগও যেনার অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কেউ যদি কারো উপর এমন অভিযোগ করে যে, সে মৃত ও জীব-জন্তুর সাথে যৌন কর্ম করে।[২] অথবা বলে, হে ঘাটু[৩] (যে পুরুষ যৌনকর্মে নারীর ভূমিকা পালন করে) তবে তার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। কেননা, ইঙ্গিত ব্যক্তির প্রতি যে অপবাদ দিয়েছে বস্তুত পক্ষে তা যেনা নয়। তাই অপবাদ আরোপকারী তাযিরী দণ্ডযোগ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, কেউ যদি কাউকে বলে, 'তুমি লূত জাতির মতো অপকর্ম করো', বক্তা তাযিরী

সরাসরি যেনাকর্মকে আবশ্যিক করে না। কারণ ফিসক কখনো যেনা দ্বারা হয়, যেনা ছাড়াও অন্যান্য অপরাধীকে ফাসিক বলা যায়। অনুরূপ বেশ্যা ও নষ্টা মহিলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই এমন বক্তব্য সুস্পষ্ট যেনাকে নিশ্চিত করে না। তারপরও যদি এক্ষেত্রে হদ্দ দণ্ড কার্যকর করতে হয় তবে তা করতে হবে কিয়াসকে কেন্দ্র করে অথচ কিয়াস দ্বারা হদ্দদণ্ড নির্ধারণের কোন অবকাশ নেই। দারুল হুককাম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৬/৯৭; অনুরূপ কেউ যদি কাউকে বলে- 'হে বেশ্যাগীর! তাহলেও হদ্দযোগ্য বিবেচিত হবে না। কারণ এই শব্দ বেশ্যা বোঝানোর জন্যে প্রণয়ন করা হয়নি। পরবর্তীতে এটি বেশ্যা অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে তাতে তাযিরী শাস্তি হবে। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২০৮/২০৯; কেউ যদি কোন নারীকে বলে 'হে বেশ্যা! তবে তাকেও তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে, যদি প্রকৃত পক্ষে সেই নারী বেশ্যা না হয়ে থাকে। ফাতওয়া কাযীখান, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯৩, কেউ কোন নেককার লোককে বললো- 'হে বেশ্যার ছেলে! অথচ লোকটি এমনটি নয়। এমতাবস্থায় নাওফীর মতে তাকে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৪; কেউ যদি কোন নারীকে বলে, 'অমুক তোমার সাথে অবৈধ সঙ্গম করেছে' অথবা 'অমুক তোমার সাথে খারাপ কাজ করেছে', অথবা কোন পুরুষকে বললো, 'তুমি অমুকের সাথে অবৈধ সঙ্গম করেছো' তাহলে বক্তার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। কারণ সে সরাসরি যেনার কথা বলেনি, যদিও হারাম সঙ্গমের কথা আছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন- আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৪; এতে বলা হয়েছে- কেউ যদি কারো প্রতি অবৈধ কিংবা হারাম সঙ্গমের অপবাদ আরোপ করে তবে তার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে।

২ শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৩; কারো উপর কেউ যদি মৃত ব্যক্তির সাথে কিংবা জন্তুর সাথে সঙ্গমের অপবাদ আরোপ করে, তবে অপবাদদাতাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।' আস-সারখসী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১০২; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১৮; জীবজন্তুর সাথে রতিক্রিয়া সম্পাদনের অভিযোগকারীকে যেনার হদ্দদণ্ড দেয়া হবে। আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৯/২১০।

৩ শরহে আল-কানয, আল-আইনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৩৪/২৩৫, কেউ কোন মুসলমানকে বললো, 'হে ঘাটু বা পুরুষ বেশ্যা! তবে অপবাদদাতার উপর তাযিরী দণ্ড কার্যকর হবে।

www.pathagar.com

দণ্ডযোগ্য বিবেচিত হবে। কারণ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দৃষ্টিতে সমকামিতা যেনা নয় এবং এই অপরাধে যেনার হদ্দ কার্যকর হয় না। অতএব কেউ যদি কারো প্রতি এই কাজের অভিযোগ করে তবে অভিযোগকারী কযফ-এর দণ্ডযোগ্য হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও মালিক রহ. বলেন, সমকামের অপরাধে যেনার দণ্ড কার্যকর হবে। কেউ যদি কাউকে সমকামের অপবাদ দেয় তবে অপবাদ আরোপকারী কযফ-এর দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[১]

উপরে উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা এই সাধারণ মূলনীতি গ্রহণ করা যায় যে, কেউ যদি কারো প্রতি এমন অপরাধের অপবাদ আরোপ করে, যে অপরাধে হদ্দদণ্ড প্রয়োগে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, তন্মধ্যে উত্থাপিত অপরাধটিকে যারা হদ্দ দণ্ডযোগ্য মনে করেন, তাদের দৃষ্টিতে অপবাদদাতা হদ্দযোগ্য অপরাধী বিবেচিত হবে। আর যাদের দৃষ্টিতে অপরাধী হদ্দ দণ্ডযোগ্য নয়, তাদের মতে অপবাদদাতা হদ্দযোগ্য অপরাধী গণ্য হবে না, তাযিরী দণ্ড কার্যকর হবে।

---

১ আস-সারাখসী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২০২, অপরাধী উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে লূত জাতির মতো অপকর্মে জড়িত থাকার অপবাদ দিয়েছে, অপরাধী যদি স্পষ্ট ভাষায় অপবাদ দিয়ে থাকে তবে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, সে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত হবে, হদ্দ দণ্ডযোগ্য হবে না। কারণ আবু হানিফা রহ.-এর দৃষ্টিতে অপরাধী এমন কর্মের অপবাদ দিয়েছে যে অপরাধে হদ্দদণ্ড কার্যকর হয় না। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে অপরাধী হদ্দদণ্ডে দণ্ডিত হবে। কারণ তাদের মতে- সমকাম হদ্দযোগ্য অপরাধ। এর অপবাদদাতাও হদ্দযোগ্য অপরাধী বিবেচিত হবে। ফাতাওয়া কাযীখান, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯৩; কেউ যদি কোন নেককার ব্যক্তিকে বলে- 'তুমি এমন লোক যে কিনা লূত জাতির মতো অপকর্ম করে' অথবা বললো, 'হে সমকামী! অথবা বলল- 'হে বালকদের নিয়ে খেলাকারী' অথচ অভিযুক্ত ব্যক্তি এসব অপকর্ম থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এমতাবস্থায় অপবাদদাতাকে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৪১, এতে ইমাম মালিক রহ. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি কাউকে বলে- 'হে সমকামী! অথচ লোকটি সমকামী নয়, তবে অপবাদদাতাকে কযফ এর দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। কারণ ইমাম মালিক রহ.-এর মতে সমকাম যেনার অন্তর্ভুক্ত, সমকামিতার অপরাধে যেনার হদ্দ কার্যকর হবে। তদ্রূপ কেউ যদি এমন অপবাদ দেয় তবে সেও কযফ-এর দণ্ডে দণ্ডযোগ্য বিবেচিত হবে।' আল-আহকামুস সুলতানিয়া' আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১৮; কারো প্রতি সমকামিতার অপবাদ দেয়া হদ্দযোগ্য অপরাধ। আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, ০৯/২১৩; হাম্বলীদের মতে সমকামিতার অপবাদ হদ্দযোগ্য অপরাধ।

www.pathagar.com

অপরাধ কর্ম সম্পাদনে যদি অভিযুক্ত অক্ষম হয়

যদি এমন হয় যে, যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, তার মধ্যে এই অপরাধ করার ক্ষমতা নেই, এমতাবস্থায় অপবাদদাতার উপর তাযিরী দণ্ড সাব্যস্ত হবে। কারণ সে এমন অপরাধ করেছে, যে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন শাস্তি নেই। যেমন কেউ কাউকে বললো– 'তোমার উরু যেনা করেছে' অথবা বললো, 'তোমার পেট যেনা করেছে'[১] কিংবা বললো– 'তুমি আঙ্গুলের সাথে যেনা করেছো'[২] হয়তো বললো– 'তুমি ঘোড়া/গাধার সাথে যেনা করেছো'[৩] অথবা কোন মহিলাকে বললো– 'তোমার সাথে জোরপূবর্ক যেনা করা হয়েছে'। অথবা 'তোমার অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় যেনা করা হয়েছে' কিংবা 'পাগল বা ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার সাথে ব্যভিচার করা হয়েছে'।[৪] বস্তুত এসব অবস্থায় অভিযুক্তের যেনাকর্ম সম্পাদন বিষয়টি অসম্ভব বলেই মনে করা হয়। জোর-জবরদস্তিমূলক, অপ্রকৃতস্থ অবস্থায়, পাগল কিংবা ঘুমন্ত অবস্থা কেউ কোন

---

১ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫; কেউ কাউকে বললো, 'তোমার উরু যেনা করেছে, অথবা 'তোমার পিঠ যেনা করেছে, এমতাবস্থায় অপবাদদাতার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৪; এতে বলা হয়েছে- কেউ যদি বলে– 'তোমার মুখ যেনা করেছে' তাহলে অপবাদদাতার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫; কেউ যদি কাউকে বলে- 'তোমার আঙ্গুল যেনা করেছে' এমতাবস্থায়ও অপবাদদাতার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবেনা।

৩ প্রাগুক্ত; কেউ কাউকে বললো– 'তুমি ঘোড়া, গাধা, উট কিংবা গরুর সাথে যেনা করেছো' তবে অপবাদদাতার উপর হদ্দ কার্যকর হবে না। আস-সারাখসী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২৫; কেউ কোন নারীকে বললো– 'তুমি উট, গাধা কিংবা গরুর সাথে যেনা করেছো,' এমতাবস্থায় অপবাদদাতা হদ্দযোগ্য বিবেচিত হবে না। কারণ অপবাদদাতা অভিযুক্তের উপর এমন অপবাদ দিয়েছে যে, সেই নারী জানোয়ারকে স্বেচ্চায় তার সাথে যেনা করার সুযোগ করে দিয়েছে। অথচ এমনটি সম্ভব নয়; আর এ কাজ উল্লেখিত নারীর জন্য হদ্দযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় না। এর পূর্বে আমরা বলে এসেছি, যে অপরাধ হদ্দযোগ্য বিবেচিত হয় না, সেই অপরাধের অপবাদদাতার বিরুদ্ধে কযফ এর দণ্ড কার্যকর হয় না।

৪ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫; কেউ যদি কোন নারীকে বলে, 'তুমি জোর-জবরদস্তিমূলক যেনা করেছো', কিংবা 'অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় কিংবা পাগল বা ঘুমন্ত অবস্থায় যেনা করেছো' তবে অপবাদদাতা কাযেফ বিবেচিত হবে না। কারণ সে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এমন অপবাদ দিয়েছে, যে অবস্থায় তার দ্বারা এমন কর্ম সম্পাদিত হওয়া মোটেও সম্ভব নয়, ফলে এটি মিথ্যায় পর্যবসিত হবে। তাতে কযফ দণ্ড প্রয়োগ হবে না।

www.pathagar.com

নারীর সাথে যেনা করলে তাতে ব্যভিচারের শিকার নারীর মধ্যে যেনার কোন ইচ্ছায়ই থাকে না। উল্লেখিত অবস্থাগুলোতে অভিযুক্ত ব্যভিচারীনির মধ্যে ব্যভিচারের কোন ইচ্ছা না থাকার কারণে তার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হয় না। ফলে এমতাবস্থাগুলোতে কেউ যদি তার উপর যেনার অপবাদ দেয় সে হদ্দদণ্ডযোগ্য হবে না।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, কেউ যদি কোন নারীকে বলে, 'হে ব্যভিচারিনী! তাহলে কযফ হবে না বরং তার উপর তাযিরী দণ্ড সাব্যস্ত হবে। ইমাম মুহাম্মদ বলেন, একথা হদ্দযোগ্য অপরাধ বিবেচিত হবে।[১] ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর নিকট একথা স্পষ্ট কযফ বিবেচিত হবে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, পুরুষের ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ অত্যধিক বোঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর অর্থ হতে পারে, 'হে যেনা বিষয়ে পারদর্শী'। কেউ যেনা সম্পর্কে অত্যধিক অভিজ্ঞ হওয়ার অর্থ এই হয় না যে, সে বাস্তবেও অত্যধিক যেনাকারী। কোন কর্ম সম্পর্কে পারদর্শী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, হাতে কলমে তাকে এমন কর্ম সম্পাদন করতে হবে। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত বাক্য, এর সাথে যেনার সম্পৃক্ততা নেই। হতে পারে যে, তার স্ত্রী একজন যেনাকারিনী, অথবা তার নিকটজনদের মধ্যে কেউ অত্যধিক যেনায় অভ্যস্ত কিংবা তার জ্ঞাতসারে অনেক যেনা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, ফলে এ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। এমতাবস্থায় অপবাদ আরোপকারীকে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। যারা এ কথাকে কযফ হিসেবে সাব্যস্ত করেন, তাঁরা যুক্তি দিয়ে বলেন, যে শব্দ নারীর ক্ষেত্রে কযফ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা পুরুষের ক্ষেত্রেও কযফ বিবেচিত হবে। উক্ত বাক্যের দ্বারা বক্তা নারী-পুরুষ উভয়ের দিকেই ইঙ্গিত করেছে। এক্ষেত্রে বক্তা যেনা বোঝানোর জন্যেই এ বাক্য ব্যবহার করেছে। শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করুক বা না করুক উক্ত বাক্যটি কযফ বিবেচিত হবে। যারা বলতে চান, বক্তা এ শব্দ দ্বারা অভিযুক্তকে যেনার ব্যাপারে পারদর্শী বোঝাতে চেয়েছে, তা ঠিক নয়। কারণ শব্দটি একটি কর্মের নাম যেমন 'যেনা'। কোন কর্মবাচক শব্দে যদি স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়, তাহলে শব্দটি অত্যধিক অর্থ প্রকাশ করে। সাধারণ লোকজন তাদের

---

[১] আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫; কেউ কোন পুরষকে বললো, 'হে ব্যভিচারিনী! ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর নিকট তা কযফ বিবেচিত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে এটি কযফ হিসেবে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

কথাবার্তায় অনেক সময়ই নারীর ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গ বাচক সর্বনাম এবং পুরুষের ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক সর্বনাম ব্যবহার করে থাকে। তাতে মানুষের বক্তব্যের মর্মার্থে কোনরূপ হেরফের ঘটে না।[১] কেউ যদি কাউকে বলে– 'তুমি তোমার মায়ের সন্তান নও'[২] অথবা বলে, 'তুমি তোমার মা-বাবা কারো সন্তান নাও'[৩] অথবা বলে– 'তুমি আদম আ. এর সন্তান নও' কিংবা বলে– 'তুমি কোন পুরুষের সন্তান নও' কিংবা বলে 'তুমি কোন মানুষের সন্তান নও'[৪]। উল্লেখিত সকল অবস্থায়ই অপরাধীকে তাযিরী দণ্ড দেয়া হবে। কেননা, সে যেসব অভিযোগ করেছে, সবগুলো অবাস্তব।

এসব বক্তব্যকে মিথ্যা বলা যাবে কিন্তু কযফ বলার কোন অবকাশ নেই। তাই এসব বক্তব্যে কযফ এর হদ্দ কার্যকর হবে না। অনুরূপ অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির যদি প্রজননদণ্ড কর্তিত থাকে, এমতাবস্থায় তার বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগকারীকেও ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও আবু সাওর রহ. এর মতে হদ্দদণ্ড দেয়া যাবে না। কারণ মানুষ জানে, অভিযুক্ত লোকটির বংশদণ্ড কর্তিত। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেনার অপবাদ তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে না। কারণ এটি সর্বৈব একটি মিথ্যা রটনামাত্র।

হাম্বলী মতাবলম্বী ফকীহগণ বলেন, বংশদণ্ড কর্তিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ আরোপকারীকেও হদ্দদণ্ড দেয়া হবে। কারণ সে একজন সচ্চরিত্রের বিরুদ্ধে কলংকজনক অপবাদ রটিয়েছে। এটিও সঙ্গমে সক্ষম একজন পুরুষের বিরুদ্ধে আরোপিত অপবাদের মতো মনে করা হবে। কারণ সঙ্গমের

---

১ আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১৬/২১৭।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫; কেউ যদি কাউকে বলে 'তুমি তোমার মায়ের সন্তান নও' তাহলে তার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। কারণ এটি একটি নির্জলা মিথ্যা। কারণ মায়ের উদরজাত সন্তানকে কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১৫।

৩ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫; কেউ যদি কাউকে বলে- 'তুমি তোমার মা-বাবার সন্তান নও' তাহলে তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ একই সাথে মা ও বাবার সূত্র অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ বাবার ক্ষেত্রে সংশয় জন্ম নিলেও মায়ের উদরজাত হওয়ার বিষয়টি কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বস্তুত এটি সর্বৈব মিথ্যায় পর্যবসিত হবে।

৪ প্রাগুক্ত; কেউ যদি কাউকে বলে, 'তুমি আদম আ. এর বংশজাত নও' অথবা বলে– 'তুমি কোন পুরুষের সন্তান নও' কিংবা বলে, 'তুমি কোন মানুষের সন্তান নও' একথা বলার কারণে বক্তার উপর হদ্দদণ্ড কার্যকর হবে না। কারণ এটি নিছকই একটি মিথ্যা অবাস্তব কথা। তবে এজন্য তাকে তাযিরী দণ্ড দেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

সক্ষমতা অক্ষমতা গোপন বিষয়। সাধারণ লোকজন কারো এই গোপন বিষয় জানে না। একজন অসুস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেউ যদি ব্যভিচারের অপবাদ দেয় সেক্ষেত্রে অপবাদদাতাকে যেমন হদ্দদণ্ড দেয়া হয়– এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হবে।[১]

আমার মতে, হানাফী ও শাফেয়ী মতাবলম্বীদের অভিমত এক্ষেত্রে বেশি শক্তিশালী। কারণ বিচারক যখন অনুসন্ধান করবেন, তখন তার পক্ষে বংশদণ্ড কর্তিত হওয়ার বিষয়টি জানা সম্ভব। একটি অপরাধে হদ্দদণ্ডের মতো গুরু দণ্ড প্রয়োগের আগে বিচারককে অবশ্যই বাস্তবতা যাচাই করতে হবে। যেহেতু অনুসন্ধানে অজ্ঞাত বিষয়ও জানা সম্ভব তাই সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি অজ্ঞাত মনে করে এ ক্ষেত্রে হদ্দদণ্ড প্রয়োগ সঠিক হবে না।

শর্তযুক্ত ও বিলম্বিত কযফ

কযফ-এর দণ্ড কার্যকর হওয়ার জন্য অন্যতম একটি শর্ত হলো– সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় যেনার অপবাদ আরোপ করতে হবে, এর সাথে কোন শর্ত যুক্ত করা যাবে না এবং কোন সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। কোন সময়ের সীমাবদ্ধতা কিংবা শর্তযুক্ত থাকলে হদ্দদণ্ড অকার্যকর হয়ে যাবে কিন্তু তাযিরী শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে।[২]

যেমন, কেউ যদি কাউকে বলে– "তুমি যদি এই ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তুমি ব্যভিচারী' অথবা 'ব্যভিচারিণীর পুত্র'। অতঃপর সেই ব্যক্তি সেই ঘরে প্রবেশ করলো, তাতে অপবাদ আরোপিত হবে না।[৩] অনুরূপ কেউ কাউকে বললো, "তুমি আগামীকাল ব্যভিচারী হবে কিংবা ব্যভিচারিণীর সন্তান হবে" অথবা এই মাসের শেষের দিকে তুমি এমনটি হবে। বস্তুত আগামীকাল দিনের শেষেই 'আজ' এ পরিণত হয় এবং মাসও কাল পরিক্রমায় শেষ হয়ে

---

১ আল-মুগনী; ইবনে কুদামা, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২০৩।

২ আল-বাদায়ে, আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৬; কযফদণ্ডের অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যে সব শর্ত আবশ্যিক সেগুলো হলো– যেনাকর্ম কোন শর্তযুক্ত হবে না, তাতে কোন সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকবে না। যেনার অপবাদ যদি শর্তযুক্ত হয়, কিংবা সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ হয় তাহলে হদ্দযোগ্য হবে না। আল-মুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১৫।

৩ কেউ কাউকে বললো, 'তুমি যদি এই ঘরে প্রবেশ করো তবে ব্যভিচারী হবে' অথবা "ব্যভিচারিণীর সন্তান হবে" অতঃপর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি সেই ঘরে প্রবেশ করে এমতাবস্থায় বক্তা কযফ দণ্ডে দণ্ডিত হবে না। আল-কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৬।

www.pathagar.com

যায়। এ ধরনের বাক্যে কযফ হবে না। কারণ বক্তা যেনাকে ভবিষ্যত সময়ের সাথে শর্তযুক্ত করেছে। কারণ ভবিষ্যতে কারো ব্যভিচারী হওয়া নিশ্চিত নয়। আর বর্তমানকাল যেহেতু খুব সীমিত এমতাবস্থায় ব্যভিচারী হওয়া অসম্ভব। তাই এ ধরনের শর্তযুক্ত বাক্যে তাযিরী দণ্ড হতে পারে কোন অবস্থাতেই কযফ দণ্ড সাব্যস্ত হবে না।[১]

গালমন্দ তিরস্কার ভর্ৎসনা

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, ইসলামী আইনে কেউ কারো প্রতি ভিত্তিহীন ব্যভিচারের কলংক আরোপ করলে তাকে (قذف) কযফ বলে অভিহিত করা হয় এবং কযফ ইসলামী আইনে একটি হদ্দযোগ্য অপরাধ। তবে কযফ দণ্ডে দণ্ডিত করার জন্যে কিছু শর্ত রয়েছে। এসব শর্ত যথাযথভাবে অভিযুক্তের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেই কেবল অপবাদদাতার বিরুদ্ধে হদ্দদণ্ড দেয়া যাবে। অন্যথায় তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এমন অপরাধ ঘটে, যে অপরাধকে কোন অবস্থাতেই কযফ- এর আওতাভুক্ত বলার অবকাশ নেই। অনেক ক্ষেত্রে লোক অন্যকে এমনসব কথাবার্তা বলে যেগুলো কযফ তো নয়ই কযফের সাথে কোন প্রকার সামঞ্জস্যও রাখে না কিন্তু বক্তার এসব কথায় সম্বোধিত ব্যক্তি কষ্টপায় অপমান বা বিব্রতবোধ করে। "গালমন্দ, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা" শিরোনামে আমরা এসব বিষয় আলোচনা করবো।

কটূকাটব্য

কেউ যদি কাউকে বলে 'হে ইহুদী! অথবা 'হে খ্রীস্টান! কিংবা 'হে অগ্নিপূজারী! কিংবা 'হে ইহুদীর বাচ্চা![২] অথবা 'হে অবিশ্বাসী-নাস্তিক![১] কেউ

---

১ প্রাগুক্ত; অনুরূপ কেউ যদি কাউকে বলে– "তুমি আগামীকাল ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীর পুত্র হবে।" অথবা মাসের শেষে তুমি এমনটি হবে। বস্তুত আগামীকাল দিনের শেষে 'আজ' হয়ে যায় এবং মাসও কাল পরিক্রমায় শেষ হয়ে যায়, তাই বক্তা কযফ দণ্ডে দণ্ডিত হবে না। কারণ ব্যভিচারকর্মকে ভবিষ্যতকালের সাথে শর্তযুক্ত করে বর্তমান সময়ে যেনার অপরাধ নিশ্চিত করা অসম্ভব।

২. শরহে আল-কানয, আল-আইনী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৫; শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১১; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৫; আল-ফাতাওয়া আল-আসাদিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৯; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১৮।

www.pathagar.com

যদি কোন মুমিন মুসলমানকে বলে 'হে কাফের![২] অথবা 'হে কাফেরের বাচ্চা![৩] কিংবা 'হে খ্রীস্টানের বাচ্চা![৪] উল্লেখিত সকল অবস্থাতেই একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানকে অসম্মান করা হয়। এমন কথা যে কোন মুমিন মুসলমানের জন্যে পীড়াদায়ক। যেহেতু এসব ক্ষেত্রে শরীয়তে সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তির ঘোষণা নেই; তাই অপরাধী তাযিরী দণ্ডযোগ্য বিবেচিত হবে। অনুরূপ

---

১. শরহে আল-কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৮/২০৯; কেউ যদি কোন মুসলমানকে বলে, 'হে নাস্তিক! তাহলে তাকে তাযিরী দণ্ড দেয়া হবে। কারণ সে একজন মুমিন মুসলমানের ঈমান নিয়ে বিদ্রূপ করেছে। ফাতাওয়া কাযী খান-এ বলা হয়েছে, কেউ যদি কোন নেককার মুসলমানকে নাস্তিক বলে গালি দেয় তাহলে তাকে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯৩।

২. আল-হিদায়া, শরহে হিদায়া আল-মুবতাদী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৭; যেনা ছাড়া অন্য কোন ধরনের অপমানজনক অবাস্তব অভিযোগ যদি কোন মুসলমানের প্রতি কেউ করে, যেমন বললো 'হে কাফের! তবে এর দ্বারা সে তাকে অপমান করলো, তার ঈমানকে তুচ্ছজ্ঞান করলো। এক্ষেত্রে তাকে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। যেহেতু কিয়াস দ্বারা হদ্দ এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধির কোন অবকাশ নেই, তাই এ শাস্তির পরিমাণ সমকালীন মুসলিম শাসক বা বিজ্ঞ মুসলিম বিচারকের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করবে। শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৩; ফাতওয়া কাযীখান, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯৩; কেউ যদি কোন নেককার ব্যক্তিকে বলে 'হে নাস্তিক বা ফাসিক! অথচ লোকটি এমন অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তাহলে অপরাধীকে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৫; আল-ফাতাওয়া আল-আসাদিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৯; আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১০।

৩. শরহে আল-কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৮।

৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৫; কেউ কোন মুসলমানকে বললো 'হে খ্রিস্টানের বাচ্চা! তাহলে তাকে তাযিরী দণ্ড দেয়া হবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৩৬; আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম থেকে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি কাউকে বলে 'হে ইহুদীর বাচ্চা! অথবা হে মূর্তিপূজারীর বাচ্চা! কিংবা হে নাস্তিকের বাচ্চা! এমতাবাস্থায় যদি সেই ব্যক্তির নিকট পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ এমনটি না থাকে তবে সে কযফ! এর দণ্ডে দণ্ডিত হবে। অন্যথায় সে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত হবে। কেউ যদি বলে 'হে ইহুদী, হে নাস্তিক বা হে অগ্নিপূজারী কিংবা মূর্তিপূজারী' তবে ইমাম মালিকের মতাবলম্বীদের মতে তাযিরী দণ্ডযোগ্য বিবেচিত হবে। আমার মতে, প্রথমে উল্লেখিত অবস্থা ফকীহ আবুল কাসিম-এর অভিমত সঠিক নয়। কারণ অপরাধীএক্ষেত্রে তার মায়ের প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করেনি যে কযফদণ্ড যোগ্য হবে বরং সে গালমন্দ করেছে যদ্দরুন তাযিরী দণ্ডযোগ্য বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

কেউ যদি কোন ইহুদী, খ্রীষ্টান[১] কিংবা অগ্নিপূজককে[২] বলে 'হে কাফের' এতে যদি উদ্দিষ্ট ইহুদী, খ্রীস্টান কিংবা অগ্নিপূজক অপমানবোধ করে তাহলে বক্তা তাযিরী শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

অনুরূপ কেউ যদি কাউকে বলে 'হে ফাসিক! অথবা বলে 'হে খবিস![৩] অথবা বলে 'হে ফাজির![৪] কিংবা বলে 'হে বেশ্যার বাচ্চা![৫] কিংবা বলে 'হে বেশ্যা![৬] অথবা বলে 'হে ফাসিকের বাচ্চা![৭] বা 'ফাসিকা![৮] অথবা 'খবীসার বাচ্চা![৯]

---

১. আল-ইশবা ওয়ান নাযায়ের, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০০; কেউ যদি কোন যিম্মীকে বলে 'হে কাফের! বক্তার এই কথায় যদি যিম্মী অপমানবোধ করে তাহলে বক্তা অপরাধী বিবেচিত হবে। মাতবায়া ওয়াদি আন-নাইল, মিসর, সন ১৯২৮ ইং হাশিয়া আবুল খাল্লাস, এই কিতাবটি দারুল হুককাম-এর হাশিয়ায় ছাপা হয়েছে। খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৭; কেউ কোন ইহুদীকে বললো, 'হে কাফের' এতে যদি ইহুদী অপমানবোধ করে তবে বক্তা অপরাধী বিবেচিত হবে। আল-বাহার গ্রন্থের লেখক বলেন, পরিস্থিতির দাবি হলো বক্তাকে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা।

২. হাশিয়া আবুল খাল্লাস, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৭; কেউ কোন ইহুদী বা খ্রিস্টানকে বললো, হে কাফের, এতে যদি ইহুদী বা খ্রিস্টান অপমানবোধ করে তবে বক্তা অপরাধী বিবেচিত হবে এবং তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৩. আল-জামে আস-সগীর, পৃষ্ঠা-৬৯; কেউ যদি কোন মুসলমানকে বলে 'হে ফাসিক' বা 'হে খবিস' তাকে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। মুখতাসার আল-কদূরী, পৃষ্ঠা-১১১; আল-জাওহারাতুন নাইয়ারা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৩; আল-লুবাব আল-মায়দানী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৪; শরহে আল কানয, আইনী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৪; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-১০০; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৩; আল-আহকামুস-সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১৬; আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১০।

৪. আল-জাওহারাতুন্ নাইয়ারা, খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-২৫৩; শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪,পৃষ্ঠা-২১৩; আল-লুবাব আল-মায়দানী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৪; শরহে আল-কানয, আইনী, খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২৩৪; আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া, খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-১৫৫; আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১০; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২২/২৩।

৫. আল-জাওহারাতুন্ নাইয়ারা, প্রাগুক্ত।

৬. প্রাগুক্ত, আল জাওহারাতুন্ নাইয়ারা-প্রাগুক্ত।

৭. আল-জাওহারাতুন্ নাইয়ারা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫২; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০০।

৮. আল-জাওহারাতুন্ নাইয়ারা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫০; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২২/২৩।

৯. আল-জাওহারাতুন্ নাইয়ারা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৩।

www.pathagar.com

অথবা 'হে মুনাফিক!'[১] অথবা বলে 'হে লোচ্চা!'[২] উপরে উল্লেখিত অভিযোগ থেকে যদি উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পবিত্র হয় তাহলে ভিত্তিহীন অভিযোগ করে বক্তা একজন মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত বিবেচিত হবে। কারণ সে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। এই অপরাধে শরীয়তে শাস্তি নির্ধারিত নেই, তাই তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে।

বক্তার কথাগুলো যদি এমন গুণাবলী সম্পন্ন হয় যেগুলো উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে তার কোন শাস্তি হবে না। কারণ শাস্তি তখন দেয়া হয় যখন বক্তার কথা দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অপমান বোধ করে এবং তার মান ক্ষুণ্ন হয়। যদি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব থেকেই এসব মন্দ বিষয় বিদ্যমান থাকে, তবে বক্তার বলার দ্বারা তার কোন শাস্তি হবে না। কারণ সেই ব্যক্তি তো নিজের মান নিজেই ক্ষুণ্ন করে রেখেছে।[৩]

কেউ যদি কাউকে বলে 'হে সুদখোর! অথবা 'হে শারাবী! বা 'হে মদ্যপ! কিংবা 'হে খিয়ানতকারী![৪] 'হে বোবা![১] 'হে ডাকাত! বা চোর কিংবা 'হে ব্যভিচারীদের আশ্রয়দাতা।[২] বা 'হে জুয়ারী![৩]

---

১. তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আল-কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৮/২০৯।

২. দুরারুল হুককাম, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৬।

৩. আল-জাওহারাতুন্ নাইয়ারা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৩; হাশিয়া আশ-শিবলী আলাল কানয, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৮; যেমন, কেউ ফাসিককে বললো, 'হে ফাসিক' অথবা বললো 'হে লম্পট' বস্তুত এতে কোন শাস্তি হবে না। যৌক্তিকতার দাবিও তাই। কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, কারো কথার দ্বারা যদি কারো মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় কিংবা অপমান বোধ করে তবেই কেবল আমরা সেটিকে অপরাধ বলতে পারি। নয়তো সম্বোধিত ব্যক্তির মধ্যে যদি বক্তার নিন্দাবাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে সেতো নিজেই নিজের মান ক্ষুন্ন করে রেখেছে। সে আর নতুন কি অপমানবোধ করবে? ফাতাওয়া কাযীখান, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৩৯; এ বর্ণিত হয়েছে- কেউ যদি কোন নেককার ব্যক্তিকে সম্বোধন করে, হে ফাসিক! অথবা হে লম্পট! কিংবা হে খবিস! তাহলে সে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৪. আল-মাবসূত, আস-সারাখসী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১১৯; কেউ যদি কাউকে বলে 'হে সুদখোর' কিংবা 'হে মদ্যপ' তবে একটি হারাম কর্ম করার কারণে তাযিরী দণ্ডযোগ্য হবে। কারণ সে একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে তার মধ্যে এই দোষ না থাকার পরও মন্দকাজের বদনাম চাপিয়ে দিয়েছে। সেই ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার কারণে এই শাস্তি তার প্রাপ্য হবে। শরহে আল-কানয, আইনী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৪; শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১০০; আল-মুদওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৭; বলা হয়েছে, কেউ যদি উল্লেখিত শব্দ দিয়ে কাউকে সম্বোধন করে তাহলে কি

www.pathagar.com

কেউ যদি কাউকে সম্বোধন করে 'হে দাইয়্যুস![৪] তাহলে বক্তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে, যদি সম্বোধিত ব্যক্তির এ ব্যাপারে কুখ্যাতি না থাকে। যদি সম্বোধিত ব্যক্তি বক্তার একথা বলার পূর্ব থেকে এ ব্যাপারে কুখ্যাতির অধিকারী হয় তাহলে সম্বোধনকারীর শাস্তি হবে না। কারণ বক্তা তার ব্যাপারে নতুন কিছু বলেনি যে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে কিংবা সে অপমানবোধ করবে, কারণ একাজ করে তো সে নিজেই তার মান ক্ষুণ্ন করে রেখেছে।[৫]

কেউ যদি কাউকে বলে 'হে নাপাক![৬] অথবা বলে 'হে নোংরা![১] কিংবা বলে 'হে বোকা![২] 'হে স্বৈরাচারী![৩] 'হে জালেম! বা 'হে টেরা! অথচ লোকটি টেরা

শাস্তি হবে? বলা হয়েছে, ইমাম মালিক রহ. এর মতে, তাকে শাসক বা বিচারক তাযিরী দণ্ড দেবে।

১. আল-জামে আস-সগীর, পৃষ্ঠা-৬৯; শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৩; আল-জাওহারাতুন্ নাইয়ারা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৩; আল-লুবাব আল-মায়দানী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৪; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০০; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা- ১৭; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২১৮।

২. শরহে ফাতহুল কাদির, প্রাগুক্ত; ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, প্রাগুক্ত।

৩. আল-জাওহারাতুন্ নাইয়ারা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৩; শরহে আল-কানয, আইনী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৫; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৬।

৪. শরহে আল-কানয, আইনী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৪; শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৩।

৫. শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৩; কেউ কাউকে সম্বোধন করলো 'হে চোর' তাতে বক্তার কোন শাস্তি হবেনা যদি সম্বোধিত ব্যক্তির মধ্যে চোরের গুণাবলী বিদ্যমান থাকে। আমরা ইতিপূর্বে শাস্তিযোগ্য হওয়ার জন্যে যে কারণ উল্লেখ করেছি, তাতে বলা হয়েছে– বক্তার সম্বোধন দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তি যদি অপমান বোধ করে কিংবা তার মান ক্ষুণ্ন হয় তবেই কেবল শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বক্তার সম্বোধনের পূর্ব থেকেই সে যদি এই গুণে কুখ্যাতির অধিকারী হয়, তবে সে নিজেকে অপমানিত করার কাজ পূর্বেই সমাধা করে রেখেছে। আল-জাওহারাতুন নাইয়ারা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫২; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫২, দারুল হুককাম, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৬/৯৭, এতে বলা হয়েছে- কেউ কাউকে বললো, 'হে ফাসিক! এর পর কেউ তাকে ফাসিক সাব্যস্ত করার জন্যে চেষ্টা শুরু করলো, এমতাবস্থায় তাকে এই সুযোগ দেয়া যাবে না। কারণ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারো ব্যক্তি সত্তাকে আহত করার অনুমোদন ইসলামী আইনে নেই।

৬. আল-জাওহারাতুন নাইয়ারা, পৃষ্ঠা-২৫৩; শরহে আল-কানয, আইনী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৫; শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৪; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৬।

www.pathagar.com

চক্ষুবিশিষ্ট নয় বা বলে 'হে পঙ্গু' অথচ লোকটি পঙ্গু নয়, এসব কথা যদি কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কিংবা অসম্মান করার উদ্দেশ্যে বলা হয় তাহলে বক্তা তাযিরী শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। কারণ এসব শব্দের দ্বারা মানুষ অসম্মান ও অপমান বোধ করে।[৪]

উপরের আলোচনা সূত্রে এই মূলনীতি প্রতিষ্ঠা পেতে পারে যে, যে কেউ ভিত্তিহীন ভাবে কাউকে গালমন্দ কিংবা তিরস্কার ভর্ৎসনা করে অপমানজনক কুৎসা রটায় সে তাযিরী শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। এই নিন্দাবাদ যে ধরনেরই হোক না কেন।[৫]

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– বক্তার কথা বা কর্ম সম্বোধিত বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যে লজ্জাজনক, অপমানজনক ও মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী কি-না এটি নির্ভর করে সেই সমাজের ভাষা, রীতি-নীতি ও প্রচলনের উপর।[৬] বক্তার কথা বা কর্ম যদি সমাজের দৃষ্টিতে অমর্যাদা ও অসম্মানজনক বিবেচিত না হয়, কিংবা তা দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মর্মাহত বা অপমানবোধ না করে, তাহলে কথা বা কর্মটি শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে না।

---

১. শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৪; 'হে নোংরা! শব্দের জন্যও তাযিরী শাস্তি হবে। আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৮।

২. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৬; কেউ যদি কোন নেককার ব্যক্তিকে বলে 'হে বোকা! তবে সে তাযিরী শাস্তিযোগ্য হবে।

৩. আল-ফাতাওয়া আল-আনকারাবিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৮; কেউ যদি কোন নেককার লোককে বলে, 'হে অত্যাচারী! তবে তার একাজ শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

৪. আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড-১৬. পৃষ্ঠা-৩২/৩৮; আল-মুগনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১০।

৫. আবুল কাল্লাস, এটি 'দারুল হুককাম' এর হাশিয়ায় ছাপা হয়েছে, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৭; কোন ব্যক্তি যদি বিনা কারণে কোন মুসলমানকে কোন কথা বা কর্ম দ্বারা কষ্ট দেয় বা উদ্দিষ্ট মুসলমান বা যিম্মী বক্তার কথা দ্বারা অপমানবোধ করে তবে তাকে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৫; এতে লিখা হয়েছে- তাযিরী শাস্তির মূলনীতি হলো, যে কেউ কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো, কিংবা কোন অপসন্দনীয় আচরণ কথা কিংবা কর্ম করলো কিংবা কাউকে বিব্রত, অপমান লজ্জা দেয়ার জন্য কোন কর্ম কথা কিংবা আচরণ করলো অথচ এ কাজের কোন বৈধতা তার নেই তবে সে শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

৬. আল-ফাতাওয়া আল-আনকারাবিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৮/১৫৯; তাযিরী দণ্ডযোগ্য অপরাধ এমন কাজ বা কথা, যা ইচ্ছাকৃত ভাবে কারো দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে যার কোন বৈধতা নেই, সেই সাথে যে অপরাধে নির্দিষ্ট শাস্তি নেই এবং যেটিকে সামাজিক দৃষ্টিতে অসম্মানজনক মনে করা হয়।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, অঞ্চল ভেদে একেক জায়গায় একেক ধরনের সামাজিক রীতি-নীতি ও ভাষা ব্যবহৃত হয়। যেমন বাংলায় প্রবাদ আছে, "এক জায়গার গালি অন্য জায়গার বুলি"। সময়ের ব্যবধানেও অনেক সময় ভাষা ও রীতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। বস্তুত সামাজিক রীতি ও গ্রহণযোগ্যতা এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

পরবর্তী খণ্ডে সমাপ্য

www.pathagar.com

লিবিয়ার বেনগাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইনের অধ্যাপক ড. আবদুল আযীয আমের-এর আরবী ভাষায় রচিত "আত্-তাযির ফিশ-শারীআতিল ইসলামিয়া" (ইসলামী দণ্ডবিধি) মুসলিম বিশ্বে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। এ পর্যন্ত মূল গ্রন্থটির দ্বাদশতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। উর্দু, ফারসী, তুর্কিসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থটি বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যায়-এর শরীয়া অনুষদের অধীন একটি গবেষণাপত্র। শরীয়া ও আইনের খ্যাতিমান অধ্যাপক শায়খ আবু জাহরা বলেছেন, "ইসলামী দণ্ডবিধির তাৎপর্য বিশ্লেষণ এবং প্রচলিত বিচারব্যবস্থা ও দণ্ডবিধির অসারতা এ গ্রন্থে চমৎকারভাবে ফুটে ওঠেছে।" গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের আইনের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য একটি বহুল পঠিত গ্রন্থ, বিশেষত বাংলাদেশের আইন, ইসলামিক স্টাডিজ ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ গবেষক, আইনজীবি, সচেতন মহল ও চিন্তাশীলদেরকে এ গ্রন্থ ইসলামী আইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আইনের ব্যাপ্তি ও পরিধি সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা দেবে। বস্তুত ইসলাম যে কেবল কতিপয় আনুষ্ঠানিকতা নির্ভর ধর্ম নয়- এ গ্রন্থ পাঠে পাঠক তা যথাযথভাবে অনুবাধন করতে সক্ষম হবেন। গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ইসলামী আইন বিষয়ে একটি অনন্য সংযোজন।

BANGLADESH ISLAMIC LAW RESEARCH & LEGAL AID CENTRE

55/B, PURANA PALTAN, NOAKHALI TOWER, SUITE-13/B (LIFT-12), DHAKA-1000.
PHONE : 7160527, 01761-855357, E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com, www.ilrcbd.org